সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

নবযুগ প্রকাশনী

Syed Waliullah : His Life Philosophy and Literary Works
[A Ph D Thesis of Dhaka University Submitted on October 1991 and degree obtained on 30 July. 1992]

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ২/৩ প্যারীদাশ রোড, ঢাকা-১১০০,
বাংলাদেশ। ফোন : ৭১১৮৬৫৪ মুদ্রক : ফাইন টাইপ কমপিউটার,
১, শাঁখারি বাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত পিতার উদ্দেশে

প্রসঙ্গকথা

বর্তমান গ্রন্থ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম* শীর্ষক আমার পি-এইচ ডি অভিসন্দর্ভের মুদ্রিত রূপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ৩০ জুলাই ১৯৯২, আমাকে এ অভিসন্দর্ভের জন্য *ডক্টর অব ফিলজফি* উপাধিতে সম্মানিত করেন।

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক, আমার শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেন-ই আমাকে বর্তমান গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। গবেষণা-পরিকল্পনা ও বিষয়-মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক মীমাংসা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁর সধৈর্য প্রেরণা ও নির্দেশনা ব্যতীত আমার পক্ষে গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করা অসম্ভব ছিল।

পরীক্ষা-পরিষদের আহ্বায়ক-পরীক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; বহিরাগত-পরীক্ষক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং তত্ত্বাবধায়ক-পরীক্ষক প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন সর্বসম্মতিক্রমে অভিসন্দর্ভটি পি-এইচ ডি উপাধির জন্য অনুমোদন করেন, এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগসহ, বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। আমি সশ্রদ্ধভাবে তাঁর ঋণ স্মরণ করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া নানাভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলা বিভাগের প্রফেসর, আমার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীতুল্য ডক্টর বেগম আকতার কামাল-এর উপদেশ ও ডক্টর ফওজিয়া বেগম-এর স্নেহ আমার অধ্যয়নশ্রম লাঘব করেছে। ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী, ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডক্টর রফিকউল্লাহ্ খান সৈয়দ আজিজুল হকের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সাহায্য পেয়েছি। বন্ধুবর ডক্টর মাহবুব সাদিক, স্নেহভাজন ডক্টর মাসুদুজ্জামান, মাসুদ সিদ্দিকী, গিয়াস শামীম চৌধুরী

রওশন জামিল চৌধুরী ও লিয়াকত আলীর সান্নিধ্য আমাকে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে। ঢাকার আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শামসুল আলম ও উপাধ্যক্ষ জনাব মহিউদ্দীন আহমেদ-এর সস্নেহ সহযোগিতায় গবেষণাকালে আমার দাপ্তরিক কর্তব্য পালন সহজ হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রয়োজনীয় অথচ আপাততুচ্ছ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছে স্নেহাস্পদ আহসান, আমিনুল, প্রতাপ, মুকুল ও নানু। আমার অ্যামেরিকা প্রবাসী কৃতীছাত্র রিফাত হোসেন, শাতিল হক ও নাহিদ রহমান দূরে থেকেও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার অপর তিন ছাত্র, সম্ভাবনাদীপ্ত রাহাত হোসেন, অনীক হক ও সোহেল আহমেদ সাধ্যানুসারে আমাকে তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করেছে।

সংসারের দায়িত্বভার বহন করে লেখা ও পড়ায় আমাকে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছেন আমার স্ত্রী ডাক্তার ফেরদৌস আরা। আমার মেয়ে শর্মিতা ও ছেলে সৌরভ তাদের ক্ষুদ্র ধৈর্য স্বীকার করে আমাকে গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সময় দিয়েছে। স্নেহভাজন দুই সহোদর, কল্যাণীয় প্রতীক ও অভীক-এর গবেষণা-সম্পর্কে উৎসাহ ও আগ্রহ, এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

গবেষণা কাজে প্রধানত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মূল অভিসন্দর্ভ টাইপ করে আমাকে উপকৃত করেছে আমার ছাত্র জহির রায়হান।

বন্ধু কবি মাহবুব হাসান এবং কবি আবিদ আজাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কৃতিত্ব নবযুগ প্রকাশনীর। এ-প্রকাশনা সংস্থার স্নেহভাজন অমর চন্দ্র দাশ দ্বিতীয় ও নবযুগ সংস্করণ প্রকাশে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আশা করি, প্রথম প্রকাশের মতো দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক-সমাজে সমাদৃত হবে।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী
ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন

ব্যক্তি-জীবনের বহমান স্রোতের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হলেও জীবন ও জীবনদর্শন সমার্থক নয়। ব্যক্তির কালগত ক্রমিক অভিজ্ঞতার যোগফল, ঘটনাধারার সমষ্টিই তার জীবন। সে-ক্ষেত্রে জীবনদর্শন হচ্ছে তার শুদ্ধ চৈতন্য, ব্যক্তির জীবননিষিক্ত সত্তা। বস্তুত, ব্যক্তি তার জীবন-অভিজ্ঞতা, অধীতবিদ্যা, পারিবারিক মূল্যবোধ, ইতিহাস-জ্ঞান, ঐতিহ্য -চেতনা, তার অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র ও সমাজবোধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে-মনোজৈবিক সত্তায় উপনীত হয় তা-ই তার জীবনদর্শন। সে-অর্থে জীবনদর্শন মাত্রই স্তরবাহিক, গঠনশীল ও পরম্পরা ভিত্তিক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ও বিকল্প সম্ভব নয়। তাঁর জীবনদর্শন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ, ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিবার, পরিপার্শ্ব, তাঁর বাহির ও অন্তর্জগতের ঘটনাপুঞ্জ, স্রোত-প্রতিস্রোতের মাধ্যমেই হয়েছে ঘনীভূত, সুদৃঢ় ও স্ফটিকায়িত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের এই গতিশীল অধ্যায়, তাঁর বিকাশমান জীবনার্থ এবং তাঁর মৌল জীবনাদর্শের পরিচয় সত্য-স্বরূপে উপস্থাপন করতে গেলে সেখানে তিনটি স্পষ্ট, বিশিষ্ট ও পরস্পর নির্ভরশীল পর্যায়ের দৃঢ়রেখ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

প্রথম পর্যায় (১৯২২-১৯৪৩)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ১৫ জুন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ষোলশহরের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] মাতৃ এবং পিতৃকুল—উভয় দিক থেকেই তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত। ওয়ালীউল্লাহ্‌র পিতা সৈয়দ আহাম্মদউল্লাহ্ (১৮৯৩-১৯৪৫) ছিলেন ইংরেজির এম এ এবং পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি কর্মজীবনের চূড়ান্ত-পর্বে বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মাতামহ মৌলভী খালেকের দ্বিতীয় সহোদর মৌলভী সালেহ্ আহমদও ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। ১৯০১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাব-ডেপুটি কালেক্টররূপে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি হন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ।

১৯৩০ সালে মাত্র আট বৎসর বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মাতা নাসিম আরা খাতুন পরলোক গমন করেন।[২] পিতা সৈয়দ আহাম্মদউল্লাহ্ অতঃপর দ্বিতীয় বার বিয়ে (১৯৩২) করেন। বলা হয়, মাতৃছায়া, তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্য সন্তানের পরম আশ্রয়, তার অন্তর্গত প্রতিভার বিকাশের সবচেয়ে সহায়ক শর্ত ও অনুকূল উপাদান। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন মাতৃস্নেহের সেই অন্তরঙ্গ মমতায় অধিককাল সঞ্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। একটি প্রচ্ছন্ন অভাববোধ, মায়ের আকস্মিক মৃত্যুজনিত নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি অতিঅল্প বয়সেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মধ্যে সঞ্চারিত হয়; তাঁর সেই জীবনানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে আরো পরে, *ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ-বার্ষিকী* (১৯৩৯)-তে প্রকাশিত তাঁর গল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'-র মধ্যে। স্মরণীয়, বিমাতার সঙ্গেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর এবং মাতা-পুত্রের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসাস্নিগ্ধ, কিন্তু তা শিশুর অপাপবিদ্ধ সারল্য ও আবেগ-আহরিত নয়, বয়সী ও মেধাবী সন্তানের অভিজ্ঞতা ও আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।[৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বাল্য ও কৈশোরে সবিশেষ সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছেন তাঁর বড়ো মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভিক প্রেরণা ও শুশ্রূষাও তিনি এই মামার কাছ থেকে পেয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, সিরাজুল ইসলাম ছিলেন একাধারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির অধিকারী ও আইনবিদ ; আর চাকরি-জীবনে তিনি ছিলেন আইন-সচিব। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বড়ো মামী রাহাত আরা বেগম ছিলেন একজন খ্যাতকীর্তি উর্দু লেখিকা ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। তিনি উর্দুতে রবীন্দ্রনাথের নিশীথে' গল্প ছাড়াও 'ডাকঘর' (১৯১২) নাটক অনুবাদ করেন।[৪] রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতি-পরিস্নাত মামাবাড়ির পরিবেশ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে প্রভাবিত ও প্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই। এ পর্বে *ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ অ্যানুয়াল*-এ প্রকাশিত তাঁর গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র রবীন্দ্র-প্রতিধ্বনি সংবলিত শিরোনামা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-মানসের সে-পরিচয়ই করেছে উৎকীর্ণ ও রেখায়িত।

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তার সন্তান হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র শিক্ষাজীবন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং কোনো বিশেষ অঞ্চলের নিসর্গের প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় অতিবাহিত হয়নি। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সময়ে মানিকগঞ্জ, মুনশিগঞ্জ, ফেনি, চিনসুরা, হুগলি, সাতক্ষীরা প্রভৃতি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। কৈশোর অতিক্রমের পূর্বেই এই বিস্তৃত ভ্রমণাভিজ্ঞতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও চৈতন্যকে দ্বিমাত্রিক আয়তনে (ডাইমেনশন) ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করেছে। প্রথমত, এর ফলে তাঁর পরিচিতির দিগন্ত হয়েছে বহুব্যাপ্ত, বৈচিত্র্যঋদ্ধ ও বহুমুখি আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্পর্শধন্য। দ্বিতীয়ত, মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশের কোনো নির্দিষ্ট মৃত্তিকার মর্মমূলে শিকড়ায়িত হতে পারেননি এবং কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীকে ভাবতে পারেননি একান্ত আপন, আজন্মের চেনা বলে। সমগ্র স্বদেশ, পূর্ববাংলার অখণ্ড

ভূগোলকেই তিনি নিজের বলে ভেবেছেন এবং সব মানুষের প্রতিই বোধ করেছেন প্রগাঢ় আকর্ষণ, হৃদয়িক অনুরাগ ও এক ধরনের দায়িত্ববোধ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই বিশেষ মনোগঠন নিম্ন-উদ্ধৃতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে :

> ... একটি স্কুল ও সে-এলাকার স্মৃতি হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পূর্বেই তাকে সে-সব ছেড়ে যেতে হয়েছে পিতার পরবর্তী নতুন কর্মস্থলে। সেখানে ভিন্ন পরিবেশে অচেনা সহপাঠী ও অপরিচিত এলাকাবাসীর সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠ, আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সময় তিনি পাননি। কারণ আবারো পিতা হয়েছেন অন্যত্র বদলি। ফলে সবসময়ই এক ধরণের সীমাহীন একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গবোধ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সত্তায় আমূল প্রোথিত ছিল।[৫]

স্বভাষী ও স্বদেশী মানুষদের মধ্যে বাস করেও একটি নির্বাচিত দূরত্বে, নিঃসঙ্গ-ভাবে অবস্থানের অন্যবিধ কারণ, তাঁর পিতার শ্রেণী-অবস্থান ও কর্ম-পরিচয়। ব্রিটিশ ভারতের কোনো সরকারি কর্মচারীকে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আত্মপক্ষ বলেই বিবেচনা করা হতো; মহকুমা কিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাই যেমন পারতেন না অনায়াসে জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে, তাদের বহমান জীবনের সাথে অভিন্ন হতে, তেমনি তাঁর সন্তানদেরও একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রমের সুযোগ, অধিকার ছিল না। সরকারি নীতিমালার দ্বারাই তাঁদের জীবন, আচরণ, কার্যাবলি ও চলাচলের সীমা হতো নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। স্বভাবতই সহপাঠী বালকদের সঙ্গে অভিন্ন ও অন্তরঙ্গ হয়ে ক্রীড়াচঞ্চল হওয়া কিংবা মৃত্তিকাসংলগ্ন ও পেশিবহুল মানুষদের কল্লোলিত জীবনকে খুব কাছ থেকে, তাদেরই একান্ত আপন জন হয়ে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করার সুযোগ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল না। এ-অবস্থায় অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট পরিবার, নির্বাচিত একটি দিগ্‌বলয়ের মধ্যে প্রায়-নির্বাসিত হয়ে লালিত হওয়ায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ হয়ে পড়েছেন আত্মমগ্ন, বিবিক্তস্বভাবী ও গ্রন্থবদ্ধ। তাঁর ফেনি স্কুলের দেয়াল পত্রিকা *ভোরের আলো*-র সম্পাদনা, অঙ্গসজ্জা ও রেখায়ন, রাফ খাতা ক্রমাগত ছবি এঁকে ভরে তোলা[৬]-র মনস্তত্ত্বও এই জীবন অবস্থানের গভীরেই মূলসঞ্চারী।

ম্যাট্রিকুলেশন পাসের পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন এবং কলেজ ছাত্রাবাসেই থাকেন। অর্থাৎ, মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ-পর্বে যে-নির্বাচিত পরিমণ্ডলে তিনি অবস্থান করতেন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্বের শিক্ষাগ্রহণ কালেও তাঁর সেই পারিপার্শ্বিকতার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ছাত্রাবাসে তাঁর একান্ত পরিচিত, বন্ধুদের সংখ্যাও ছিল স্বল্প। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় সৈয়দ নূরুদ্দিন (১৯২২-১৯৮১), মোহাম্মদ তোয়াহা ও সানাউল হক (১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ জনদের প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীতে হয়েছেন খ্যাতিমান, কৃতী এবং পূর্ববাংলার সাংবাদিকতা (সৈয়দ নুরুদ্দিন), রাজনীতি (মোহাম্মদ তোয়াহা), সাহিত্য (সানাউল হক)-ক্ষেত্রে সবিশেষ পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। ছাত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ছিলেন পরিশ্রমী, সতৃষ্ণ ও একাগ্র। একই সঙ্গে তাঁর মানবিকতাবোধের জাগরণ ছিল সুতীক্ষ্ণ, পীড়িতের প্রতি সহানুভূতি

ও শুশ্রূষাপরায়ণ অন্তরের বিকাশ ছিল অসাধারণ, সুতুঙ্গ। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন :

> ...তোয়াহা আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ হলে একই রুমে থাকতেন। ... তোয়াহা ছিলেন ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অনুরক্ত। তিনি একবার বেজায় ইনফ্লুয়েন্জায় আক্রান্ত হন। পরিজনহীন হোস্টেল-জীবনে রুমে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছেন, এমন সময় সৈয়দ নূরুদ্দীন যেয়ে দেখেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বসে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছেন।[৭]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিস্‌টিংশনসহ বি এ পাস করেন। তাঁর পিতা তখন ছিলেন ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (সদর-দক্ষিণ)। এর পূর্বে কিছু দিনের জন্য সম্ভবত আই এ পাসের পর প্রথম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আবুল ফজল (১৯০২-১৯৮৩)-এর স্মৃতি কথায়[৮] সে-প্রসঙ্গের চকিত উল্লেখ ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কৃষ্ণনগর-জীবন এবং তাঁর এ কালের জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না।

ময়মনসিংহ-অবস্থান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন-পুনর্গঠন ও সাহিত্য-সাফল্য উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর 'প্রকল্প' (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩) ও 'তুমি' (গ্রীষ্ম ১৩৫০/১৯৪৩) কবিতাদ্বয়, 'অনুবৃত্তি' (কার্তিক ১৩৪৯), 'চিরন্তন পৃথিবী' (পৌষ ১৩৪৮), 'চৈত্রদিনের দ্বিপ্রহরে' (মাঘ ১৩৪৮), 'ঝোড়ো সন্ধ্যা' (বৈশাখ ১৩৪৯), 'দ্বীপ' (ফাল্গুন ১৩৪৯), 'পথ বেঁধে দিল (আশ্বিন ১৩৪৯), 'প্রাস্থানিক' (ভাদ্র ১৩৪৯), 'সাত বোন পারুল' (পৌষ ১৩৪৯), 'ও আর তারা'(পৌষ ১৩৫০), 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ' (বৈশাখ ১৩৫০) ইত্যাদি গল্প ও 'খেয়া' (ফাল্গুন ১৩৫০) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ পর্বের জীবনের অন্যতম সারবান ঘটনা *মাসিক সওগাত*-এর তৎকালীন সম্পাদক, বিশিষ্ট কথাশিল্পী কাজি আফসারউদ্দিন (১৯২১-১৯৭৫)-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন। এই সান্নিধ্য ও আলাপচারিতার ফলেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্যের বিষয়াঙ্গিক, প্রকৌশল, মুসলিম সাহিত্যচর্চার ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ব ও স্বাধীন অভিমত প্রকাশের সুযোগ পান।[৯]

প্রচলিত ধর্মাচরণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আস্থা না-থাকলেও[১০] মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য, তাদের জীবনচর্যার একান্ত নিজস্ব চারিত্রকে তিনি অস্বীকার করেননি। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে কাজি আফসারউদ্দিনকে লিখিত পত্রে তিনি বলেন :

১ আমরা মুসলমান। হয়তো-বা মাত্র কয়েকঘর আমরা শহরে বাস করি এবং আমাদের বাড়ি শহরে। তা ছাড়া যে-বিরাট সমাজ সভ্যতার জঞ্জাল, সে-সমাজের পক্ষে অতি আধুনিকতম সাহিত্যের তেমন প্রয়োজন রয়েছে কী এবং সে-সাহিত্য যদি ব্যর্থ হয় তবে সে-ব্যর্থতা হবে সেই রকম—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা ছেড়ে কিছুরও মধ্যস্থতা না নিয়ে এক লাফে সূররিয়লিজম শুরু করার যে-ব্যর্থতা।[১১]

২ ..."I want to write" মুসলমান সমাজ নিয়ে—আমার সমগ্র মনের ইচ্ছে সেদিক পানে। এও একরকম passion থেকে সৃষ্ট। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে আমরা কেউ

হয়তো অজ্ঞ নই; কিন্তু অধঃপতনের এই যে একটা চূড়ান্ত অবস্থা—এই অবস্থা নিয়ে লিখে আমার লেখা কলঙ্কিত (?) করতে চাই।[১২]

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চূড়ান্ত পরিশুদ্ধি, সর্বাধিক পরিশীলন, পরিমার্জন এবং শিল্পসিদ্ধিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই ফরমায়িসি, মৌসুমি কিংবা অপরিণত রচনার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না :

> সওগাতের সম্পাদনা করচেন, আশাকরি আপনার হাতে (অন্ততঃপক্ষে ২/৩ মাসের জন্যে) তার standard উঁচু হবে। তবে গত মাসে (মাঘ) দুটি ইস্কুল-মেগাজেনী গল্প দেখলাম, দু'জন মহিলার লেখা। ও-সব ছাপলে পত্রিকার standard নিচু হয় না কী ?[১৩]

সাহিত্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ততা, হয়ে ওঠার নীতিতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আস্থাবান ছিলেন। কোনো কষ্টকল্পনা কিংবা কোনো দুরন্বয়ী তত্ত্বের অভিসন্দর্ভরূপে সাহিত্যকে নির্মাণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না :

১ সাহিত্যিক হতে হবে ব'লে লেখা—সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা! আপনা থেকে যা বেরুবে তা-ই খাঁটি...।[১৪]

২ আমার লেখায় কোনো বিশিষ্ট ভাল নেই। তবে এটায় ভালো-মন্দের কথা আলাদা। তা ছাড়া এখন যা লেখা হচ্ছে একে একটা experiment বললে হয়তো ভুল হবে না।[১৫]

পূর্বের নৈঃসঙ্গ্য-চেতনা ও অনিকেতবোধকেও তিনি ময়মনসিংহ অবস্থানকালে লালন করেছেন :

১ আমি নিঃসঙ্গ। আপনার জীবনটাও এমনি...। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের মাঝে সাদৃশ্য রয়েচে। এবং এতে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে আপনার ও আমার মাঝে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলেও আমরা পরস্পর নিঃসঙ্গই থাকবো। মানুষের নিঃসঙ্গতাই আসল ও খাঁটি রূপ, হয়তো।[১৬]

২ সাহিত্যিক-মহল আমি বরাবরই এড়িয়ে চলি, কিন্তু আপনাদের মতো দুয়েকজন সাহিত্যিকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য কামনা করি।[১৭]

মানুষ হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজের চৈতন্য ও বিবেচনায় সুস্থির, মীমাংসিত থেকেও অন্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর পরমতসহিষ্ণু অন্তরের সে পরিচয়ও এ-পর্বে উদ্ভাসিত হয়েছে কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে লিখিত পত্রে :

> মত হিসেবে আমাদের মতানৈক্য আশা করি কিছু না। তাছাড়া এ-বিষয়ে ঐক্য থেকে অনৈক্য আমি বেশি পছন্দ করি, কারণ তা হলে নিজের ভাবের খাঁচাতে বন্দী হয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে না। তা ছাড়া এই দুনিয়ার রীতি-ই চায় বহু-স্রোতের সংঘাত—হোক না গতিটা evolutionary or revolutionary.[১৮]

রচনামাত্রই আত্মজৈবনিক, স্রষ্টার জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শনের শিল্পরূপ, ইতিকথা।[১৯] তাই এ-পর্বে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প ও কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন ও শিল্পিমানসের প্রাগুক্ত চেতনাপুঞ্জের শিল্পিত প্রকাশ লক্ষণীয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'সীমাহীন এক নিমেষে' ও 'চিরন্তন পৃথিবী' ব্যক্তির

নিঃসঙ্গ-চেতনা এবং পরিবেশের গভীরে অবস্থান করেও পরিবেশ-উর্ধ্ব অধিবাস্তব পরিমণ্ডলে তাঁর আত্ম-উত্তরণের রূপালেখ্য। 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে' গল্পে উৎকীর্ণ হয়েছে তাঁর আত্যন্তিক স্বজাতি-নিষ্ঠার পরিচয়। 'ঝোড়ো সন্ধ্যা' ব্যক্তির দূরাভিসারী কল্পনার সকরুণ পরিণতিরই খরচিত্র। 'পথ বেঁধে দিল' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঐতিহ্যানুরক্ত। এখানে তিনি রবীন্দ্র-প্রতিধ্বনিময় আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীদের মুক্তপক্ষ রোম্যান্টিক কল্পনার জগতে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি গীতল ও নাট্যিক ব্যঞ্জনাময় মুহূর্ত নির্মাণে হয়েছেন ঐকান্তিক ও অভিনিবিষ্ট। মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি অভিন্ন করে উপস্থাপন করেছেন 'মানুষ' গল্পে ও 'প্রকল্প' কবিতায়।

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন ও শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের অবসর প্রথম পর্বে নেই। এ-পর্বে তাঁর প্রতিভা ও জীবনবোধ গঠনশীল ও স্ফুটন-উন্মুখ। তবে কোনো প্রতিভাই ঐতিহ্যরিক্ত ও আকাশচারী সত্তা নয়। বাল্য ও কৈশোরের প্রস্তুতি ও পটভূমির উপর দাঁড়িয়েই মানুষ যৌবনে প্রবেশ করে। জীবনের মতো শিল্পেও তা সমান সত্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও প্রথম পর্বের ভিত্তিভূমি, এ সময়-পরিসরে সঞ্চিত ঐশ্বর্য, অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টিকে নিজের গভীরে বহমান প্রতীতিপুঞ্জকে ধারণ, আত্মস্থ ও লালন করেই উপস্থিত হয়েছেন জীবনদর্শনের তটভূমে।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৩-১৯৪৭)

বি এ পাসের পর অর্থনীতিতে এম এ পড়ার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও কলকাতা-নগরীতে অবস্থানের সঙ্গেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা এবং তা ১৯৪৭ সালে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে বার্তা-বিভাগে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী। তাঁর এ-পর্বের জীবন যুগপৎ কর্ম ও সৃষ্টিসাফল্যে উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময়। পূর্বের *মাসিক মোহাম্মদী* (১৯১০), *মাসিক সওগাত* (১৯১৮) ছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *পূর্বাশা, অরণি, চতুরঙ্গ, পরিচয়* প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ক্রমাগত রচনা করেন গল্প ও প্রবন্ধ এবং ইংরেজি দৈনিক *'দি স্টেটসম্যান'*-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে শুরু করেন তাঁর কর্মজীবন। তাঁর গল্পসংকলন *নয়নচারা* (১৯৪৫) পূর্বাশা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপাঠে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল অফুরন্ত উৎসাহ ও অনিঃশেষ অভিনিবেশ। তাঁর সেই গ্রন্থানুরাগী ও জ্ঞানতৃষ্ণ চৈতন্যের পরিচয় এ-পর্বেও পাওয়া যায় :

> ঢাকা থেকে এসে প্রথম একচোট ভুগলাম ফ্লুতে। অবশ্য সে-ভোগার প্রতিদানস্বরূপ লাভ করেছি ক'টা ভালো বই, যেমন : ফল অব্ প্যারিস (ইলিয়া ইরেনবুর্গের), লেনিউড লেওনিভের ইন্‌ভেশন, অচিন্ত্যবাবুর সে-বইখানা, ডে লুই-র ওয়ার্ল্ড ওভার অল, সুবোধবাবুর শুক্লাভিসার ইত্যাদি।[২০]

স্টেটসম্যান-এর চাকরিসূত্রে তাঁর ইংরেজি শেখার আগ্রহও বৃদ্ধি পায় এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, সবিশেষ যত্নশীল ও ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠ :

> যদিও ভালো ইংরেজি জানতেন তিনি তবু *স্টেটস্‌ম্যান*-এ ঢোকার পর শুদ্ধ বিশুদ্ধ নয় সাহিত্যিক-ইংরেজি লেখার প্রতি তাঁর ঝোঁক হয়। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখতেন এবং রাত তিনটেয় উঠে উন্নত ইংরেজি শেখা যায় এমন সব ব্যাকরণ জাতীয় বই পড়তেন ভোর পর্যন্ত।[২১]

কলকাতা-জীবনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পার্ক-সার্কাসের একটি বাড়িতে থাকতেন। সে-সময় তাঁর সঙ্গে বাস করতেন আহমেদুল কবির (জন্ম ১৯২৩)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও আহমেদুল কবির পরস্পর বন্ধু। দু-জনের পরিচয়ও অনেক দিনের, ছাত্রজীবন থেকে। তৎসত্ত্বেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কখনো, কোনো একান্ত মুহূর্তেও তাঁর সৌজন্য-বোধ, সম্ভ্রমচেতনা ও মর্যাদাজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে আহমেদুল কবিরের সঙ্গে মেশেননি। সর্বদায় তিনি ছিলেন সৌজন্যস্নিগ্ধ ভদ্র ও বিনীত। সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেমের লেখায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ব্যক্তিস্বরূপের এই বিশেষ পরিচয়ই প্রকাশ পেয়েছে :

> তার ফ্লাট-সঙ্গী আহমেদুল কবির-এর কথা জিগ্যেস করলাম,...সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অদ্ভুত দরাজ মন্দ্রস্বরে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিষ্ট আহ্বান, "কবির সাহেব কি জেগে?" কাঠের পার্টিশনের ওপার থেকে...উত্তর শুনলাম, "হ্যাঁ, সৈয়দ সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে।"[২২]

নাজমুদ্দিন হাসেম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদের যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতেও তাঁর অতিমাত্রায় রুচিবান, পরিশীলিত, সম্প্রতিভ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে :

> ...সৌম্যমূর্তি সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গ এক যুবক, গৌরবর্ণের সঙ্গে চোখের বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত দৃষ্টি চোখে পড়ার মতো। মনে পড়ে তার হলদে ফ্রেমের চশমা, হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ, পরনে কল্‌কি বা পেইস্‌লি নকশা-আঁকা বিদেশী রাত্রিবাসের ওপর বর্গাণিড সুরার ঘন লাল রং-এর ড্রেসিং গাউন, একটা স্থির চিত্রের মতো বহুদিন মনের ফ্রেমে বাঁধাই করা ছিলো।[২৩]

মানুষ হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন স্বল্পায়তনবদ্ধ, আত্মসমাহিত ও নিভৃতচারী। নির্বিশেষ মানুষের সঙ্গে নির্বিচারে, অবাধে ও উচ্চকণ্ঠে সখ্যতা স্থাপন কিংবা ঘনিষ্ঠ হওয়া ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এ-তথ্য আমরা প্রথম পর্বে পেয়েছি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় পর্বের জীবনাচরণে এর কোনো উল্লেখযোগ্য, দৃশ্যমান ও গুণগত পরিবর্তন আসেনি। পূর্বের স্বভাবকে বহন করেই তিনি কলকাতা অবস্থান করেছেন :

> ...আমি শূন্য মার্গে ঝুলছি, ... কোনো প্রকার উচ্ছ্বাস আমার ভালো লাগে না, ভাবুলতা তো বরদাস্তই করতে পারি না।[২৪]

তৎসত্ত্বেও বাইরে থেকে, ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও পরিচিতির দিগন্ত হয়েছে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত,[২৫] তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও পরিচিতির দিগন্তকে করেছে প্রসারিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিচিত জনের তালিকা তাই হয়েছে ঈষৎ দীর্ঘ, সামান্য স্ফীত। এ-পর্বে যাঁদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁরা হলেন শাহেদ সোহ্‌রাবর্দী (১৮৯০-১৯৬৫), কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০),

দার্শনিক-সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২), কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, উপন্যাসিক-সমালোচক গোপাল হালদার, রবীন্দ্র-দর্শন ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কবি গোলাম কুদ্দুস (জন্ম ১৯২০) প্রমুখ। এ ছাড়াও একান্ত বন্ধু হিসেবে এ পর্বে তিনি পেয়েছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন (১৯১৪-১৯৭৬), আবু জাফর শামসুদ্দীন (জন্ম ১৯১১), আবুল হোসেন (জন্ম ১৯২১), সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম, এ কে নাজমুল করিম (১৯২১-১৯৮২)। সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম ১৯২২), আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯২১-১৯৮৭), মোহাম্মদ নাসির আলী (১৯১০-১৯৭৫) প্রমুখকে। চিত্রকলার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের জন্যই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও জয়নুল আবেদীনের মধ্যে সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। স্মরণীয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-ঘনিষ্ঠজনেরা কেউ সাধারণ মেধার মানুষ ছিলেন না। তাঁরা কেউ ছিলেন ভাবুক, সৃষ্টিশীল, অনুভূতিময় ও সংবেদনশীল সত্তা, কেউ তীক্ষ্ণধী সম্পাদক ও সচেতন সংস্কৃতি-কর্মীরূপে খ্যাত ও নন্দিত।[২৬]

কলকাতা পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু লেখক নয় সম্পাদক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন প্রকাশনার সঙ্গে। মামা সিরাজুল ইসলামের সহযোগে তিনি গড়ে তোলেন প্রকাশনা-সংস্থা 'কমরেড পাবলিশার্স' এবং এখান থেকেই তিনি ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করেন। পরবর্তীতে *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের প্রকাশক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করেন। এতদ্ব্যতীত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *মিসেল্যানি* নামে একটি ইংরেজি সংকলন সম্পাদনা করেন যেখানে পত্রস্থ হয়েছিল বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)-র 'আড্ডা' প্রবন্ধের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর।[২৭]

চার দশকের কলকাতা মহানগরী ও সমগ্র বাংলাদেশ নিস্তরঙ্গ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪)-এর ফাঁসি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ক্ষমতালাভ, ১৯৩৯-এ ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক একতরফা যুদ্ধঘোষণা, যুদ্ধসৃষ্ট অর্থসংকট ও নৈতিক বিপর্যয়, পাকিস্তান প্রস্তাব (১৯৪০), ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪১), 'প্রগতিলেখক ও শিল্পী-সংঘ' কর্তৃক 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ (১৯৪২) প্রতিষ্ঠা, আগস্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, (১৯৪৩), রশীদ আলীর মুক্তি-আন্দোলন (১৯৪৪) ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে এ কাল পরিসর ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবর্তে তরঙ্গায়িত ও সংক্ষুব্ধ পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাতন্ত্র্যচেতনা পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় প্রদীপ্ত; তাঁদের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবিকবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কল্লোলিত।

মানুষমাত্রই প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে রাজনীতি-শাসিত, স্বকালের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-প্রভাবিত যা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চেতনাকেও করেছে আলোড়িত ও স্পন্দিত। বিশ শতককে তিনি একটি 'ক্রান্তিকাল' বলে ভেবেছেন। ফাল্গুন ১৩৫০

সংখ্যা *মাসিক সওগাত*-এ প্রকাশিত তাঁর 'খেয়া' প্রবন্ধে নিজের চৈতন্য-নিষ্কাসিত এই বিশেষ প্রত্যয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> এ শতাব্দীকে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বলা যেতে পারে এবং এ বিস্ফোরণের মালমশলা জুটিয়েছে আগের কয়েকটা শতাব্দী।[২৮]

তাঁর মতে, বিশ শতকের মানুষের জীবনযন্ত্রণার মূলে আছে ব্যক্তির দ্বিবিধ সত্তার দ্বন্দ্ব। মানুষ ক্রমাগত dualism ও pretension-এর দোলাচলে বিচলিত-বিক্ষত বলেই তাঁর আত্ম-উত্তরণ ঘটছে না এবং বর্তমান শতাব্দীর অগ্রগতিতে সংযুক্ত হচ্ছে না কোনো নতুন, প্রাণদ মাত্রা। তবে নিজের অনুভূতিলোকে কখনোই কোনো পরাগতি বা বিচ্ছিন্নতাবোধকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। কালের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই তিনি মানুষকে নতুন ও প্রাণময় জগৎ সৃষ্টিতে যত্নশীল ও ঐকান্তিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন :

> ... সেই ঢেউ শান্ত করতে পারবে? ঢেউ না হলে বাঁচব না, কিন্তু কেন? কেন? নিস্তরঙ্গতায় একবার আমরা বাঁচতে চাই।[২৯]

উল্লিখিত প্রবন্ধে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক দর্শনেরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-কেই বিশ শতকের অন্যতম মুক্তিদূত বলে মেনেছেন। নিজের ভূমি-আশ্রয়ী, বৃহৎ বক্তব্য-সন্ধানী ও গণমানবপ্রেমী রাজনৈতিক বিশ্বাসও তাই সহজে, অকাতরে বন্ধু সৈয়দ নূরুদ্দিনের কাছে মেলে ধরেছেন :

> আমার রাজনীতিক মতবাদ সম্বন্ধে এবং তার রূপ সম্বন্ধে আজো তোমার স্পষ্ট ধারণা হয় নি, তার কারণ প্রথমতঃ ভুল ধারণা, দ্বিতীয়তঃ এ-সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয় নি কখনো। তোমাদের[৩০] ক্ষেত্র স্পর্শ করেছে কী না—করছে সে-কথা ভেবে কখনো লিখি নি, কিন্তু, তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো কী একটা শব্দ লিখেছি বলতে পারো?[৩১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ'-এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিতি তাঁর এই রাজনৈতিক প্রত্যয় গ্রন্থিকেই করেছে আরো শক্ত, সুদৃঢ় এবং সাহিত্য ভাবনায় পূর্বাপেক্ষা সংলগ্ন ও স্বজাতি-নিষ্ঠ। অন্য কথায়, এ-পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনার জন্ম হলেও তা তাঁর সাহিত্য-ভাবনাকে পূর্বাবস্থান থেকে দূরায়িত করেনি। মুসলিম সমাজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই সমাজকে তিনি সচেতনভাবেই আশ্রয় ও উপজীব্য করেছেন। তাই আবারও শ্রুত হয় তাঁর পূর্ববিশ্বাসের প্রতিধ্বনি :

> সেদিন অরণির-অফিসে অনিল কাঞ্জিলাল এর সাথে আড্ডা জমিয়ে অবশেষে... নোয়াখালী-চাটগাঁর ভাষা-সমস্যা নিয়ে কথা উঠলো। কোনো মীমাংসায় পৌছানো গেলো না। অবশেষে তিনি বলেন, কালচারাল অটনমি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন। সমস্যাটা সত্যিই বড় মুশকীলের।[৩২]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন বিশেষত, তাঁর সাহিত্য-দর্শনে বেশকিছু স্ববিরোধী উপাদানও খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কসকে তিনি বিশ শতকের মানুষের মুক্তিদূত ভাবলেও মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হননি। এ ক্ষেত্রে ডি এইচ

লরেন্সই তাঁর আদর্শ ও আত্মীয়; আর এই পরস্পর-বিরোধী চৈতন্যের জন্যই বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)-এর *নবান্ন* (১৯৪৪) নাটকের অভিনয়, গ্রামীণ মানুষের প্রাকৃত সত্তার রূপায়ণ-নৈপুণ্য ভালো লাগলেও 'নবান্ন আইডিয়া' তাঁর শিল্পিমনকে স্পর্শ করেনি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

> 'নবান্ন idea-টাতে আমার আপত্তি। নবান্ন উৎসব যদি নাটকটির climax অথবা anti-climax—অর্থাৎ অভিনয়ের সর্বশেষ কথা না হতো, তা হলে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারতাম নাটকটি। সবার মৃত্যুর পর—গ্রামের অধিকাংশের ধ্বংসের পর অনুষ্ঠিত নবান্ন উৎসব আমার চোখে অতি কুৎসিত ঠেকেছে।[৩৩]

একইভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)-এর *সম্রাট* (১৯৪০) কাব্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'এমনিতে এত ভালো' না-লাগলেও এ কাব্যের 'সিঁড়ি' [কাঠের সিঁড়ি] কবিতাটি তাঁর 'বেশ লেগেছিলো।' কিন্তু *নবান্ন*-এর 'মূলপ্রেরণা যুগপৎ ধ্বংস ও মৃত্যুর মরণান্তিক অভিঘাতের পর' গ্রামবাসীদের 'ব্যক্তিমালিকানা বহির্ভূত সামুষ্টিক চেতনায়...অভিন্ন মূল্যবোধে ও আদর্শে ঐক্যবদ্ধ ও জাগ্রত হওয়া'।[৩৪] প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনাদর্শেরও অন্যতম মৌল বৈশিষ্ট্য 'বৃহত্তর বলিষ্ঠ জীবন।' বিশ শতকের ফ্যাকাসে রুগ্ন সভ্যতার প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ।[৩৫] 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতাতেও তিনি সেই যান্ত্রিক ও অন্তঃসারশূন্য সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনাহীন ভবিষ্যতের চিত্র নির্মাণ করেছেন যা জনতাকে স্তব্ধ করে কাঠের টুলে বসিয়ে রাখতে চায় :[৩৬]

> .. জানি,..পায়ের চারার মধ্যে সংগোপন আছে অরণ্য:
> কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না!
> কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে স্তব্ধ হয়ে;
> একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।[৩৭]

বস্তুত, সমকালের আর্থ-সামাজিক ঘটনাস্রোত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ-পর্বের মনোগঠনে ছায়া ফেলেছে এবং সমসাময়িক কালের প্রতিকূল ও অনুকূল ঘটনাস্রোত-প্রভাবিত হয়েই তিনি লাভ করেছেন তাঁর অসম্প্রদায়িক, উদার, মানবপ্রেমী এবং স্বজাতিনিষ্ঠ চারিত্র, ব্যক্তির অন্তর্লোক রূপাঙ্কনের শৈল্পিক জীবনদর্শন।

তৃতীয় পর্যায় (১৯৪৭-১৯৫০)

পূর্বের দুই পর্যায়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনের তৃতীয় পর্যায় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে সহকারী সম্পাদক হিসেবে তাঁর যোগদান (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) থেকে রেডিও পাকিস্তান করাচি কেন্দ্রে বদলি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ, মাত্র তিন বছরের সমবায়ে গঠিত। রেডিও পাকিস্তান ঢাকার বার্তা-বিভাগ ছিল নিমতলিতে। ওয়ালীউল্লাহ্ এ সময় তাঁর অফিস-সংলগ্ন পাড়াতেই বাস করতেন। পরে সে-বাস উঠিয়ে তিনি বাসা নেন পুরানা পল্টনে। কলকাতার *দি স্টেটসম্যান* পত্রিকার তুলনায় রেডিও পাকিস্তান ঢাকার বার্তা-বিভাগে কাজ ছিল

স্বল্প। সাধারণত সকালের দিকেই তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করতেন।[৩৮] ফলে ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল উদ্বৃত্ত সময়, দীর্ঘ ও অপরিমেয় অবসর। এ অবস্থায় একজন অবিবাহিত অথচ স্বচ্ছল ও সুদর্শন যুবকের বন্ধুবৎসল, অনেক ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও ভাবালুতা-আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু নিজের অন্তর্মুখি ও মৌনস্বভাবের কারণে তারুণ্য-ধর্মের সহজ আহ্বানে সাড়া দিয়ে, কোনো প্রকার বিনোদন অন্বেষণে কিংবা তরল আড্ডায় নিমজ্জিত হয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সময় কাটাননি। প্রতিটি অবসর মুহূর্ত তিনি পরম নিষ্ঠায় ও সৃষ্টিশীল কর্মে নিয়োজিত হয়ে অতিবাহিত করেছেন।[৩৯] তাঁর এই অবসর যাপনেরই ফসল *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাস ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্প।

লালসালু রচিত হওয়ার পর তা ঢাকা জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক অজিতকুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯)-র ওয়ারির বাসায় 'সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক'-দের উপস্থিতিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাঠ করেন :

> 'লালসালু' লিখে তিনি বন্ধুদের প'ড়ে শোনাতেন। কেউ বিরূপ সমালোচনা করলে এবং সে-সমালোচনা যদি তিনি নিজে মনে করতেন সংগত, সঙ্গে সঙ্গে সে-অংশ ছিঁড়ে ফেলতেন। আবার লিখতেন।[৪০]

অর্থাৎ , লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মম্ভর ছিলেন না। অন্যের গঠনমূলক ও সংগত সমালোচনার প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাশীল ও নমনীয় এবং প্রয়োজনে নিজের রচনার পাঠ-পরিবর্তনেও অকুণ্ঠ।

এ পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নির্বান্ধব না–হলেও তাঁর বন্ধু ও পরিচিত জনদের সংখ্যা কলকাতার তুলনায় ছিল স্বল্প। সৈয়দ নূরুদ্দিন ছাড়া তাঁর সংযোগ ছিল আত্মগোপনকারী কতিপয় বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও সেই একই অবস্থার শিকার 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর কিছু কর্মীর সঙ্গে।[৪১] স্পষ্টতই, মানস-নির্মিতির স্বাতন্ত্র্যের জন্যই গণসংযোগ মাধ্যমের সঙ্গে নিজে সংযুক্ত থাকলেও পূর্ববাংলার বিকাশমান প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সফল হননি। তাঁর *লালসালু*-ও তাই লাভ করেনি প্রত্যাশিত প্রকাশক-আনুকূল্য। তিনি নিজেই উপন্যাসটি প্রকাশ করেন আর প্রকাশক হিসেবে ব্যবহার করেন তাঁর মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের কলকাতাস্থ প্রকাশনা সংস্থা 'কমরেড পাবলিশার্স'-এর নাম।[৪৩]

১৯৪৭-উত্তর পূর্ববাংলা ছিল দেশ-বিভাগের যন্ত্রণায় আতুর এবং এর অর্থনীতি হয়ে পড়েছিল উন্মূলিত ও বাস্তুত্যাগী মানুষদের আগমন-সমস্যায় পাণ্ডুর, আনত। জাতীয় জীবনের এই সংকট, পূর্ববাংলার সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের এই বাস্তবতা, নতুন মেরুকরণ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনঃসংযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়নি বরং তা তাঁর সহৃদয় ও সংবেদী চৈতন্যকে করেছে স্পন্দিত ও প্রতিক্রিয়া-চঞ্চল। এ পর্বে রচিত তাঁর পূর্বোক্ত গল্পদ্বয় ও উপন্যাস ওয়ালীউল্লাহ্-মানসের সেই সংরক্ত ও সংক্ষুব্ধ পরিচয়কেই ধারণ করে, ঘরছাড়া মানুষদের অসহায়ত্ব ও একাকিত্ববোধ এবং তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা

লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার রূপবর্ণিমা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। *লালসালু* সে-অর্থে সমকালীন, কোনো বিশেষ দেশকালের শিল্প-অভিজ্ঞান নয়; এ উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই বিশেষ সত্যকেই প্রতীকায়িত করেছেন যেখানে ব্যক্তি তাঁর মেধা ও কৌশল-বুদ্ধি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থা থেকে বর্ণবিভ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার সব থেকে এবং সে সবকিছু পেয়েও নিজের মধ্যে বহন করে সেই অবিভাজ্য অনুভূতি যার অন্য নাম নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, অনিকেতবোধ। *লালসালু* নির্ধারিত কালসৃষ্ট হয়েও সার্বকালিক, বিশেষে হয়েও নির্বিশেষ।

বস্তুত, দ্বিতীয় পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিরলপ্রজ, প্রথম পর্যায়ের তুলনায় আরো নিঃসঙ্গ, বিবরবাসী ও আত্মমগ্ন।

চতুর্থ পর্যায় (১৯৫১-১৯৭১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবনের চতুর্থ বা অন্তিম পর্যায় সর্বাধিক দীর্ঘ : তাঁর করাচি বদলি (১৯৫০) থেকে মৃত্যু (১০ অক্টোবর ১৯৭১) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। বিশ বছরেরও অধিককাল পরিসরে গঠিত এ পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চাকরি-সূত্রে প্রাচ্য দেশীয় ও পাশ্চাত্যের উল্লেখযোগ্য নগরসমূহে অবস্থান করেছেন আর এ বসবাস শুধুই কালযাপন, মসিজীবীর একনিষ্ঠ কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমায়িত থাকেনি। করাচি-নয়াদিল্লি-সিডনি-জাকার্তা-লন্ডন-প্যারিসে অবস্থানের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আন্তর্মহাদেশীয় সভ্যতা, মানুষের জীবনাচরণ ও জীবনবোধ, সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত এবং সমসাময়িক সাহিত্যের গতিধারা, অগ্রগতি ও উৎকর্ষে পরিস্নাত হয়েছেন; আর এ অন্বয় ও নৈকট্য তাঁর জীবনদর্শন এবং সাহিত্য-কর্মকেও গভীরভাবে করেছে প্রভাবিত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবনের এই বিংশতি বৎসর সৃষ্টিপ্রাচুর্যেও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ-কাল পরিসরেই আমরা পেয়েছি *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) এবং ইংরেজি ও ফরাসি রচনা ব্যতীত দুটি উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) ও *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) এবং তিনটি নাটক *বহিপীর* (১৯৬০), *তরঙ্গভঙ্গ* (১৩৭১/১৯৬৪) ও *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪)।

ঢাকা-জীবনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তেমন স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বোধ করেননি। বলা যায়, ঢাকায় তিনি নিজেকে এক-প্রকার গুটিয়ে রেখেছিলেন। করাচি বদলি তাই তাঁর জীবনে সুবাতাস বয়ে আনে; কলকাতা-জীবনের মতোই তিনি হয়ে ওঠেন গতিময়। করাচিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অবস্থান করতেন মুহাম্মদ গুলজার হোসেন খানের বাসায়। তাঁর সঙ্গে থাকতেন বন্ধু আহমেদুল কবির। অর্থাৎ, এ পর্বে তিনি কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের জীবনই অনেকটা ফিরে পেয়েছিলেন। ওয়ালীউল্লাহ্র, এতোকাল পরিচিত, ব্যক্তিত্ববান, মেধাবী, গম্ভীর, মিতবাক ও সপ্রতিভ রূপের বাইরেও তাঁর একটি রঙ্গ-রসময়, কৌতুকপ্রিয় ও হাস্যোজ্জ্বল এলাকা ছিল। তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের এই বিশেষ পরিচয় পূর্বে আবিষ্কৃত না-হলেও করাচি-পর্বে তা আর গোপন থাকেনি :

> তাঁর মামাত বোন মিসেস বাকী ছিলেন অতিশয় লাজুক প্রকৃতির মহিলা, একা কখনো রাস্তায় বেরুতেন না। একদিন সন্ধ্যের পর ওয়ালীউল্লাহ্ বাজি ধরলেন যদি মিসেস বাকী তাঁর বাসার প্রায়-সংলগ্ন একটি বিপণীকেন্দ্র থেকে একটি শাড়ি কিনে আনতে পারেন তবে তিনি তাকে এক শ টাকা দেবেন। বাজিতে অবশ্য ওয়ালীউল্লাহ্ হেরে গিয়েছিলেন... । প্রিয়জনের সান্নিধ্যে এসে ওয়ালীউল্লাহ্ প্রায়শই তাঁর উঁচু ও দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের পোশাকটি খুলে রাখতেন।[৪৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অগ্রন্থিত গল্প 'সাত বোন পারুল' (মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৪৯; দ্বিতীয় দফা: পৌষ ১৩৪৯) তাই আত্মজৈবনিক; এর প্রচ্ছন্ন কৌতুক, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও স্মিত রসিকতা তাঁর জীবনবোধের সঙ্গেই গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

করাচি-বাসকালে আমরা হৃদয়-শাসিত, ভালোবাসাতৃষ্ণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গেও পরিচিত হই। ইতালীয় তরুণী, রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পি-এইচ ডি ডিগ্রির অধিকারিণী ক্যাসাবিয়াংকার সঙ্গে এ সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠতা তাঁর বন্ধুদের অনেককেই কৌতূহলী করে তোলে।[৪৪] তাঁরা মনে করতেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-ক্যাসাবিয়াংকার সম্পর্ক সাধারণ বন্ধুত্বের পর্যায় অতিক্রম করে তাঁদের হৃদয়গভীরে সমাহিত হয়েছে। কিন্তু অচিরেই ভিন্ন সত্যের ঝলকানি চোখে পড়ে। ক্যাসাবিয়াংকা নয় বিশিষ্ট উর্দু লেখিকা বুর্‌রাতুন আয়েন-ই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র হৃদয় হরণ করেছেন। তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, খুবই আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছিল :

> সুদর্শনা ও তন্বী মিস আয়েনের মৌরীপুরের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন ওয়ালীউল্লাহ্। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল আড্ডা চলতো।[৪৫]

অকস্মাৎ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নয়াদিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসে প্রেস অ্যাটাশে হিসেবে বদলি হওয়ায় তাঁদের এ সম্পর্ক আর দীর্ঘায়িত হয়নি, লাভ করেনি স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি।

করাচি-পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিত্রশিল্পী-সত্তাও অনুকূল প্রবর্তনা লাভ করে। *দি ডন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর তিনটি প্রবন্ধ Zubeyada Aga: Pioneer of Abstract Art in Pakistan, Sadekin : The Young Artist এবং Joynul Abedin : A Victim of Conflicting Ideas. স্মরণীয়, *চাঁদের অমাবস্যা*, 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' এবং *কাঁদো নদী কাঁদো*-র প্রচ্ছদ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক অংকিত।[৪৬] তাঁর প্যারিসের অনতিদূরবর্তী বাস-ভবনের দেয়ালে সন্নিবেশিত চিত্রকর্মের শিল্পীও ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে।[৪৭]

নয়াদিল্লি থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বদলি হন (অক্টোবর ১৯৫২) অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। ১৩ অক্টোবর ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি সিডনিতে ছিলেন। সিডনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও সৌভাগ্য বয়ে আনে। তিনি রচনা করেন *বহিপীর* (১৯৬২) নাটক এবং সম্মানিত হন পি ই এন-এর আঞ্চলিক পুরস্কারে। পরবর্তীতে *লালসালু*-র জন্য তিনি *বাংলা একাডেমী পুরস্কার*-ও লাভ করেন। কিন্তু সাহিত্যের উৎকর্ষ বিবেচনায় কোনো প্রতিযোগিতা কিংবা পুরস্কারকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শীর্ষজ্ঞান করেননি। শওকত ওসমানের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর সেই

মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করলে তিনি তাঁকে লেখেন :

> শুনলাম বড় পুরস্কার পেয়েছ, তাই লিখছি। অবশ্য এটা একটি অজুহাত, কারণ তুমি একটা পুরস্কার পেয়েছ তা কী এমন বড় খবর। পুরস্কারের খুশী হবার কথা, তোমার নয়। আমাদেরও নয়।[৪৮]

সিডনিতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিচয় হয় ফরাসি দূতাবাসের কর্মচারী অ্যান মারির। ক্রমান্বয়ে তাঁরা হয়ে ওঠেন আরো ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। অ্যান মারি হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। কিন্তু তাঁদের বিয়ে হয় আরো পরে, ৩ অক্টোবর ১৯৫৫ সালে। উল্লেখযোগ্য, ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন ভাষার মহিলাকে ভালোবাসলে, হৃদয় দান করলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অতিদ্রুত, ধর্ম কিংবা ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে অ্যান ম্যারির সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হননি। চাকরিগত বাধার চেয়ে তাঁর অন্তরের আপত্তিই সম্ভবত এ-ক্ষেত্রে ছিল প্রবল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-মারি-র বিয়ে তাই ইসলামি শরিয়ত অনুসারেই সম্পাদিত হয়। বিয়ের সময় অ্যান মারি ধর্মান্তরিত হন এবং তখন তাঁর নাম হয় আজিজা মোসাম্মদ নাসরিন।[৪৯]

সিডনি থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্বল্পকালের জন্য প্রথমে ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য অফিসে এবং পরে করাচির তথ্য-মন্ত্রণালয়ে বদলি হন। অতঃপর তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর পদটি বিলুপ্ত হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জাকার্তায়ই থেকে যান এবং পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিবের মর্যাদায় তাঁকে আত্তীকরণ করা হয়।

মানুষ হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, তীক্ষ্ণধী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সচেতন ও সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত। মনোধর্মের এই বিশেষ সংগঠনের কারণেই সমকালের বৈশ্বিক রাজনীতি, ধনবাদী সমাজের আগ্রাসন ও জোটবদ্ধতা এবং কমিউনিস্ট বিশ্বের ভাঙা-গড়া তাঁকে করেছে প্রভাবিত ও স্পর্শিত।[৫০] বিভিন্ন দেশ ও মানুষ সম্পর্কেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছিল প্রবল কৌতূহল ও অপার অনুসন্ধিৎসা। চাকরিসূত্রে তিনি পৃথিবীর যে-দেশেই গিয়েছেন সে-দেশ ও সে-দেশের মানুষ, সমাজ-সংগঠন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শিল্প-সংস্কৃতি তাঁর গভীর মনঃসংযোগ কেড়েছে। ১৯৫৬ সনে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থান-কালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-বন্ধু ও সহপাঠী। এ কে নাজমুল করিমকে লিখিত পত্রে তার এই বিশেষ ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় :

> I am glad you already know something about Indonesia. It is a curious country because despite the fact they are supposed to be muslims like us, they are yet so different. Perhaps Indonesia is the only country in the world where Islamic democracy could be practised. Islam did not come here as conquerors and empire-builders. Therefore as you do not come across magnificient architectural monuments, you do not also find fuedal class. One East Pakistan boy who studied in the Institute for Islamic

> Studies at McGruill University of Montreal is at present doing research work here. He has already travelled nearly eight thousand miles in Indonesia collecting documents and necessary data. Whenever he is in Jakarta he tells me amazing things about this country.[৫১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনাদর্শে প্রোথিত বীতমূল চেতনা, নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি এ পর্বেও বর্তমান। নাজমুল করিমকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রে তিনি জানিয়েছেন :

> I feel terribly rootless and dejected sometimes. I do not know why I should be doing this kind of job. I have no friend either, I mean a real friend.[৫২]

জাকার্তা থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ লন্ডন (ডিসেম্বর ১৯৫৮ থেকে ১৮ অক্টোবর ১৯৫৯) অতঃপর পশ্চিম-জার্মানির বাদ গোডেসবুর্গে (১৯ অক্টোবর ১৯৫৯ থেকে ১৯ মার্চ ১৯৬১) কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নিযুক্তি লাভ করেন প্যারিসে। কখনো প্রেস অ্যাটাশে হিসেবে, কখনো প্রথম সচিবরূপে, কখনো ইউনেস্কো-তে প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্টরূপে আবার কখনো চাকরি হারিয়ে কর্মহীন অবসর জীবনের শেষদিনগুলি তিনি ফরাসি রাজধানীতেই অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু প্যারিসকে তিনি কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সে-দেশীয় সমাজব্যবস্থা ও মানব-সম্পর্ক তাঁর চেতনায় কীভাবে ধরা দিয়েছিল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সে-বিষয়ক স্বীকারোক্তি দুর্লক্ষ। পরিচিত কিংবা বন্ধুজনদের কাছে লিখিত পত্রেও তাঁর এ সম্পর্কিত অনুভূতির পরিচয় মেলে না। তবে সৃষ্টিই স্রষ্টার চেতনার অভিজ্ঞান, তাঁর জীবনবোধের ভাষ্য, তাঁর আন্তর সংবেদনার অভিসন্দর্ভ। তাই দ্বিতীয় কোনো স্বীকারোক্তি কিংবা ঘোষণাকে পরিহার করেও তাঁর মনোধর্ম ও চেতনালোকের স্বরূপ, প্রতিভার সংবেদনশীল চেতনায় সমকালের উপস্থিতি ও প্রভাবের রূপরেখা নির্মাণ সম্ভব।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্যারিস আগমনের কিছু পূর্বে, বর্তমান শতাব্দীর পাঁচ দশক থেকেই ফরাসি সাহিত্যে বিশেষত, উপন্যাস ও নাটকে নতুন চিন্তাকে প্রাধান্য দানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নাতালি সারোৎ (জন্ম ১৯০২), ক্লোদ সিমঁ (জন্ম ১৯১৩), আল্যা রব-গ্রীয়ে (জন্ম ১৯১২), মিশেল ব্যুতর (জন্ম ১৯২৬) প্রমুখ উপন্যাসিকের মাধ্যমে 'নুভো রমাঁ' বা নব্য ঔপন্যাসিক আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অস্তিত্ববাদীরা[৫৩] মানুষের অস্তিত্বকেই সর্বশীর্ষ জ্ঞান করেন। তাঁদের মতে, মানবের ভেতর ও বাইরের কোনো যৌক্তিকতা নেই আবার মানবপ্রকৃতি বলে পৃথক কোনো সারবান সত্তাকেও তাঁরা স্বীকার করেননি। ঈশ্বর আছেন এমন কোনো সত্যের প্রতিফলনও তাঁরা মনুষ্যজগতের ঘটনাবলিতে প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁদের বিবেচনায় মানুষের স্বাধীনতা সীমাহীন এবং প্রতিটি মানুষের বাঁচার মধ্য দিয়েই তার সেই সারস্বত সত্তা ঘোষিত হয়; আর নিজের প্রতি তার দায়িত্ব হলো এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করা এবং অন্যদের তা অনুধাবন করানো। অন্যদিকে নব্য-উপন্যাসে

আস্থাবানরা[৫৪] ভিন্ন চিৎপ্রকর্ষসহ উপস্থিত হন। তাঁরা উপন্যাসের প্রচলিত ধারার বিপরীতে গিয়ে এবং এই শিল্পরূপের সাংগঠনিক ক্রমধারাকে অস্বীকার করে নির্মাণ করেন বিমূর্ত শিল্পজগৎ, পাঠক ও লেখককে অভিন্ন বিন্দু, মানস-অবস্থানে স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।[৫৫] ফলে আত্মপ্রকাশ কালে নুভো রমাঁ ফরাসি মানসকে বেশ বিলোড়িত, আকর্ষিত ও এই চেতনাবাহিত শিল্পের জগতে মনঃসংযোগ প্রদানের আহ্বান জানায়। ফরাসি কথাসাহিত্যের এ-আন্দোলন সবিশেষ গুরুত্ববহ ও নিগূঢ়ভাবে তাৎপর্যময়। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আকর্ষণ ছিল পূর্বগামীদের প্রতি, অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিক-নাট্যকার জঁ-পল সার্ত, আলবেয়ার কামু-র প্রতিই সমধিক নিবদ্ধ। তাঁর এ পর্বে রচিত *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসদ্বয়ের বিষয়-ভাবনা এবং শিল্পপ্রকরণ সৃষ্টিতেও অঙ্গীকৃত হয়েছে সার্ত-কামু-র অস্তিত্ববাদী দর্শন, ইমপ্রেশনিস্টিক ও সুররিয়ালিস্টিক বিন্যাস-কৌশল, তত্ত্ব ও উপাদান।

বস্তুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণগত উৎকর্ষ-জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিতি, সমাজ-সংগঠন ও মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণা, এবং এ সবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তর ক্রিয়ার মাধ্যমেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন হয়েছে বিকশিত, ক্রম-রূপান্তরিত হয়েই প্রজ্ঞাময় সত্তায় সংহত। পূর্বে উল্লেখিত তথ্য, জীবনবৃত্তান্ত থেকেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সেই বিশেষ জীবনাদর্শই নিষ্কাসিত হয়। তাঁর এই আত্মগত, দেশজ ও বৈশ্বিক উৎস-সংগৃহীত ও সমীকৃত জীবনদর্শনের অত্যুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যসমূহ এভাবে, সূত্রাকারেও নির্দেশ করা যায়:

১ পারিবারিক পরিবেশ, পিতার শ্রেণী-চরিত্রগত অবস্থানের কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাল্যকাল থেকেই তাঁর সত্তার গভীরে একটি বিচ্ছিন্নতা-বোধ বহন করেছেন। পরবর্তীতেও তাঁর এই উন্মূল-চেতনা দূর হয়নি বরং অধীতবিদ্যা ও অভিজ্ঞতা প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তা দার্শনিক তত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক ধরনের অনিকেত চেতনার, তাঁকে স্থাপিত করেছে অন্তর্গত মানবীয় পরিস্থিতির মধ্যে;

২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বজাতি-বোধ ও মানবপ্রীতি তাঁর স্বদেশপ্রেমের সূত্রে অর্জিত হলেও কালান্তরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই বিশেষ অনুভূতি দায়িত্ববোধে সংযুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মানবিক অস্তিত্ববাদে।

৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বিবিক্ত চেতনাকে লালন করলেও পলায়নী মনোবৃত্তি কখনো তাঁর জীবনদর্শনে অঙ্গীভূত হয়নি। তিনি যুগপৎভাবে ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়দৃঢ় থেকেছেন।

৪ জগৎ ও জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিভান শক্তিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তার এক অপূর্ব অধিশ্রয়ণ ও সংশ্লেষ সাধিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতে একই সঙ্গে কল্পনাপ্রিয়তা, বস্তুকে পঞ্চেন্দ্রিয় নৈকট্যে স্থাপনের মাধ্যমে চিত্ররূপময় করে নির্মাণের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর সেই অভিপ্রায় ও শিল্পিচিত্তের সংবেদনার মূলে রয়েছে এ দেশীয় জীবনবোধ, চিত্রকলার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর আবাল্যের অনুরাগ। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রকাশরীতি কেবলই দেশজ থাকেনি তা হয়েছে ইয়োরোপীয় এক্‌সপ্রেশনিজম-ইমপ্রেশনিজম দ্বারা প্রভাবিত ও প্রসাধিত।

৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে ঘটনার বিপুল সমাহার কিংবা ঘটনা-নিরপেক্ষ অবস্থান জীবনের সংজ্ঞার্থ নয়। তাঁর মতে, ঘটনাসৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও মেধাবী সত্তার পুনর্জাগরণই হচ্ছে জীবন।

৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিবেচনায় ব্যক্তিকে অবশ্যই এক-সময় তার চেতন সত্তাসহ প্রকাশিত হতে হয়। তার জীবনে কখনো এমন অস্তিত্বকামী মুহূর্ত আসে যখন তাকে পতঙ্গসদৃশ, মেরুদণ্ডহীন হলে চলে না। সকল অনিশ্চয়তাবোধ, পরিণামভীতি বিসর্জন দিয়ে অবশ্যই তাকে হতে হয় তারই বিবেকের জাগ্রত প্রতিনিধি, তার জাগর ও প্রতিবাদী চেতনার প্রতিভূ।

৭ নির্বাচিত বাস্তবতার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনের পরিপূর্ণ রূপকে খোঁজেননি। সংকলন ও বিকলন প্রবণতাসহ চলিষ্ণু, ভালো-মন্দমিশ্রিত, দ্বান্দ্বিক সমগ্র এক মনোজৈবিক শুদ্ধ সত্তাকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন বলে মেনেছেন। তাঁর জীবনদর্শনে রয়েছে সমগ্রতাবোধ, মানবিক পরিপ্রেক্ষিত ও তাঁর পূর্ণায়ত সামঞ্জস্য-চেতনা।

ফলকথা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম, তাঁর গল্প, উপন্যাস ও নাটক তাঁর জীবনদর্শনের শব্দরূপ, সযত্নসৃষ্ট অভিজ্ঞান। অন্য কথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনবোধ ও তাঁর প্রতিভান শক্তির শব্দসৃজিত রূপকল্পই হচ্ছে তাঁর সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস ও নাটক।

তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন; জানুয়ারি ১৯৮৬, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-প্রসঙ্গ: *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, পৃ ৩৮১

২ সৈয়দ আবুল মকসুদ; ডিসেম্বর ১৯৮১, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, মিনার্ভা বুকস : ঢাকা, পৃ ২৫

৩ সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত): জানুয়ারি ১৯৮৬, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, পৃ ৩৮২

৪ সৈয়দ আবুল মকসুদ : ১৯৮৩, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: মিনার্ভা বুকস, পৃ ২৫

৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৮২

৬ এ কে নাজমুল করিম : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্; *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩১ অক্টোবর, ১৯৭১

৭ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ২৬

৮ আবুল ফজল; ২য় সংস্করণ ১৯৬৮, *রেখাচিত্র*, চট্টগ্রাম: বইঘর, পৃ ২৬২

৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৮৪

১০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ২৬

১১ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৬

১২ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৯

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৬

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৯

১৫- ১৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪০

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৬
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪০
১৯ সৈয়দ আকরম হোসেন (সংগৃহীত-সম্পাদিত) ; ১৯৮৭, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, পৃ ১৫৩
২০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩৪৬
২১ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮
২২- ২৩ সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : কিছু খণ্ডস্মৃতি, *দৈনিক সংবাদ*, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
২৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩৪১
২৫ সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : কিছু খণ্ডস্মৃতি, প্রাগুক্ত।
২৬ সৈয়দ আকরম হোসেন: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, বাংলা একাডেমী: ঢাকা, পৃ ২৩
২৭ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ২৭
২৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী-২, ৫৪২
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৬
৩০ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-বন্ধু সৈয়দ নূরুদ্দিন ছিলেন একাধারে কবি, সাংবাদিক ও আজীবন বামপন্থী রাজনীতিতে নিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য-১, পৃ ৩৪০
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৩
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৭
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৪
৩৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৮৬
৩৫ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, এপ্রিল ১৯৬৯, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৮১, *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, কলিকাতা: প্রকাশ ভবন, পৃ ১০
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩
৩৭ *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা;* ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ ৩৩
৩৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩১
৩৯ সৈয়দ আকরম হোসেন; *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ১৭
৪০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩১
৪১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য-২, পৃ ২৯
৪২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীদন ও সাহিত্য-১, পৃ ৯২
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৩২
৪৪ ৪৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩২
৪৬ মোহাম্মদ নাসির আলী; কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ অক্টোবর, ১৯৭১
৪৭ এ. কে. নাজমুল করিম; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩১ অক্টোবর,১৯৭১
৪৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-২, পৃ ২৩৪
৪৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩৪
৫০ দ্রষ্টব্য: *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৮৮-৮৯
৫১ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন ও সাহিত্য*-১, পৃ ৩৪৮-৮৯
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৯
৫৩ Samuel Enoch Stumpf : 1975. Socrates to *Sartre : A History of Philosophy*. New York : Mcgrow Hill-Book Company. pp.482-88
৫৪ দ্র.: অরুণ মিত্র; এপ্রিল ১৯৮৫, *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে*, কলকাতা: প্রমা, পৃ ১১২-১৩
৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ
অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীল সত্তার সাফল্য, খ্যাতি ও সিদ্ধি মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে হলেও তাঁর অন্তর্লীন সৃজন-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে মুখ্যত গল্পকাররূপেই। আত্মপ্রকাশের প্রারম্ভিক মুহূর্তে তিনি কবিতা এমনকি প্রবন্ধেরও চর্চা করেছেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা স্রষ্টার খেয়াল ; তাঁর কৈশোরক অনুরাগমাত্র। খণ্ডকাল স্থায়ী এই ভালোলাগা তাই যৌবনের মেধাচর্চিত স্বভাবে সংহত ও স্থায়ী হয়নি। *মাসিক সওগাত*-এর ফাল্গুন ১৩৪৯ এবং 'মৃত্তিকা' পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাদ্বয় যথাক্রমে 'প্রকল্প' ও 'তুমি' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাব্যচর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবেই কালান্তরে স্মরণীয় এবং তাঁর প্রতিভা-মূল্যায়নের উজ্জ্বল উপাত্তরূপেই গৌরবান্বিত হয়ে আছে। অনুরূপভাবে তাঁর প্রবন্ধ[১], চিত্র-সমালোচনা[২], ও গ্রন্থ-আলোচনা[৩] ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনোগঠন ও তাঁর প্রাতিস্বিক স্বাতন্ত্র্যকেই কেবল আভাসিত করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণ ও সমগ্রভাবে তাঁর বিপুল সংখ্যক গল্প, তিনটি উপন্যাস ও ত্রয়ী নাটকেই আবিষ্কার করা যায়। বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথমে গল্পকার, মধ্যপর্বে ঔপন্যাসিক এবং অতঃপর নাট্যকার; আর এ জন্যই তাঁর সাহিত্যকর্ম বিবেচনা ও বীক্ষণে গল্পই প্রথম প্রাধান্য ও গুরুত্ব লাভ করে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম গল্প-সংকলন *নয়নচারা* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থবদ্ধ গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর আরো প্রকাশিত গল্পের সন্ধান মিলেছে। এ সব গল্পের অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে *মাসিক সওগাত* ও *মাসিক মোহাম্মদী*-তে এবং *নয়নচারা* গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে। অবশ্য 'নয়নচারা' গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগেই *পূর্বাশা* পত্রিকায় পত্রস্থ হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাক-*নয়নচারা* পর্বের গল্পের সংখ্যা বিশ। গল্পগুলি কেনো অগ্রন্থিত এবং এর নেপথ্যে লেখকের কোনো প্রচ্ছন্ন দ্বিধা, শৈল্পিক কুণ্ঠা ক্রিয়াশীল ছিল কি-না তা এখন আর জানার উপায় নেই। কোনো প্রতিভাই সয়ম্ভূ নয় কিংবা মেঘলুপ্ত আকাশে অকস্মাৎ সূর্যোদয়ের মতো হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে না। দীর্ঘ বাধার পথ পেরিয়েই তাঁকে অগ্রসর ও সাফল্য লাভ করতে হয়। তাই একজন সৃষ্টিশীল সত্তার প্রারম্ভিক কোনো রচনাই অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন নয়। স্রষ্টার সমগ্র সত্তার বিকাশ-বিস্তার আলোচনায়, তাঁর বহুবর্ণিল জীবনার্থের স্বরূপ অন্বেষায় এগুলি নিগূঢ়ভাবে প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সতেরো বৎসর বয়সে রচিত 'সীমাহীন এক নিমেষে'-ই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম গল্প, আদি রচনা। একজন কালজয়ী স্রষ্টার কোনো রচনাই শিল্প-বিচারে গুরুত্বহীন নয়। কেননা প্রতিভার আন্তর সংগঠন স্তরবাহিক ও পারম্পর্যাশ্রয়ী। প্রথম রচনাতেই তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার, তাঁর অন্তর্গত শক্তির উত্তাপ, তাঁর বিশেষ মনোগঠন, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পপ্রকরণ বোধের মৌলিক সূত্রাবলি বাষ্পাকারে হলেও উপস্থিত থাকে, আভাসিত ও সংকেতায়িত হয়। তাই বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে নির্ভুল, সুষম না-হলেও 'সীমাহীন এক নিমেষে'-ই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রতিভার যাত্রাবিন্দু ও সূচনামুহূর্ত এবং এই গল্পটিকে আশ্রয় করেই তাঁর ছোটগাল্পিক সত্তা সমাজ ও সময়ের সযত্ন শুশ্রূষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণবহুল প্রভাবে হয়েছে পরিণামী। তাই ভ্রূণাকারে হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সৃজন-স্বরূপের প্রধান প্রবণতাসমূহ, তাঁর শিল্প-আখ্যানগুচ্ছের বৈশেষিক ও রূপাঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্য এ গল্পেই উপস্থিত, দৃশ্যমান ও নির্দেশযোগ্য।

'সীমাহীন একনিমেষে'-র[৪] শিল্পগুরুত্ব সম্পর্কে একটি বিবেচনা স্মরণীয়:

> ...লেখাটিতে রয়েছে কিছুটা পরিণত মনের স্থিরতা: কিশোরসুলভ কাঁচা হাতের ছাপ তাতে তুলনামূলকভাবে কম। ...একটি মাতৃহীন কিশোরের কল্পনায় 'মায়ের অপরূপ মূর্তি' এই গল্পে উপজীব্য।[৫]

স্মরণীয়, 'সীমাহীন এক নিমেষে' প্রকাশিত হয় ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজ বার্ষিকী (১৩৬৯)-তে। বার্ষিকীবদ্ধ অন্যান্য গল্পের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এ মন্তব্য সত্যস্পর্শী হলেও রচনাটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রারম্ভিক ও একক গল্প হিসেবে মূল্যায়নের চেষ্টা অনুপস্থিত এবং এ বিবেচনা চকিত এবং অতিমাত্রায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রতি সমালোচকের অনুরাগ-সম্ভূত। কিন্তু সাহিত্য-মীমাংসায় যুক্তিবর্জিত অনুরাগ ও অকারণ সহানুভূতি প্রত্যাশিত নয়, দায়িত্বহীন ও মনোদ্ভূত মন্তব্যও অনভিপ্রেত। এ কালের সাহিত্য-মীমাংসা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-পরিস্রুত, নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রাশ্রয়ী ও কার্যকারণ সমর্থিত শিল্পশাস্ত্র। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনো মূল্যায়ন কিংবা মন্তব্য থেকে সংবেদনশীল ও দায়িত্ববান সমালোচক বিরত থাকেন। বস্তুত, 'সীমাহীন এক নিমেষে' রচনার মূলে আছে লেখকের দ্বিবিধ প্রেরণা—আমাদের সমাজের শিশুশ্রমের রক্তাক্ত চিত্র-নির্মাণ এবং লেখক-হৃদয়ের এমন একটি বেদনাবিধুর ও অতিমাত্রায় কোমল অনুভূতির আন্তর পরিচর্চা যা একান্তভাবেই তাঁর মায়ের প্রতি লালিত আবেগ ও ভালোবাসা-প্রসূত।

তের-চৌদ্দ বছরের শিশু কাগজ ফেরি করে। এক বর্ষণমুখর দিনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কাগজ দিতে এলে তার প্রতি কথকরূপী লেখকের কেন্দ্রীয় দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁর হৃদয়ে তখন জাগে এই শ্রমজীবী কিশোরের প্রতি এক অনুচ্চ ও অন্তরঙ্গ স্নেহ। তিনি শিশুকে গৃহাভ্যন্তরে আসতে বলেন। শিশু তখন লেখককে বলে :

> 'আজ দু'দিন মার আমার বড্ড অসুখ, টাকার অভাবে অসুধপথ্যি দিতে পারছিনে। দুটি টাকা ধার দিতে পারো আমায় ?'[৬]

পরের দিন সংবাদপত্রের সঙ্গে শিশু তার মা-র আরোগ্যসন্দেশও পরিবেশন করে। আরো বলে: তার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা মাকে একটি উজ্জ্বল নীল আকাশের মতো শাড়ি পরানোর। অতঃপর লেখকের আনুকূল্য ও অনুগ্রহে শিশুর এত দিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে লেখক বন্ধুর কাছ থেকে শিশু-সম্পর্কে ভিন্ন, সম্পূর্ণ নতুন তথ্য লাভ করেন। শিশুর মা-বাবা কেউ নেই। এভাবে মৃত মায়ের কথা বলে কৌশলে সে প্রায়ই অর্থ উপার্জন করে। বন্ধুর ভাষণ তাৎক্ষণিকভাবে লেখককে আহত করলেও তিনি বেশ কৌতূহল বোধ করেন, হয়ে ওঠেন অনুসন্ধিৎসু। অতঃপর সংবাদপত্রে বারুদের গন্ধবাহিত এক দিনে তিনি শিশুকে বলেন: 'সত্যি করে বল শিশু–তোর মা আছে ?'[৭] এ প্রশ্নের কোনো জবাব শিশু দিতে পারেনি। তার মুখ তখন হয়ে পড়ে পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে ও সদ্যচুন-দেওয়া দেওয়ালের মতোই সাদা। দীর্ঘ বিরতির পর বিমূঢ়তা যখন কেটে এসেছে তখন শিশু কেবল 'আছে বলে'-ই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু পরের দিন আবার শিশু ফিরে আসে ও লেখককে তার প্রদত্ত অর্থ ও শাড়ি ফেরত দিয়ে বলে :

> 'মিথ্যে কথা বলে' আমি, মা নেই আমার। কিন্তু মাকে অমনি করে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে।'[৮]

উল্লেখ করা যায় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আট বছর বয়সে তাঁর মা নাসিম আরা খাতুন লোকান্তরিত হন। 'সীমাহীন এক নিমেষে' রচনার অন্তরালে তাই সক্রিয় রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; তাঁর বেদনাময় স্মৃতি ও প্রচ্ছন্ন অভাব-বোধ।

'সীমাহীন এক নিমেষে'-র রসনিষ্পত্তির মূলে অবস্থান করছে শিশুর মায়ের অশরীরী উপস্থিতি। উল্লেখযোগ্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম সচেতনভাবে পাঠ করলেও জানা যায় যে, মৃত্যু ও তৎসৃষ্ট এষণা বা মোটিফ স্রষ্টার বক্তব্য প্রকাশের অন্যতম সহায়ক শক্তি। ফলকথা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে মৃত্যু চরিত্রসমূহের আন্তর সত্তা উন্মোচনের উপায় ও উপকরণ। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তিহৃদয়ে মৃত্যু-জনিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় মৃত্যুর এমন পৌনঃপুনিক ও সপ্রতিভ উপস্থিতি। 'সীমাহীন এক নিমেষে'-ও শিশুর মায়ের অসুস্থতাই লেখককে গল্পধৃত কিশোরটির প্রতি করে তুলছে সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্র। ফলে প্রকৃত সত্য জেনেও তিনি কোনো উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেননি, হয়ে উঠেছেন সংযমশাসিত, অন্তর্মুখি ও সংবেদনাময়।

'সীমাহীন এক নিমেষে' উত্তম পুরুষে বর্ণিত। এর সর্বত্র প্রথম রচনাসুলভ এক ধরনের অনাস্থা ও দ্বিধা সুস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও গল্পটিতে কথকের 'আমি'-র ব্যক্তিক উপলব্ধি ও পারিপার্শ্বিক মূল্যায়ন বিশেষ আকর্ষণ ও অভিনিবেশ দাবি করে। গল্পে 'আমি'-র যে ব্যক্তিস্বরূপ আভাসিত তাতে 'আমি' সাধারণ ও প্রথাবদ্ধ নয় বরং তা ব্যতিক্রমী, অনুভূতিপ্রবণ ও দুঃখময়। তার এই আত্মগত উপলব্ধিই এ গল্পের স্নায়ুকেন্দ্র, মৌল ও অন্তরঙ্গ আকর্ষণ। অন্যদিকে প্লটের আন্তর শৃঙ্খলা শিথিল হয়েও গল্পধৃত চরিত্রের অন্তর্মুখিভাবনা অনুভব ও অনুভূতির ঐশ্বর্যে গল্পটি হয়ে উঠেছে

উজ্জ্বল ও সুখপাঠ্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে যেহেতু ঘটনা নয়' ঘটনাসৃষ্ট চরিত্রের অন্তরঙ্গ প্রতিক্রিয়াই মুখ্য এবং ব্যক্তির সূক্ষ্ম চেতনাস্রোতে বিধৃত ঘটনার নিবিড় উপলব্ধি ও বোধের সংরক্ত স্বরূপ নির্মাণেই তিনি আন্তরিক ও যত্নবান, সেহেতু প্রতীতি সমগ্রতা নির্মাণের পুরোভূমি হয়েছে গল্পের কাহিনীহীন প্লট। শিশুর শ্রমজীবী সত্তা ও জীবনভাবনার বিশ্বস্ত রূপায়ণ অপেক্ষা শিশুর অন্তর্মূলে প্রোথিত চেতনা, তার মাতৃসান্নিধ্য-অভীপ্সা ও আকুতির শব্দরূপ নির্মাণ লেখকের অভিপ্রেত হওয়ায় খবরের কাগজ-ফেরি, কথকের কাছে টাকা-প্রার্থনা কিংবা বন্ধুর কাছে তার প্রকৃত সত্য অবহিত হওয়া ইত্যাদি—গল্পের অনিবার্য পুরোভূমি, পটভূমি কিংবা পরিপ্রেক্ষিত নয়। শিশুর কৌশলবুদ্ধি উন্মুক্ত হওয়ার সেই পরম ক্ষণটি নির্মাণের জন্যে সযত্নচর্চিত আবহসৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পাদন এ গল্পের পটভূমি। আগত সন্ধ্যার স্বল্পালোকিত পরিবেশ, কথকের গ্রন্থ অধ্যয়ন, বন্ধুর আগমন ইত্যাদি আয়োজনের বাধা অতিক্রম করার পরই আমরা জানতে পারি সেই অনিবার্য সত্য: 'সব বাজে কথা। ওর মা বাবা কেউ নেই, শুধু ফাঁকি দিয়ে টাকা মারে'। পরবর্তী অংশে এ তথ্যই সমর্থিত হয়েছে। গল্পের অন্তর্বয়নেও লেখকের সযত্ন ও সতর্কতার ছাপ স্পষ্ট লক্ষণীয়। যুদ্ধ ও জার্মানির অত্যাচার এবং বিশ্বজোড়া আতঙ্কের সঙ্গে পরস্পরিত করেই শিশুর কাছে মেলে ধরা হয়েছে আর এক শঙ্কাকুল জিজ্ঞাসা: 'সত্যি করে বল শিশু—তোর মা আছে?' গল্পটি এর পর সমাপ্ত হলে কোনো ক্ষতি ছিল না বরং শিল্পবিচারে এই সংযম ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু লেখক এর পরও গল্পটি পল্লবিত করেছেন। ফলে ছোটগল্পের অতৃপ্তিমূলক উপসংহারের অতিচেনা পরিণতির ব্যত্যয় ঘটলেও গল্পভুক ও আবেগী পাঠক গল্পটি পাঠে লাভ করেছেন কৌতূহল পরিতৃপ্তির আনন্দ।

কোনো প্রকাশমাধ্যমে স্রষ্টার অভীষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে ভাষার একটি অবিভাজ্য, গ্রিক পুরাণের একো–নার্সিসাসের মতো ঐকাত্ম্য সম্পর্ক রয়েছে। ভাষাই সাহিত্যের প্রধান অভিজ্ঞান, স্রষ্টার নিজেকে প্রকাশের মৌল উপাদান। সাহিত্য জীবনেরই শিল্পরূপ, তারই বহুবিচিত্র ও বিবিধ রূপের অভিব্যক্তি হওয়ার কারণে সাহিত্যের ভাষার কোনো নির্ধারিত, পূর্বনির্দিষ্ট রূপ নেই। এ-ক্ষেত্রেও জীবনের সঙ্গে রয়েছে তার অনবচ্ছিন্ন সাধর্ম্য। জীবন কোনো অবস্থাতেই সমান্তরাল ও গণ্ডিবদ্ধ নয়। নদীর মতোই তা বাঁক ফিরে-ফিরে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়। চলার পথে সব সঞ্চয়, ব্যর্থতা, বিপর্যয় এবং সাফল্যকেও জীবন গ্রহণ করে। সভ্যতার বিবর্তন, মানবচিন্তার নব-নব সংযোজন জীবনের পরিধিকে আরো বাড়িয়ে দেয়, করে তোলে নিঃসীম ও বহুগামী। বস্তুত, জীবন কোনো অবিচল বিশ্বাসে সুরক্ষিত নয় বরং তা একটি জটিল, জঙ্গম ও বিমিশ্র প্রক্রিয়া। ফলে কবিতা, উপন্যাস, গল্প যে-শিল্পরূপে যেভাবেই জীবনের অভিব্যক্তি ঘটুক না কেনো, তার রসভাষ্য, আঙ্গিক, বর্ণনা, ভাষা—সর্বত্রই বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে। এর পরিব্যাপ্তি এখন দেশের সংকীর্ণ
করেও হয়ে উঠেছে বিশ্ব-প্রসারিত।

'সীমাহীন এক নিমেষে' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভার প্রস্তুতিপর্বের সৃষ্টি। নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ও কৌশল অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনধিগত। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টায় কোনো খাদ, আন্তরিকতার মোটেও অভাব নেই। বিষয়কে অনিবার্যভাবে পাঠকহৃদয়ে পৌঁছে দিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সবসময় সচেষ্ট, পরিশ্রমী ও পরীক্ষাপ্রবণ। স্রষ্টার এই অভিনিবেশের কারণে গল্পটির ভাষা-শৈলী নির্মাণে তাঁর সাফল্য সর্বত্র অর্জিত না-হলেও, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মৌলিকত্ব স্পষ্ট সংকেতায়িত হয়েছে। 'সীমাহীন এক নিমেষে' চিন্তার সূত্র ঈষৎ ছিন্ন, প্লটের বন্ধন সামান্য শিথিল হলেও গল্পটির ভাষায় অপরিণতির ছাপ অপেক্ষাকৃত কম। 'সীমাহীন এক নিমেষে'-র সর্বত্র আছে প্রচুর হিরন্ময় উপমা, বিবিধ উৎপ্রেক্ষা ও শিশু-মনের কল্পনা প্রসূত চিন্তার চিত্রকল্প। শিশুর উপস্থিতি ও লেখকের দূরাগত ভাবনার দ্বৈরথ সন্নিপাতে পুরো গল্পটি এমন একটি গদ্য-আখ্যান হয়ে উঠেছে কবিতাকে স্পর্শ করাই যার সহজাত ধর্ম। 'সীমাহীন এক নিমেষে'-র ভাষারীতির কতিপয় দৃষ্টান্ত এ উক্তির সত্যতা প্রমাণের সহায়ক হবে :

১ বৃষ্টির ছাটে আমার সারামুখ ভিজে যাচ্ছে, জ্বলজ্বল করছে আমার মুখ সিক্ত ফুলের মতো। চোখের পাপড়ি ভারি হয়ে উঠেছে, যেন আনন্দের আতিশয্যের মতো।[৯]

২ তার কোমল মুখে শ্রান্তির আর ব্যস্ততার ভাব দেখতে বেশ লাগে। ঠিক যেন তিন-চার বছরের ছোট মেয়ের তার পুতুলের বিয়েতে চিন্তাযুক্ত ব্যস্ততার মত।[১০]

৩ তার সারা পথের কাঁকর আড়াল করে যেন বিছানো আছে মায়ের আঁচল, সারা বাতাসে যেন মায়ের মঙ্গলময় আহ্বান। চোখের সম্মুখে তার অহর্নিশি ভাসছে দুটি চোখ—মায়ের স্নিগ্ধ গভীর উজ্জ্বল চোখ, ধ্রুবতারার মত। পথ চলতে তার ভুল হয় না, পথের আঘাত তার পায়ে লাগে না।[১১]

বস্তুত, লেখকের অন্তস্তল–উৎসারিত আবেগের পরিচয়ে 'সীমাহীন এক নিমেষে' দীপ্ত, বক্তব্য প্রকাশের অনিবার্য কৌশল ও গল্প প্রকরণের দুর্বলতা সত্ত্বেও স্রষ্টার মৌল মানসপ্রবণতা, তাঁর সমাজমনস্ক সত্তার বহির্প্রকাশ ও চরিত্রের বেদনাময় স্বরূপ উপস্থাপন–আগ্রহ এবং কাহিনীকে অতিক্রম করে ব্যক্তি–চৈতন্যে ঘটনাজাত উত্তাপ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টার সৃষ্টিশীল উৎস হিসেবে বিশিষ্ট, ঐতিহাসিক।

প্রাক-*নয়নচারা* পর্যায়ের অন্যান্য গল্প হচ্ছে : 'চিরন্তন পৃথিবী', 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে', 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'প্রাস্থানিক', 'পথ বেঁধে দিল…', 'মানুষ', 'অনুবৃত্তি', 'সাত বোন পারুল', 'ছায়া', 'দ্বীপ', 'প্রবল হাওয়া ও ঝাউ গাছ', 'হোমেরা', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো', 'ও আর তারা', 'সবুজ মাঠ', 'স্বগত' ও 'মানসিকতা'।

'চিরন্তন পৃথিবী'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র নওয়াজের বিপন্ন অনুভূতি ও আত্মিকভাবে বহিরাগত চেতনার শিল্পরূপ। তার জীবনবোধই তাকে স্ত্রী, কুসুমিত প্রকৃতিলোক, সবার কাছ থেকে করেছে দূরায়িত ও বিচ্ছিন্ন। 'চিরন্তন পৃথিবী'-র এই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হয়েছে 'মৃত্যু', একটি 'নগ্ন' 'বিকৃত বীভৎস মৃত্যদেহ'-এর মাধ্যমে।

মাঘমাসের এক ছায়াচ্ছন্ন বিকেলে 'বরফ কণার মত সাদা কাশফুল পায়ে মাড়িয়ে' কাজলা নদীর তীর বেয়ে চলেছে হোসেনা ও তার সদ্য শহর-প্রত্যাগত স্বামী নওয়াজ। দীর্ঘ বিরহের পর এই দম্পতির একান্ত মিলন, সান্ধ্যবিহার। স্বভাবতই তারা আবেগায়িত, উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত। অকস্মাৎ নদীর তীরসংলগ্ন একটি সাদা বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তাদের তরুণ মনের কার্যকারণহীন সংলাপের জলতরঙ্গে বাধা পড়ে। অতঃপর দ্রব্যটির সঠিক পরিচয় অন্বেষণে নওয়াজ হয়ে ওঠে ব্যাকুল ও উদগ্রীব। কিন্তু জ্যোৎস্নার স্বল্প আলোয় যা সে প্রত্যক্ষ করে তাতে তার মধ্যে এক গভীর ও অনপনেয় রূপান্তর ঘটে। বিকৃত, বীভৎস মৃতদেহটি নওয়াজের মনোজগতে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাকে করে দেয় অসাড় ও নিস্পন্দ। অনেক কষ্টে সে নদীর পাড়ে ওঠে। কিন্তু হোসেনা বস্তুটির পরিচয় জানতে চাইলে তার বাক্য নির্গত হয় না। কয়েক মুহূর্ত অতিক্রান্ত হলে 'অতিবিস্মিত ও অতিমৃদু জড়িত কণ্ঠে সে হোসেনাকে' প্রশ্ন করে: 'তুমি কে?' কিন্তু 'এ প্রশ্নের উত্তর সে কি করে দেবে ? সে যে মানুষের ক্ষমতার বাইরে।'[১২]

শ্লথ-বন্ধন প্লটসংবলিত এ সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'চিরন্তন পৃথিবী'-র নওয়াজের মনোগঠন স্বতন্ত্র। সে পরমসূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অন্তঃকরণের অধিকারী হয়েও রোম্যান্টিক, স্বপ্নচারিতা ও উন্মূলিত চেতনা-তাড়িত বলেই তার অনুভূতি ও উপলব্ধিতে এমন গভীর বেদনা-বোধের স্পষ্ট উপস্থিতি, সবকিছুর সঙ্গেই সে আত্মিকভাবে বিযুক্ত।[১৩] ফলে স্ত্রীর প্রতি তার প্রথম উক্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে পৌনঃপুনিক বেদনা ও নৈঃসঙ্গ্যের অসংশয়িত মনোভঙ্গি। সামান্য ব্যবধান, সবুজ বনরেখার একটুখানি পরিচর্চা আবার তাকে করে তুলেছে প্রশ্নশূন্য, হতবাক ও সুদূরের পিয়াসী। ফলে জলসংলগ্ন কোনো সাদা, গলিত, বিকৃত ও বীভৎস মানবদেহ দেখে হিমশীতল কণ্ঠে এমন কার্যকারণহারা, অস্বভাবী প্রশ্ন-উপস্থাপন এবং সে-অনুযায়ী আচরণ তার পক্ষে অসংগত নয় বরং সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। অর্থাৎ, এ গল্পেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটনা, আবহ ও পরিপ্রেক্ষিতকে ব্যক্তির একটি বিশেষ মুহূর্তের মনন ও চেতনাবেগ নির্মাণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং এই সামবায়িক প্রক্রিয়ার সমীকৃত রূপ, ঐক্য-সমন্বয় সৃষ্টির মাধ্যমেই উপনীত হয়েছেন গল্পের প্রতীতিজাত সমগ্রতাবোধে।

আধুনিক গল্পকারেরা চিত্ররীতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত ও নিষ্ঠ হওয়ায় গল্পে ক্রিয়াহীন বাক্য ব্যবহার করে পরিবেশকে আরও মূর্ত, জীবন্ত ও স্পর্শযোগ্য করতে আগ্রহী ও সযত্ন।[১৪] এ রীতির সার্থক প্রয়োগ আমরা রবীন্দ্র-*গল্পগুচ্ছ*-এ লক্ষ করি। এই সৃজনকৌশল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

'চিরন্তরন পৃথিবী'-র ভাষাশৈলী, শব্দযোজনা, বাক্যবিন্যাসেও আশ্রিত ও গৃহীত হয়েছে চিত্রাত্মক পরিচর্যা। গল্পটির প্রারম্ভিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা অনুসরণীয় :

> সম্মুখে বসতিশূন্য প্রান্তর, পাশে শীর্ণ নদীটি, আর ওপরে দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত নীল আকাশ। মাসটা মাঘ। নওয়াজের গায়ে দামী ভারি ওভারকোট, হোসেনার গায়ে গাঢ় লাল রঙের কাশ্মীরী শাল।[১৫]

অন্যত্র মৃতদেহের বর্ণনা :

> একটা নগ্ন মৃতদেহ। সেটার অর্ধেক দেহ জলে, অর্ধেক মাটিতে। ...চারিধারে কেমন একটা পচা দূষিত দুর্গন্ধ।[১৬]

আবার নওয়াজের প্রতিক্রিয়া ও পুনর্জাত ব্যক্তি রূপ প্রত্যক্ষ করে হোসেনার মধ্যে সূচিত গূঢ় ও আকস্মিক পরিবর্তনের পরিচর্যা:

> হোসেনা নির্বাক, বিমূঢ়। তার চোখে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়।[১৭]

রবীন্দ্র–*গল্পগুচ্ছ*-এর ভাষাশৈলীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদ ও কাল-বাচক প্রত্যয়ের ব্যবহার। কালের চলমান স্বরূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ–ইতেছ/–ইতেছে/–ইল প্রত্যয়নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করে বাক্যে অনুপ্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে সাংগীতিক মাধুর্যে করেছেন ঐশ্বর্যবান ও ব্যঞ্জনাগর্ভ। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের-'ইল' প্রত্যয়সাধিত শব্দের ব্যবহার স্মর্তব্য:

১ আমসত্ত কেয়াখয়ের এবং জারক নেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া **গেল**। বৃষ্টি পড়িতে **লাগিল**, বকুল ফুল ঝরিতে **লাগিল**, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া **উঠিল** এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ব কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে **লাগিল**।[১৮]

২ বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া **পড়িল**, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে **লাগিল**। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া **চলিল**।[১৯]

অভিন্ন শিল্প-কৌশল 'চিরন্তন পৃথিবী'তে প্রযুক্ত। 'কুৎসিত দৃশ্য'-এর প্রচণ্ড আঘাতে মানসিকভাবে অসাড়, নিস্পন্দ, এবং অনেক কষ্টে নওয়াজ যখন নদী-কিনার থেকে উঠে এসে হোসেনার সামনে দাঁড়িয়েছে তখন :

> পূর্ণ চাঁদের আলোয় হোসেনার সারা দেহ অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে **উঠেছে**; সুন্দর ছোট মুখটি, কালো-কালো ডাগর চোখ-দুটি অপ্রতিম সৌন্দর্য-লাবণ্যে মায়াময় রহস্যময় হয়ে **উঠেছে**। তাই যেন নওয়াজ একান্তভাবে চেয়ে-চেয়ে **দেখছে**, কিন্তু বারেবারে তার চোখ ঝাপসা হয়ে **আসছে**; মুদে **আসছে**; তার চোখে যেন তন্দ্রা **নাবছে**; সে যেন স্বপ্ন **দেখছে**।[২০]

ফলকথা, 'চিরন্তর পৃথিবী'–তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সতর্ক, ঐতিহ্য-অনুগামী, এবং বাংলা গল্পের স্রোতধারা–সুস্নাত হয়েই একটি নিজস্ব শিল্পলোক, স্বকীয় গল্পভুবন নির্মাণে যত্নবান ও শ্রমনিষ্ঠ।

'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে' (*সওগাত*, মাঘ ১৩৪৮) ও 'ঝোড়া সন্ধ্যা' (*সওগাত*, বৈশাখ ১৩৪৯) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র চেতনার যেন দুই স্তর, যার এক দিকে গ্রামীণ

নিরণ্ন মুসলমান জনসাধারণের জন্য তাঁর অনেকান্ত দুঃখবোধ উচ্চারিত হয়েছে, অন্যদিকে তিনি সংস্থাপিত হয়েছেন উচ্চবিত্তের কল্পনাবিলাসী জগৎ থেকে তুচ্ছসুখের নিস্তরঙ্গ জীবনের চিরায়ত ভূমণ্ডলে। ' চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে ' আনোয়ারের বক্তৃতা, ছালেহার প্রতি নিক্ষিপ্ত তার সংলাপ, স্বজাতির প্রতি তার পুঞ্জিত আবেগ, মমত্ববোধ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে এক আদর্শবান ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছে।[২১] কিন্তু আনোয়ার জানে না যে, 'ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণ নহে। এই-জন্যই ত্যাগের দারিদ্র ভূষণ, অভাবের দারিদ্র ভূষণ নহে।[২২]

গভীরভাবে গল্পটি পাঠ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আনোয়ারের স্বজাতিপ্রেম ও দেশ-উদ্ধারেচ্ছা শেষপর্যন্ত হয়েছে কেন্দ্রচ্যুত, প্রেম-রূপ রোম্যান্টিক বিহ্বলতায় সমর্পিত। একই সঙ্গে গল্পকারও প্রারম্ভিক প্রতিজ্ঞা হয়েছেন বিস্তৃত। তিনি আনোয়ারের সহমর্মী হয়ে এবং ছালেহাকে আনোয়ারের প্রতি প্রেমার্দ্র ও ভালোবাসায় বিনম্র করে তুলেছেন। ছালেহার নীরব অশ্রুপাতের মাধ্যমেই তাই গল্পটি শেষ হয়েছে। সে-অর্থে 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে' আনোয়ার-ছালেহাই প্রত্যক্ষ, আর অন্যান্যের পদপাত পরোক্ষ, কেবলই তথ্যরূপে।

সংশয়াত্মক সংলাপ উচ্চারণের মাধ্যমে শুরু 'চৈত্রদিনের এক দ্বিপ্রহরে'-র বাক্যগঠন 'চিরন্তন পৃথিবী' গল্প থেকে স্বতন্ত্র. বক্তৃতার চড়াসুরে ধ্বনিমন্দ্রিত 'পূর্ণচ্ছেদহীন, কমা-সেমিকোলন গ্রন্থিত দীর্ঘ যৌগিক বাক্যে' বিসর্পিত এবং *Gradual Developing Experience Pattern (G D E)* বা 'প্রথম বক্তব্যের সম্প্রসারিত ক্রম বা অভিজ্ঞতা'-র বিবরণে গতিময় পে নিচের উদাহরণত্রয় প্রণিধানযোগ্য :

১ দুঃখে-দারিদ্রে নিপীড়িত মুসলমানেরা একটা আবছা আকাঙ্ক্ষা ও মিথ্যে মায়ায় ভুলে সর্বদা উন্মত্ত ও অস্থির হয়ে থাকলেও তারা জানে তারা কী; কী অবস্থা তাদের; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ অর্থের নাগাল পায়, তখুনি সে জগতের বাস্তব আকৃতির কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় যে সে মুসলমান।[২৪]

২ সে-চেনাই বড় জিনিস। ...তাদেরকে অনেকেই চেনে না; অনেকেই বলে, তারা সুখী। কিন্তু কী জানো তাদের বিশৃঙ্খল জীবন যেন একটা বিরাট যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটে,একটা জ্বালাময় মর্মযাতনা তাদের তিলে-তিলে ধ্বংস করে।[২৫]

৩ 'আজ পর্যন্ত যে-দেশে যে-জাতিই জেগেছে, তার সে-জাগার পেছনে উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণা দেবার জন্যে জ্বলন্ত ইতিহাস রয়েছে, যে-জাতির ছিলো না, সে-জাতি কাব্য ও কাহিনী রচনা করিয়ে তার সাহায্যে জেগেছে।' আমাদের অতি উজ্জ্বল, অতি অদ্ভুত ইতিহাস আছে, শুধু, চোখের সম্মুখে সে ইতিহাস মেলে ধরতে হবে, প্রাণে-প্রাণে অন্তরে-অন্তরে আমাদেরকে জানতে হবে, অনুভব করতে হবে।[২৬]

প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃতিতে আবার সমধ্বনি ও অভিন্ন বাক্যাংশের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি জনিত আন্বয়িক শৃঙ্খলা[২৭] ও সৌষম্য-সৃষ্ট প্রতিধ্বনি (echo)-র ফলে বক্তব্য হয়েছে

সাংগীতিক ও আরো লক্ষ্যভেদী এবং এ প্রচেষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র গল্পভাষা নির্মাণের সচেতন প্রয়াসরূপেই বিবেচিত ও স্মরণীয়।

'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-র রসনিষ্পত্তির মূলেও মৃত্যুর দর্পিত উপস্থিতি। রহিমার আত্মবিসর্জনই আনোয়ারকে নবচেতনায় পুনর্জাত করেছে। নিজের বিপন্ন অভিজ্ঞতা দিয়েই আনোয়ার বুঝেছে যে, মক্ষিকাবৃত্তিতে মুক্তি নেই, অন্তরের সব ইচ্ছাই পূরণ হওয়ার নয়, নিরুপান্থ আকাঙ্ক্ষার জগতে মুক্তপক্ষ মরালের মতো বিহার করলে ঘরের ঠিকানা থাকে না, চরম অনুশোচনা ও আত্মপীড়নই তখন হয় অন্তিম পুরস্কার। এতদ্‌ব্যতীত প্রেমহীন, প্রীতিশূন্য স্বামিগৃহে কীভাবে একটি সরলপ্রাণ, পতি-অনুরাগী অথচ চরম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্যন্তিক মর্যাদা সচেতন নারী অকালে পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠার পূর্বেই বিনষ্ট ও নিঃশেষিত হয়েছে 'ঝোড়ো সন্ধ্যা' তার এক প্রগাঢ় ট্র্যাজেডি। এক-অর্থে গল্পটি রহিমার ব্যর্থ জীবনের রেখাভাস: তারই একান্ত অন্তর্বেদনা ও বিপন্ন অস্তিত্বের কথামালা।

'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-য় একটি দৃঢ় নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমির সঙ্গে ঐকাত্ম্য করে চরিত্রকে সংস্থাপন এবং অতঃপর তার প্রতি আলোক প্রক্ষেপণ রীতির পরিচর্চা সহজেই আমাদের দৃষ্টি কাড়ে। রহিমার ক্রন্দিত মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ও অন্বিত হওয়ার পূর্বেই আমরা দেখি আকাশে প্রবল ঝড় উঠেছে, ঝম্‌-ঝম্‌ শব্দে অবিশ্রান্ত ও অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। পরিবেশই তার সংবেদনশীল নারীচিত্তকে সমধর্মী কোনো ব্যক্তির হৃদয়িক সহানুভূতি ও অন্তরঙ্গ পরিচর্চা-প্রত্যাশায় অধীর ও উৎকর্ণ করে তুলেছে। ফলে সামান্য উপেক্ষা, মুহূর্তিক দুর্বলতা খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়ে রহিমার চিত্তে এমন এক ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে যা কোনো বৃহৎ পর্বতের পতনের চেয়েও প্রগাঢ়, ভয়াবহ। আবার আনোয়ারের আকাঙ্ক্ষিত মমতাজ যখন ফিরে এসেছে এবং রেল স্টেশনগামী গাড়িতে উঠে আত্মহত্যা করেছে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, রাত্রি নীরব, নিথর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মিট্‌মিট্‌ করে আলো জ্বলছে। আবার 'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-য় অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টি এসে এবং একটু রাত বাড়লে যখন বর্ষণ থেমে গিয়ে পরিবেশে যে নির্জনতা ও প্রশান্তি নেমে এসেছে তা এ গল্পে দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নির্জন পরিবেশ রহিমা যেমন তার আত্মহত্যার ক্ষণ হিসেবে নির্বাচন করেছে তেমনি এই বিশেষ প্রাকৃতিক আকর্ষণ, গীতল ও আবেগসঞ্চারী আবহাওয়ায় আনোয়ার হয়েছে মমতাজমুখি। অন্যদিকে মানসিকভাবে হলেও মমতাজ কামনা করেছে আনোয়ারের সান্নিধ্য ও সখ্যা। আর তাই সে ছুটে এসেছে আনোয়ারের গৃহে। অন্য দিকে হঠাৎ ঝড় থেমে- যাওয়া মুহূর্তটি রহিমার জীবনদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে তাই সমান প্রতীকায়িত।

সংগঠন অপেক্ষা ভাষা, শব্দ-ব্যবহার কুশলতাই 'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-র অধিক গৌরব। গল্পে 'ঝড়' শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রলয় কিংবা ধ্বংসের অনুষঙ্গবাহী এই পদটি 'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-য় মোট চব্বিশ বার

প্রযুক্ত হয়েছে। গল্পের সূচনায় ঝড় আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েও তা রহিমার এত দিনের দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য ব্যবচ্ছেদ ও পতনের সংকেতবহ। প্রকৃতির সঙ্গে সমান্তরালভাবেই রহিমার অন্তরে বয়ে চলেছে এক প্রলয়ঙ্করী বাত্যা :

> বাইরে আকাশ কাঁদছে, ঘরে কাঁদছে রহিমা। ঝম্‌ঝম্ শব্দে অবিশ্রান্ত অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে: বৃষ্টির ছাটে জানলার স্বচ্ছ সার্শিগুলো ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা হয়ে উঠছে: অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে পানিঝরার একটানা করুণ সুরে-সুরে রহিমা কাঁদছে ...।[২৮]

কিন্তু আনোয়ারের মধ্যে তখন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। ঝড়ের মতোই দ্রুত গতিতে তার মন তখন মমতাজ-প্রত্যাশী; তার একান্ত ও পরম অভিপ্রেত হৃদয়হরণার সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল, সতৃষ্ণ :

> একবার খুব করে জোর ঝোড়ো হাওয়া বইলে হতো, তাহলে নিমেষে উড়ে যেতো সব জমাট নীরন্ধ্র মেঘ, সন্ধ্যাকাশ মলিন না হয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, সে-ঔজ্জ্বল্য মমতাজকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসতো। তবে ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে মালিন্যই ওর পক্ষে বাঞ্ছনীয়, কারণ বর্ষামুখর রাতে ওর কালো-কালো চোখ দুটি কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে। সে-রহস্যময় চোখের পানে তাকালে মনে হয়, সে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার পানে তাকিয়ে রয়েছে, অথবা তাকিয়ে রয়েছে দিগন্তের পানে— যেখানে সাগর আর আকাশ এক হয়ে মিশেছে।[২৯]

ঝড়ের অনুষঙ্গে জীবন-সম্পর্কিত বেশকিছু গূঢ়ার্থবাহী বাক্যও লেখক এ গল্পে নির্মাণ করেছেন যেগুলির সত্য রূপ আমরা আনোয়ারের অন্তিম পরিণতিতে লক্ষ করি :

> ১ জীবনটা ঝড়। চলবার পথে সম্মুখে যতো বাধাবিঘ্ন—সব ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে চলতে হবে নতুনতর সুখশান্তির নিমিত্তে।[৩০]
>
> ২ কিন্তু জীবন হলো ঝড়, সে-ঝড় শুধু ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় সম্মুখের যত বাধাবিঘ্ন, যত অবাঞ্ছিত অন্তরায়।[৩১]

'প্রাস্থানিক' (মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪৯/আগস্ট ১৯৪২) যেন রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের ভিন্ন পিঠ। এ গল্পে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই বিচ্ছেদ নয় শান্ত-মধুর মিলন। জীবন চলিষ্ণু হলেও অনবিচ্ছিন্নভাবে পথ চলা যায় না। এক-সময় জীবনের ধাবমান গতিও ব্যাহত হয়, নোঙরের শাসন স্বীকার করে। পোস্টমাস্টাররা শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতেই রতনদের ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু এই ট্রান্‌জিশন্যাল সোসাইটির অনতিক্রম্য সাংস্কৃতিক বিক্ষেপ যেখানে নেই, বিচ্ছেদের দীপ্র দহনের পরিবর্তে সেখানে নেমে আসে মিলনের, এতকালের অধরাকে নতুনভাবে পাওয়ার আনন্দ। আয়েষাই তাই জয়ী হয়। প্রস্থান-উদ্যত সাঈদ ফিরে আসে তার সান্ত্বনা ও শুশ্রূষার অফুরন্ত উৎসে।

'প্রাস্থানিক'-এর সংগঠন কিংবা ভাষাশৈলীতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প-প্রতিভার কোনো নতুন দিগ্‌নির্দেশ নেই তা পূর্ববর্তী গল্পসমূহেরই অনুবর্তন, সম্প্রসারিত রূপ।

'পথ বেঁধে দিল' (*সওগাত*, আশ্বিন ১৩৪৯/সেপ্টেম্বর ১৯৪২) গল্পে রাহেলা রাতের আঁধারে কোনো রেলগাড়ির কামরায় যেভাবে অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব কামাল চৌধুরীর

সামনে উপস্থিত এবং অতঃপর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তা অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের জগতেই কেবল সম্ভব। বাস্তবে. সামাজিক রীতি-মূল্যবোধ আশ্রয়ী জগতে এমন আচরণ হয় প্রশ্নবিদ্ধ। কিন্তু 'পথ বেঁধে দিল'-র সংগঠন-প্রক্রিয়াই রচনাটিকে এ পর্যায়ের অন্যান্য গল্প থেকে করেছে স্বতন্ত্র. অভিনব। রেলগাড়ির চলমান গতির ছন্দের সমান্তরালভাবে গল্পটি গ্রথিত। এর কথারম্ভ একটি স্টেশনে যখন রাতের অন্ধকারে ট্রেন এসে থেমেছে ও যাত্রীদের ওঠা-নামার কোলাহলে প্লাটফর্ম মুখর হয়ে উঠেছে আর যখন কথাশেষ তখন স্টেশনে ট্রেন থেমে আছে এবং যাত্রীরা পূর্বমতো ধ্বনিময় ও ওঠা-নামায় চঞ্চল, সক্রিয়। মাঝখানের দৃশ্যপটের বিস্তার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরার চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ।

গল্পটির শিরোনামায় রবীন্দ্র-অনুষঙ্গের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, ভাষাশৈলীও অনুরূপ রাবীন্দ্রিক পরিশীলনে স্বাদু, গীতল ও নাট্যিক :

> ১ তরুণীর বয়স যেন গোলাপের রঙিন পাপড়িতে দোল খাচ্ছে, তবু তারই মধ্যে জানাশোনার ছায়া রয়েছে। তবু. চোখেমুখে অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছায়া থাকলেও মাঝে-মাঝে যেন অনভিজ্ঞতার নতুনত্বের সারল্য উঁকিঝুঁকি মেরে ওঠে।[৩২]
>
> ২ 'আমাদের ছাড়া আপনারা এক পাও চলতে পারেন না, অথচ আমাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাবেন— আপনাদের এ ন্যাকামি অসহ্য।'[৩৩]
>
> ৩ 'ডাকাতরা ডাকাতি করে পেটের দায়ে, ক্ষুধার তীব্র জ্বালায়। ... ওতে ওদের লাভ নেই; পেট যেখানে বড়, সেখানে ওসব প্রবৃত্তি আসে না।'[৩৪]

এ গদ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* (ভাদ্র ১৩৩৬)-র সাধর্ম্য লক্ষণীয়:

> ১ গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর ক'রে সঞ্চালন করে. এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাঁদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।[৩৫]
>
> ২ শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে. অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও।[৩৬]

'মানুষ' (*মোহাম্মদী*. কার্তিক. ১৩৪৯/ অক্টোবর. ১৯৪২)-এর মুলকী–চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। এ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আবার মুলকী অন্ধ বলেই তার পৃথিবী কল্পনায় বর্ণিল, চেনা এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাক্ষসের পাষাণপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যাকেও দূরদেশ থেকে আগত রাজপুত্র মুক্ত করেন, রাজকুমারী ফিরে পান তার নিজের জগৎ। মুলকীর কাছে মুনির সে-সংবাদই বয়ে এনেছে। প্রকৃতিই মুলকীর দীর্ঘপ্রতীক্ষিত রাজপুরুষ। পাহাড়ের অপর পার থেকে আগত পাখি, যাদের কলস্বর, পাখার শব্দ মুলকী চেনে কিন্তু তাদের কায়া ও কান্তি সে কখনো দেখেনি। মুনিরেরও কেবল সান্নিধ্য. স্পর্শই মুলকী পেয়েছে. আর এ জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সে উত্তরিত হয়েছে নবচেতনায়. স্বপ্নময় পৃথিবীতে। মুলকীর প্রবৃত্তি-তাড়িত পূর্বজীবন পুনরাবৃত্ত হলেও তা নৈঃসঙ্গ্য চেতনায় বিধুর ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে যে–জীবন সে লাভ করল তা গভীর একাকিত্ব বোধে বিপণ্ন. ও দীর্ঘশ্বসিত. তার দৃষ্টির মতোই তমস্যাবৃত ও বিবর্ণ।

'ঝোড়ো সন্ধ্যা'-র মতোই দৃশ্যবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে 'মানুষ' গল্পের মুলকী সংলগ্ন। তাকে দেখার পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় অজস্র ভূদৃশ্যচিত্রের প্রতি এবং এই পরিমাণ ভূদৃশ্যের উপস্থিতির ফলে গল্পটি ভিন্ন চারিত্র লাভ করে, হয়ে ওঠে চিত্ররূপময়। 'মানুষ'-এর অধিকাংশ বাক্যই দীর্ঘ, আন্বয়িক শৃঙ্খলা (GDE)-সুষম, অসমাপিকা ক্রিয়া ও সংযোজক অব্যয়ে সংগ্রথিত হয়ে প্রলম্বিত, সামবায়িক ঐক্যে সমুন্নত।

'অনুবৃত্তি' (মোহাম্মদী ১৩৪৯/অক্টোবর ১৯৪২)-র মুখ্য বিষয় প্রেম যা যুগপৎভাবে পরকীয়া ও স্বকীয়া। দীর্ঘ চার বৎসর পর আরশেদ হামিদ তার প্রাক্তন প্রেমিকা বেগমের সান্নিধ্যে এসেছে। সে এখন অন্যের গৃহিণী। কিন্তু প্রথম জীবনের কুমারী মনের অখণ্ড অন্তর দিয়ে ভালোবাসা হামিদকে সে ভুলতে পারিনি। প্রবাসী হামিদ আবার বেগমকে স্মরণ করতে গিয়েই জনৈক বিদেশিনীকে ভালোবেসে দীক্ষা গ্রহণ করেছে নতুন জীবনের।

'সাতবোন পারুল' একটি হালকা রসের গল্প। গল্পটির দুটি পর্ব যা *মাসিক মোহাম্মদী*-তে যথাক্রমে পৌষ ১৩৪৯/ ডিসেম্বর ১৯৪২ ও আশ্বিন ১৩৫০/ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দু-পর্ব মিলেই একটি অখণ্ড গল্প। 'সাত বোন পারুল' আপাত দৃষ্টে সপ্ত সহোদরা রুনু ঝুনু মুনু টুনু ছুলু লুলু বুলুর তীক্ষ্ণ জেরা, নির্মল তামাশার মধ্যে পড়ে মোনায়েমের কী দুঃসহনীয় ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কীভাবে সে এই প্রমীলা-বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করেছিল— সে-প্রচেষ্টার এক হাল্‌কা ও হাস্যোদ্দীপক কাহিনী বলে মনে হয়। কিন্তু গল্পকারের সমাজ-বীক্ষণ অত্যন্ত গভীর। লঘু ও চটুল কাহিনীর মাধ্যমে তিনি স্বল্প উপার্জনের নিম্নবিত্তের সেই বৃহৎ পরিবারের মর্মচেরা চিত্রই এ গল্পে তুলে ধরেছেন, যেখানে মাত্র একজনই উপার্জনক্ষম।

'অনুবৃত্তি' ও 'সাত বোন পারুল'-এর সংগঠন আটপৌরে, নিতান্ত ঘরোয়া। গল্প দুটি এ পর্বের অন্যান্য গল্পের প্রতিধ্বনি হলেও এ দুইয়ের ভাষা রঙ্গ-ব্যঙ্গ আশ্রিত, ভিন্ন স্বাদে বৈচিত্র্যময়। ফরাসি বেলে লেৎর্‌স (Belle Letters) পাঠক মনের সুর ও ভাবের সুসমন্বয় জাগতিক ও কল্পজীবনের বর্ণিল ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রকাশে উজ্জ্বল।[৩৭] বাংলা ভাষায় এ রীতি রম্যরচনা বলেই পরিচিত। বাংলা কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধে এই লোকপ্রিয় রীতির প্রয়োগও সুলভ এবং দিলীপকুমার রায় (১৯১৮-১৯৭৭) ও সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)র মতো শক্তিমান শিল্পীর সৃষ্টিতে দীপ্তিময়। এ রীতি ও ভঙ্গির সচেতন ব্যবহার 'সাত বোন পারুল'-কে এ পর্যায়ে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে করেছে স্বতন্ত্র।

মনোময় বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত গল্প 'দ্বীপ'। প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দাম চঞ্চলতা, লোকালয়রিক্ত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো শোভামান সৈকতভূমে কতিপয় ব্যক্তির উপস্থিতি, তাদের আচরণের স্বাতন্ত্র্য এ গল্পের যুগপৎ ঐশ্বর্য ও দুর্বলতা। মানব ও প্রকৃতির সহাবস্থানেই মূল গল্পরস হয়েছে ঘনীভূত। নামহীন মেয়েটির জৈবনিক

চাঞ্চল্য, পুনর্জন্ম ও জাগরণ একান্তভাবেই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অনুষঙ্গ-জাত। বৃক্ষের পল্লবঘন শাখাশ্রিত পাখির ডানা ঝট্‌পট্ তার মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করে; আর নিজস্ব অন্তরের শূন্যতায় সে লাভ করে নতুন জীবন, অনাস্বাদিত ও অভূতপূর্ব অনুভূতি:

> ...এতদিন তার দেহ ছিলো, মন ছিলো না। এতদিন নদীর শূন্য খাদ ছিলো, এ-বার সে-খাদ বেয়ে জলের বন্যা এলো, আর সে-বন্যার কলরবে তার মন মুখরিত হয়ে উঠলো। তার অন্তরে ভাবের স্রোত বইতে শুরু করলে।[৩৮]

'চিরন্তন পৃথিবী'-র সঙ্গে 'প্রবল হাওয়া বইছে' (সওগাত, বৈশাখ ১৩৫০/এপ্রিল ১৯৪৩) অভিন্ন। দুটি গল্পেই লেখকের উদ্দিষ্ট প্রতিপাদ্য এক ঘটনার সাহায্যে ঘটনা-অতিরিক্ত সত্যে উত্তরণ। 'চিরন্তন পৃথিবী'-তে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে নদীতে অর্ধনিমজ্জিত একটি নগ্ন, গলিত ও বিকৃত মৃতদেহের সাহায্যে। কিন্তু 'প্রবল হাওয়া বইছে-র সে-অবলম্বন উদ্দাম প্রকৃতি, বৈশাখী ঝড়ের মতো বিশৃঙ্খল হাওয়া। এই পুরোভূমি ও পরিবেশই সাকিনার অন্তরে সঞ্চার করেছে আগন্তুক চেতনা, যখন স্বামী তার অনাত্মীয়, নওয়াজের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেও তার কণ্ঠ থেকে উদ্‌গত হয়েছে এক অপার অনিকেত বোধ :

> আমি তারার পানে চেয়ে আছি, তোমাকে আর ভালোবাসি নে।[৩৯]

'হোমেরা' (*সওগাত*, বৈশাখ ১৩৫০/ জুন ১৯৪৩) একটি ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্বময় গল্প হয়েও এর পরিণতি ও আকরমের মানস–পরিবর্তন আমাদের মধ্যে ভিন্ন প্রতীতির সৃষ্টি করে। আমরা দেখি, অনাথ চাচাত বোন হোমেরার প্রতি প্রেম-নিবেদন কখনোই আকরমের হৃদয়িক সংবেদনার অভিব্যক্তি নয়, তা বন্ধু রহিমের প্রতি হোমেরার হৃদয়নৈকট্যের গভীরতা পরীক্ষার কৌশলমাত্র। আর এই সত্য-অর্জনের বিশেষ মুহূর্তটি নির্মাণই হচ্ছে গল্পকারের একান্ত অভিপ্রায়। গল্পের আখ্যানের আয়োজনও সেই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত। বলা যায়, 'হোমেরা' রচনার মূলে আছে স্রষ্টার সেই শাশ্বত মানববোধ যা একান্ত আত্মীয়তাজাত, সামাজিক ও লৌকিক।

'হোমেরা'-র কথাবস্তুর সঙ্গে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার কোনো বিরোধ নেই। সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত গল্পটি প্রচলিত বাংলা গল্পশৈলী-অনুসৃত। তবে আকরমের মানস-পরিবর্তন নির্দেশে গল্পকার কিঞ্চিৎ অমনোযোগী ও দ্রুততা-আশ্রয়ী। তাকে যে-স্বল্প সময়ের মধ্যে যুগপৎ নায়ক ও ভিলেনরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা ধাক্কাপ্রধান, গল্পের ক্রম-অগ্রসরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যরিক্ত। একটি বিশেষ চরিত্রের প্রতি স্রষ্টার সহানুভূতির প্রাবল্যও গোপন থাকেনি। গল্পের অন্যান্য চরিত্রের বিকাশ অসম। বয়োজ্যেষ্ঠ চাচাত ভাইকে অকস্মাৎ কাগজ-চাপা দিয়ে আঘাত-জনিত নাট্য-চমক সত্ত্বেও হোমেরা কৃত্রিম, নিষ্প্রভ, একেবারেই যন্ত্রবৎ।

এ পর্যায়ের অন্যান্য গল্পের তুলনায় 'স্থাবর' (*মোহাম্মদী*, শ্রাবণ ১৩৫০/ জুলাই ১৯৪৩)-এর স্বতন্ত্র মূল্য আছে। দীর্ঘকাল অভ্যস্ত জীবন, পুরুষানুক্রমে আচরিত পেশা, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের অহংকার থেকে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনভ্যস্ত, অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশের মানবিক দ্বিধাকে এ গল্পে মুখ্যত রূপায়িত করা হয়েছে মাসুদ চরিত্রের মাধ্যমে।

কর্ণফুলির তীরসংলগ্ন এক শান্ত গ্রামে মাসুদের জন্ম। পিতৃহীন মাসুদ মায়ের স্নেহেই লালিত। তাদের পুরুষানুক্রমিক কাজ নৌকা তৈরি করা। মাসুদের বাবা ছিলেন রঙের কারিগর। সেও 'সূক্ষ্মভাবে নক্‌শা কাটে: তারপর সেগুলো নানা রঙে রঙিন ও মনোহর করে তোলে।' কিন্তু হৃদয়ে সে শোনে এক অজানার আহ্বান। সমুদ্র মাসুদকে হাতছানি দেয়. সে ভাবে: তাদের তৈরি নৌকায় লোকে সাগরে যায়, সমুদ্রের তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ জীবনের উত্তাপ ও ঐশ্বর্যকে বরণ করে অথচ তা'র জীবন নিস্তরঙ্গ, ছন্দ-তালহীন ও হৃতবৈচিত্র্য। সমুদ্রের অভিলাষী মাসুদ একদিন ওস্তাদকে মনের কথা বলে। কিন্তু অনুকূল সাড়া মেলেনি। বৃদ্ধ ওস্তাদ মাসুদকে শাসনের ভয় দেখায়। মাসুদের মায়ের অনুমতিও নিরুচ্চার। অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করতে মাসুদ তাই রাতের অন্ধকারে, সবার অলক্ষ্যে গ্রাম ছাড়ে। কিন্তু অধিক দূর সে যেতে পারে না। অচিরেই তার চেতনালোকে এক গভীর. গূঢ় ও দূরপ্রসারী পরিবর্তন আসে। মাসুদ উপলব্ধি করে. শহর কিংবা সাগর নয় গ্রামই তার অন্বিষ্ট, সন্দীপ্ত মশালের মতো তার হৃদয়গভীরে উজ্জ্বলন্ত। পুনরাবৃত্ত জীবনেই তার আনন্দ, প্রেম ও মমতা, মায়ের নীল চোখই তার সমুদ্র, স্থাবর হতেই তার জন্ম, পরকে ভালোবাসার জন্যই তার অস্তিত্ব, সাগরের ছায়া দুলুক অন্যের অন্তরে। পরের মুক্তিদাতা সে. 'বন্ধন জড়িয়ে যাক তাকে'। মাসুদ অতঃপর গ্রামে ফিরে আসে, মুক্তি খোঁজে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের মধ্যে। গল্পটি তাই লেখকের মৃত্তিকাসংলগ্ন অন্তঃকরণের উপাখ্যান; তাঁরই জীবনবীক্ষার শিল্পিত কাহিনী।

'স্থাবর'-এর প্রধান চরিত্র মাসুদকে লেখক যেমন পুরুষানুক্রমিক পেশার কর্মকোলাহলে জীবন্ত করে তুলেছেন তেমনি তার মনোবিশ্বে পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে সূচিত করেছেন মাসুদের অন্তর্গূঢ় পরিবর্তন। তার সাগর ও শহর-আকাঙ্ক্ষা মূলত তার আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-অনুসন্ধান। মাসুদের প্রত্যাবর্তনেও কোনো পারিপার্শ্বিক ঘটনা কিংবা চরিত্রের অনুপ্রবেশ নেই. তা সর্বতোভাবেই মাসুদের মনোজগতের গভীর উৎসজাত। পুনর্জন্ম, নতুন উপলব্ধিই তাকে দেশ. মাটি ও মানুষের মর্মমূলে প্রত্যাবর্তনে করেছে উৎসাহী।

'ও আর তারা' (*সওগাত*. পৌষ ১৩৫০/ ডিসেম্বর ১৯৪৩) একটি ভিন্ন স্বাদের, সমাজের কথিত উঁচুতলার দুই নর-নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ, আবেগ-সংরাগের মেঘডম্বুর কাহিনী মনে হলেও গল্পটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর জীবনমুখি চেতনায়ই সুস্থির, ঘনসংবদ্ধ। একদেশদর্শী শিক্ষা, পাত্র-পাত্রীদের উর্ধ্বচারী জীবনদৃষ্টিতে যে তাৎক্ষণিক পরিবর্তন সূচিত করেছে, তাতে তাদের জীবন থেকে চ্যুত হয়েছে মৃত্তিকার শীতল আশ্রয়. গার্হস্থ্যসম্প্রীতি। তাদের অন্তরের বিকাশ তাই প্রতিহত ও বিলম্বিত। 'ও' অর্থে এ গল্পে জনৈক অর্থবান ফ্যাশন-উজ্জ্বল সুদর্শন যুবক আর 'তারা' বলতে লেখক সেই সব আধুনিকা, মক্ষীরানীকে বুঝিয়েছেন, যারা চব্বিশ ঘণ্টার আট ঘণ্টা ব্যয় করে শরীরচর্চা ও প্রসাধনে। জীবনকে তারা বিবেচনা করে একটি বর্ণিল

রঙ্গমঞ্চরূপে। পারিবারিক জীবনের অন্যতম বন্ধন বিয়ে কিন্তু দেশীয় এ মূল্যবোধ তাদের বিবেচনায় অন্তঃসারশূন্য, ভ্রান্ত। এ-প্রসঙ্গে তাদের উক্তি স্মর্তব্য :

> বিয়ে আর চরিত্র—এ-দুটি শব্দ আমার কানে যেন তীর ছোঁড়ে। যতো সব বুনো হাড়-চিবানো কথা, অদ্ভুত, নোংরা, জঘন্য, ড্রেনের পচা সব আইডিয়া।[৪০]

হৃদয়ের এই অনাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তারা পরিণয়বদ্ধ হয়। কারণ বোহেমীয় মনোভঙ্গি কিংবা যাযাবর চেতনা অথবা মিথুনাসক্তিতে নয় গৃহের মধ্যেই নিহিত আছে মুক্তি। এ বন্ধনই যুগান্তকাল ধরে জীবনকে বিকশিত ও সমাজকে করেছে সুশৃঙ্খল, নিয়মাধীন ও নীতি-অনুগত।

'ও আর তারা'-র সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ পর্যায়ের গল্পধারার অনুরূপ নয়। এ গল্পে লেখক অনেকটা চলচ্চিত্রের দৃশ্যবন্ধ ও ফেড ইন ফেড আউট পদ্ধতিতে গৃহীত পাঁচটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে সংযুক্ত করেছেন। 'ও আর তারা' তাই একজন নিষ্ঠাবান চলচ্চিত্র-পরিচালকের অমনোযোগী চিত্রনাট্য। লেখকের চেতনাপ্রবাহ-রীতির সজ্ঞান পরীক্ষা-প্রয়াসও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'স্মৃতি ও অনুষঙ্গের মাধ্যমে মনের অতীত থেকে বর্তমান বা বর্তমান থেকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতের গতায়াত, হঠাৎ মনের চলাচলে কালক্রম রক্ষা না করা'-র একটি প্রয়াস গল্পে সহজেই লক্ষণীয়। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আমাদের বক্তব্যকে সাক্ষ্য-সমর্থিত করবে :

> ...কী ভাবছেন?
>
> —কৈ, কিছু না-তো ? (ও ভাবছে-[ভাষা তার] : আদি যুগ হতে কবিদল নানা ভাষায় নানাভাবে, আবিষ্কারে ও গবেষণায় নারীর চরণে তাদের স্তুতি-অর্ঘমালা নিবেদন করে আসছে, এবং সাথে-সাথে গদগদ কণ্ঠে বলে আসছে যে, তারা চির দুর্জ্ঞেয়, এবং সাথে-সাথে তাদের চটুল কটাক্ষে চিরকাল ধরে শুধু বিভ্রান্তই হচ্ছে। তাই তারা ওর কাছে সর্বদিক হতে—আকাঙ্ক্ষা, বিকাশে ও ব্যর্থতায় হীন ও দীন। আহা তাদের প্রৈতি ও প্রতিভা যদি অমনি বিপথে নিষ্ফলভাবে ব্যয়িত না হতো, তবে এতদিনে মানবজাতি অনুভূতিতে অভিব্যক্তিতে ও বিচিত্র প্রকাশে ঋদ্ধির উচ্চতম শিখরে পৌছতে পারতো।)
>
> বা, কিছু না তো মানে ?
>
> তা ভাবছি বৈকি'? ভাবছি-[৪১]

'ও আর তারা'-র আঙ্গিকের মতো ভাষাও গুরুত্ববহ, তাৎপর্যমণ্ডিত। গল্পটির বাগ্‌বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*-র ভাষাশৈলীর লাবণ্য ধারণ করেও স্বয়ংপ্রভ, এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্বয়িক শৃঙ্খলা ও সামবায়িক প্রক্রিয়া বিন্যস্ত ও অন্তর্বয়িত। গল্পের 'ও' যেন *শেষের কবিতা*-র অমিত রায় আর 'তারা' অর্থাৎ, 'সহজ গতি', 'ঝড়', 'দিগন্ত', 'চাঁদ ও আকাশ', 'উড়ন্ত পাখি' অণুবাক্যে উল্লিখিত আধুনিকাকুল লেখকের কথায় 'নাক উঁচু', 'তন্বঙ্গী', 'দীর্ঘাঙ্গী', 'স্বপ্নিল', 'ক্ষীণ-কটি লালচে'—ললনা চতুষ্টয় যেন লিসি-সিসি-কেটী-রই প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া। তাদের

উচ্চারণ, জীবনার্থও *শেষের কবিতা*-র ত্রয়ী চরিত্রের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*-র মতোই এ গল্পের ভাষা ক্রিয়াপদ-বিরল, হ্রস্ব বাক্যবন্ধ প্রধান ও তির্যক :

> ওর বয়স পঁচিশ। চেহারা ধারালো, ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চোখ দুটো অস্মিতাময়। জীবনে ওর অখণ্ড অবসর, এবং ব্যাংকে অজস্র অর্থ। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই: কেউ গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে অর্থহীন পুলকে প্রেমিকার খোঁপায় গুঁজে দিলে ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।[৪২]

গল্পের তন্বঙ্গী মেয়েটির পরিচয়ের ভাষাও কেতকীর প্রসাধন-চর্চিত রূপের সাদৃশ্যবাহী:

> তার নৈকট্য তীব্র ও উষ্ণ, এবং মদের মতো ঝাঁঝালো। তার দেহময় প্যারির উগ্রস্নিগ্ধতা, চোখে চৈনিক নারীর স্বপ্নিল ছায়া, এবং তার চলার গতি নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে প্রধান ও জন-সঙ্কুল একটি পথের কথা মনে করিয়ে দেয়। নির্জন পথে হাঁটতে গেলে সে হাঁপিয়ে পড়ে, ঠোঁট গোল করে বলে: তাহলে আমার মনে হয় যেন পৃথিবী হঠাৎ থেমে গেলো—অচল হয়ে পড়লো, মনে হয় যেন আমার চারধারে মৃত্যুর মতো অসহনীয় ঠাণ্ডা স্তব্ধতা—ইত্যাদি। প্রায়ই তাকে সন্ধ্যার উজ্জ্বল আলোয় চৌরঙ্গীর এধার-ওধার উত্তাল-ঢেউ-তোলা গতিতে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়।[৪৩]

তন্বঙ্গীর রবীন্দ্র-বিরোধিতাও *শেষের কবিতা*-র নিবারণ চক্রবর্তীর অনুরূপ। তার বাকনিপুণ সংলাপের দৃষ্টান্ত :

> ঐ বুড়োর হাওয়া লাগলে, সেরেছে, আমার পত্রিকাও যাবে বুড়িয়ে। ...বাঙলার তরুণের তারুণ্য তিলে-তিলে হরণ করছেন তিনি।[৪৪]

তুলনীয় :

> রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো-অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে।[৪৫]

যুগাতিক্রমী শিল্পীমাত্রই সমকাল সচেতন, আধুনিক। এ আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বিধাবিপন্ন মানুষ ও সামাজিক চৈতন্যকে নিজের সৃষ্টিতে ধারণ করা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম গল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'-ই সমকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বিতীয় মহাসমরের ছায়াপাত ঘটেছে। 'চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে'ও তিনি এ শতকের প্রথমার্ধের মুসলমান সমাজের জাগরণকে, খণ্ডিত আকারে হলেও উপস্থাপন করেছেন। এ পর্যায়ে 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো'-তে (*মোহাম্মদী*, পৌষ ১৩৫০/ ডিসেম্বর ১৯৪৩) আরো একবার তিনি যুদ্ধকে শিল্প উপকরণ হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যুদ্ধের মানবতাবিরোধী রূপ তাঁকে আহত করেছে। প্রধান চরিত্র আকবরের আত্ম-আবিষ্কারের উপকরণ ও সহায়ক উপাদান রূপেই 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো' গল্পে গৃহীত হয়েছে যুদ্ধ।

পিতৃহীন আকবর স্বল্প বেতনের চাকরিজীবী। মা ও একমাত্র কনিষ্ঠ ভাইকে নিয়ে তার সংসার এবং তা ছোট হলেও অভিপ্রেত স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, উচ্ছলিত। হঠাৎ প্রবল বন্যায় ভেসে-আসা পত্রখণ্ডের মতো তাদের মধ্যে বর্মা থেকে এসে

উপস্থিত হয়েছে আকবরের চাচা, চাচি ও চাচাত বোন রাবেয়া। যুদ্ধ তাদের ঘর-ছাড়া করেছে। শান্ত, নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত আকবর অতিরিক্ত তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন করতে গিয়ে হয়ে পড়েছে প্রায়-ক্লান্ত, পরাজিত। কিন্তু রাবেয়ার এক পূর্বাহ্নিক চাঞ্চল্য আকবরের মধ্যে ভিন্ন, আত্মগত বোধের জন্ম দিয়েছে। সে এই প্রথম নিজের মধ্যে অনুভব করেছে শূন্যতা ও নৈঃসঙ্গ্য। রাবেয়াদের তখন আর আকবরের বাড়তি ঝামেলা, অনাহূত ও অপ্রত্যাশিত অতিথি বলে ভাবার পরিবর্তে মনে হয়েছে চিরচেনা আপনজন, একান্ত আত্মীয়। 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো'-র যুদ্ধ তাই ঘর-হারানোর বেদনা ও নতুন গৃহ-রচনার সংকেত ও উৎস বিশেষ।

'সবুজ মাঠ' (*সওগাত*, চৈত্র ১৩৫০/মার্চ ১৯৪৪) নবদম্পতি রাবেয়া-আকবরের নস্টালজিক অনুভূতির রূপকল্প। নতুন চাকরি নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে স্ত্রী রাবেয়াকে নিয়ে নতুন বাসায় সংসার পেতেছে আকবর। কিন্তু এই পরিবেশ, নব অবস্থান তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন, নতুনত্বের বার্তা বয়ে আনেনি। এখানে বাস করেও রাবেয়া স্মৃতিময়, সেই শ্যামল প্রান্তরের অধিবাসী যেখানে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোর। আর আকবরের চেতনায় তার পূর্ব-প্রেমিকা মোমতাজের স্মৃতিই প্রবল, আত্মিকভাবে সে মোমতাজ-সংলগ্ন। ফলে আকবর-রাবেয়া দুজনেই অনির্দেশ্য বেদনাবোধ ও আত্মগত অতৃপ্তির শিকার যা তাদের বর্তমান জীবনকে করে তুলেছে বিষাদজর্জর, ও কারুণ্য-সঞ্চারী।

'স্বাগত' (*সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫১/সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আফজলের অবচেতন মনের আত্মকথনকেই শব্দরূপ দিয়েছেন। তার দ্বিতল মনোরম নির্জন কক্ষে প্রায়ই এক ললনার আবির্ভাব ঘটে। সে অতীতে, আফজলের শৈশব ও কৈশোরে তার পরিচিত ছিল। তখন তার অঙ্গেও ছিল অনুপম কান্তি, হৃদয়হারী সৌন্দর্য। কিন্তু কালের ব্যবধানে এই পুরাঙ্গনার পূর্বগৌরব অন্তর্নিহিত। বর্তমানে তার 'শীর্ণ অসহায় দেহ'। তবু তার এই পৌনঃপুনিক আগমনের মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে আফজল ভেবেছে : 'হয়তো এ নির্জনতা নবাগতার ভালো লাগে; তাই সে বার বার আসে'? কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা তাকে পৌঁছে দিয়েছে ভিন্নতর এক সত্যে। আফজল বুঝেছে যে, অতীতকে ফিরে পাওয়ার মনস্তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা তার নেই। সে এখন আফজলের কাছে একজন চাকরি প্রার্থীমাত্র আর এই আবিষ্কার তাকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছে। 'নবাগতা'-র প্রতি এক নীরব সহানুভূতি, অনুচ্চারিত সহমর্মিতায় আফজলের অন্তর হয়েছে পূর্ণ। বহির্জগৎ, অতীত, বর্তমান এবং মানব সত্তার সংবেদনশীল আন্তর ক্রিয়ার মাঝ-দিয়ে যে জীবনের রূপ-রূপান্তর ঘটে—আফজলের গোত্রান্তরিত মানবিকতাবোধ তারই দৃষ্টান্ত।

'মানসিকতা' (*সওগাত*, মাঘ ১৩৫১/ জানুয়ারি ১৯৪৫) সেলিমের বিচিত্র মনোভঙ্গিরই এক অনুপম আখ্যান এবং তা কখনও আত্ম-অভিজ্ঞান এবং নিজের গভীর গোপন অনুভবগুচ্ছ আবিষ্কারের পরম আনন্দে উচ্ছল, কখনো পারিবারিক অসহায়তা

ও আত্মগ্লানিতে দীর্ণ ও বিকৃত আবার কখনো পারিবারিক ঐশ্বর্য ও বৈভবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা ও অসূয়াচেতনায় আচ্ছন্ন, বক্র।

এ পর্যায়ের শেষ চারটি গল্পের মধ্যে আঙ্গিক বৈচিত্র্যে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও পরিচর্চার নতুনত্বে 'স্বগত' (*সওগাত*, আশ্বিন ১৩৫১) অতিরিক্ত অভিনিবেশ ও সতর্কতা আকর্ষণ করে। শিরোনামার মধ্যেই গল্পটির সাংগঠনিক সূত্রের প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে। 'স্বগত' আফজলের মনোলগ; তারই মানস-সংলাপের ভাষ্য। আফজলের অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তির রূপায়ণ চেতনাপ্রবাহধর্মী; তারই বিবিধ বোধ ও বাস্তবতা-পরিস্রুত। আফজলের আবাল্য পরিচিত খেলার সাথী পরবর্তীতে 'নবাগতা'-রূপে তার জীবনে আবির্ভূত হয়েছে। এত বছরের ব্যবধানেও নবাগতাকে তার ভালো লেগেছে এবং কোন লিপ্সচেতনা তাকে গ্রাস করেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, স্বতন্ত্ররূপে উপস্থিত নবাগতার যে-ব্যক্তিস্বরূপ গল্পকার বর্ণনা করেছেন তা প্রভাতের আলোকিত প্রকৃতির পরিচর্যায় পরস্পরিত, আন্তর সাজুয্যে সমৃদ্ধ, প্রশান্তিকর ও আফজলের অনুরাগের ছোঁয়ায় বর্ণময়।

> শারদীয় রোদ নীল আকাশের তলে ঝকঝক করছে। আফজল চেয়ে দেখলো নবাগতার পানে। গতকাল সায়ন্তন নিষ্প্রভ আলোতে তাকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হয়েছিলো, অথচ আজ সকালের নির্মল উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার দেহের ও মুখের রক্ত কী উজ্জ্বল কী প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

আবার সতৃষ্ণ সাক্ষাতের পর একাকী আফজলের নবাগতা-বিষয়ক চিন্তাস্রোতের ভাষা তার অবচেতন মনেরই শব্দরূপ যা যুগপৎ কায়াচেতনায় দীর্ণ ও আসঙ্গলিপ্সায় মেদুর :

> নবাগত যখন ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আফজল তার পানে চেয়ে হঠাৎ ভাবলো, রাতের তারাময় আকাশের পানে ও কী কখনো অতন্দ্র চোখ মেলে ধরেনি ? আমরা তাকাই বলে সে-মহারাত্রি ও মহাকাশ আমাদের চোখের মতো সংকীর্ণ হয়ে আসে: আকাশকে তাকাতে দাও তোমার চোখের ভেতর দিয়ে তোমার চোখের পানে। হয়তো তা সে কখনো করেনি। নইলে ওর প্রতিটি অঙ্গ এমন সঙ্গ চাইবে কেন ? ওর আঁচল পর্যন্ত যেন কথা কয়।[৪৭]

এ গল্পে আফজল সাপের সঙ্গে তুলনা করেছে নবাগতার। কিন্তু এখানে নিভৃতচারী, ভীরু ও প্রতিহিংসা-উদ্যত সাপ কিংবা নারী আফজলের মগ্ন চৈতন্যের অনুষঙ্গ হলেও তা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। তার তীক্ষ্ণ বিবেক ও জাগ্রত মেধা শেষপর্যন্ত আফজলকে রূপান্তরিত করেছে একজন খেলানিপুণ সাপুড়েয়। এক সময় তারই মতো আহরিত দক্ষতায় আফজল ভেঙে দিয়েছে তার অবচেতন মনের বিষদাঁত। গল্পে সর্পের এ ভিন্নস্বভাবী ও আফজল-চৈতন্যের রূপান্তরধর্মী অংশটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে চিত্রাত্মক শব্দ যোজনায় :

> এবার আফজল তার অন্তর— সে অন্তর সাপের প্রাণময়তায় ও অস্থিহীন পিচ্ছিলতায় কিলকিল করে উঠেছিলো—তাকে ঝাঁপ চাপা দিয়ে সে গর্বিত সাপুড়ের মতো তাকালো দর্শকমনের পানে।— আরো চাই ? সে-সাপকে হাতের লাঠি করে তাতে শামা পরিয়ে সে কৃতার্থ হলো এবার।[৪৮]

বস্তুত, 'মানসিকতা' গল্পে সংগঠন ও ভাষা অভিন্ন সম্পর্কে বদ্ধ হয়েই লক্ষ্যাভিমুখি, ঘটনা-অতিক্রান্ত সত্যপ্রকাশে সহায়ক।

'মানসিকতা' (জানুয়ারি ১৯৪৫) পত্রস্থ হওয়ার দু-মাস পরই প্রকাশ পায় *নয়নচারা* (চৈত্র ১৩৫১/ মার্চ ১৯৪৫)। এ গ্রন্থে বিচিত গল্পগুলিতে তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীল সত্তার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকাশ ও বিস্তারের শিল্পস্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বস্তুত, *নয়নচারা*-র শিল্প সাফল্য ও সিদ্ধি আলোচনার অনিবার্য পুরোভূমি ও পশ্চাৎপটরূপেই এ পর্যায়ের গল্পগুলি তাৎপর্যমণ্ডিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাবয়িত্রী প্রতিভার পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতরূপেই তা উল্লেখযোগ্য ; এবং এ পর্বের গল্পগুচ্ছ পর্যালোচনার মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন-সত্তা, মনস্তত্ত্ব, নান্দনিক দৃষ্টি, বৌদ্ধিক সংরাগ ও জীবনার্থের যে-পরিচয় আমরা লাভ করি, তার সূত্রনির্দেশ এভাবে করা যায় :

[এক] গল্পগুলির পটভূমি গ্রাম থেকে শহরে বিন্যস্ত হলেও, অতিমাত্রায় নাগরিক পরিবেশের প্রতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্মিক আকর্ষণ কম। গ্রামীণ প্রকৃতি, নিসর্গের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে কর্মচঞ্চল মানুষ এবং অপেক্ষাকৃত ছোট শহরের শিক্ষিত ও সমুৎকর্ষিত পাত্র-পাত্রী ও তাদের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিই রয়েছে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ।

[দুই] বয়োসন্ধিতেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ভাবাবেগ অতিরেক কোনো বিষয় তাঁর গল্পে অবলম্বন করেননি। তাঁর কতিপয় গল্পে লিবিডো-প্রেরণার শারীরতাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার ব্যবহার থাকলেও, সমকালীন *কল্লোল* (১৯২৪)-*প্রগতি* (১৯৩৬)-র মিথুনাসক্তি ও জৈব-ধর্মের পঙ্ক-পল্বলে নিমজ্জন মানসিকতা তাঁকে কখনো গ্রাস করেনি।

[তিন] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ গল্পের মানব-মানবী বিষণ্ন, আত্মমগ্ন ও নিঃসঙ্গ। ফলে এ-সব গল্পের কোথাও চড়া রঙের ব্যবহার কিংবা উচ্চকণ্ঠ বাগ্‌বিলাস নেই। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা মার্জিত, রুচিসমৃদ্ধ, সংস্কৃতবান হয়েই একাকিত্ব-বোধে বিপন্ন, অন্তর গভীরে অনিকেত চেতনায় আক্রান্ত।

[চার] গল্প-সংগঠনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্য-সন্ধানী এবং সমকাল-অনুগত হয়েও নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে যত্নশীল।

[পাঁচ] তাঁর গল্পে প্লট বা কাহিনীর গ্রন্থন মূলত স্বতঃস্ফূর্ত ও চরিত্র-চেতনাবাহী। তরল, পাঠকপ্রিয় উপাখ্যান তাঁর অভিপ্রেত নয়। ঘটনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের বক্তব্য প্রকাশের উপায় ও উপকরণমাত্র। ঘটনা ও চরিত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশের মাধ্যমে তিনি প্রতীতি সৃষ্টিতে আগ্রহী। অন্য কথায়, ঘটনার সাহায্যে তিনি উপনীত হন ঘটনা-অতিক্রান্ত আর-এক সত্যে।

[ছয়] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ-পর্বে ক্রমশ সতর্ক নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করেছেন তাঁর নিজস্ব গদ্যশৈলী, যা অন্তর্গত সংবেদনশীল অনুভাবী প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত, সংগীতধর্মী, চিত্র ও চিত্রকল্পময় এবং প্রতীকী ভাবব্যঞ্জনায় অভিধামুক্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গ্রন্থবদ্ধ গল্প

নয়নচারা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগাল্পিক শিল্পিসত্তা *নয়নচারা*-য় পৌঁছে একটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। এ পর্বে তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-মানসের ঘটনাবর্তে আলোড়িত হয়েছেন এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়ণে হয়েছেন আন্তরিক। *নয়নচারা*-য় সংকলিত গল্পমালা সে-অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাস্রোত, অনুভূতি, অন্তঃকরণ এবং কাল ও সমাজ-সচেতন মনক্রিয়ার (intellection) অনুকৃতি ও শিল্প-অভিজ্ঞান।

বিষয়-বিবেচনা ও স্রষ্টার অনুভাবনার আততি (tention) অনুসারে *নয়নচারা*-র গল্পগুলিকে মুখ্যত দু-ভাগে বিভাজন [৪৯] করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে 'নয়নচারা', 'মৃত্যুযাত্রা', 'রক্ত' ও 'সেই পৃথিবী'। উল্লিখিত গল্পচতুষ্টয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর কালের 'দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষণ্ণতা'-কে রূপময় করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীচিহ্নিত গল্পগুলি মূলত নদীবহুল পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের জীবন-স্বরূপ, তাদের নিরানন্দ ও প্রত্যাশাদীপ্ত জীবনের বাস্তবভিত্তিক কাহিনী। এ শ্রেণীর গল্পগুলি হচ্ছে 'জাহাজী', 'পরাজয়' ও 'খুনী'।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্যোগময় ঘটনা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। বাংলায় ১৮৯৯, ১৯১৮ ও ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দেও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ এবং দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত অঞ্চলের আয়তনও পূর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিশাপ ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলার ১৫ লক্ষ মানুষ চরম দুর্দশা ও দুর্ভোগের শিকার হয়।[৫০]

কোনো সৎ ও সচেতন শিল্পীর পক্ষে সমাজ ও সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে-ইউটোপীয় জগতে বসবাস অসম্ভব। দ্বিতীয় মহাসমর, মন্বন্তর এবং এ কালে সৃষ্ট সমাজ-সমস্যা সমসাময়িক সব সৃষ্টিশীল প্রতিভারই তাই সবিশেষ অভিনিবেশ, মনঃসংযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও শিল্পী-চিত্তের এই অন্তর্গত সংবেদনার উল্লেখ করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট সমালোচক লিখেছেন :

> 'সেদিন (১৯৪৩-৪৭) কোনো লেখকই পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন নি। থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ অধিক সচেতন,

> কেউ অল্প সচেতন। বারুদের গন্ধ সবাই পান নি, কামানের গর্জন সবাই শোনেন নি, কিন্তু সব লেখকই উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন, দূরে দেখেছেন বহ্নিবলয়বেষ্টিত দিগন্ত।[৫১]

স্বভাবতই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও তৎসৃষ্ট নানা সমস্যা ও সংকটকে উপজীব্য করে গল্প লিখেছেন জগদীশ গুপ্ত[৫২] (১৮৮৬-১৯৫৭), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত[৫৩] (১৯০৩-১৯৭৬), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়[৫৪] (১৯১৮-১৯৭০)-সহ অনেকেই। এ কালেই প্রকাশিত হয় পরিমল গোস্বামীর উদ্‌যোগে ও সম্পাদনায় *মহা-মন্বন্তর* (মার্চ ১৯৪৪) গল্পসংকলন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ও সময় ও দুঃসময়ের দাবি মেনে নিয়েই পালন করেছেন তাঁর সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু তাঁর চেতনায় যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও তৎসৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি, প্রতিফলন পূর্বোক্ত লেখকদের তুলনায় ভিন্ন এবং তা তাঁরই জীবনবোধ ও অনুভবে স্বতন্ত্র। আর এ ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌলিকত্ব কোথায়, সেই প্রান্ত কেবল সমকালীন লেখকদের সৃষ্টির সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পগুলির আলোচনা-সূত্রেই নির্দেশ সম্ভব।

যুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে : 'সাড়েসাত সের চাল', 'প্যানিক', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'নমুনা' ও 'সতী'। 'সাড়েসাত সের চাল' গল্পটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *নয়নচারা* (মার্চ ১৯৪৫)-র এক বৎসর পূর্বেই, পূর্বোক্ত *মহা-মন্বন্তর* (মার্চ ১৯৪৪) সংকলনে প্রকাশ পায়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় অভিন্ন পটভূমিতে রচিত অন্যান্য গল্পের সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ করে 'সাড়েসাত সের চাল'-কে 'নিম্ন মধ্যবিত্ত আর গরীবের পরাজয় আর অপমানের লাঞ্ছনা আর আত্মসমর্পণের কাহিনী'[৫৫] বললেও আমরা দেখি যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসাই গল্পটিতে মুখ্যত রূপায়িত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের ভয়াল, জান্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেই 'সাড়েসাত সের চাল'-এর সন্ন্যাসী আত্মহত্যা করেছেন। আর নিজের এই নির্বাচিত বিনষ্টির মাধ্যমে তিনি সেই সমাজের প্রতি তাঁর উদ্ধত অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন যার বদল না-ঘটলে সুস্থ, শুভপ্রত্যয়ী ও বিবেকী মানুষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। অন্যদিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কালোরক্ত' (১৯৪৫) গল্পে নির্মাণ করেছেন কলকাতা শহরের ডাস্টবিনের চিত্র–যেখানে মানুষ ও চতুষ্পদের সমান গতায়াত, খাদ্যান্বেষীমাত্রই অভিন্ন।

এ পর্বের দুই বিশিষ্ট গল্পকার নবেন্দু ঘোষ ও সন্তোষকুমার ঘোষ। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত নবেন্দুর অন্যতম বিশিষ্ট গল্প ' বাঁকা তলোয়ার' (১৯৪৫) যা মূলত পার্বতীর আপতকালীন জীবনের এক সকরুণ, সাশ্রু উপাখ্যান। পার্বতীর জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপচিয়ে না-পড়লেও তাকে অস্বচ্ছল বলা যেত না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের আকস্মিক পদপাতে তা হয়েছে আমূল উৎপাটিত। ফলে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে গ্রাম থেকে শহরে এসেছে, শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছে নিজের নারীত্বকে পর্যন্ত সওদা করতে।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'ভারতবর্ষ' গল্পে দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ শহর থেকে দূরবর্তী, অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসবাসরত মানুষদের জীবনেও সঞ্চারিত

হয়েছে। ফলে তারা পরিণত হয়েছে ভিখারিতে, আর নারীরা আত্মবিসর্জন দিয়েছে বিদেশি সেনার রিরংসার যূপে। সে–ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো বিশেষ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া নির্মানের পরিবর্তে মানবিক বিপর্যয়ের গভীরতা নির্দেশ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত জনতার অন্তর্জ্বালা, মনোযন্ত্রণা, বিভিন্ন শ্রেণী অবস্থানে বদ্ধ মানুষের মনোভঙ্গির স্বরূপ ও সত্যার্থ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি-আদর্শের সর্বাত্মক ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব-পঙ্কিলতার কোনো মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্প তাঁর এই সুস্থির ও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের ব্যক্তি-চেতনাপ্রবাহ-আশ্রিত, অনুভূতিমগ্ন রূপেরই শিল্পকথা।

দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজাড় হলে খাদ্যের সন্ধানে আগত মানুষের মিছিলে শহরে এসেছে আমু ও ভূতনি। কিন্তু এ আগমন দুরাশার চোরাবালিতেই নিমজ্জন, কেবলই মিথ্যের ছলনা। শহরের লঙ্গরখানায় সামান্য আহার জুটলেও তাতে সবার প্রাণ বাঁচে না। ভুতোর মতো অনেকেই বেঘোরে, ক্ষুধার বিষাক্ত কামড়ে প্রাণ হারায়। নারী বলে ভুতনি আরো অসহায়। আর আমুর মতো যারা একটু সচেতন, যাদের হৃদয়ে এখনো সামান্য বোধ, সংবেদনা উপস্থিত তারা অন্তরে বহন করে এক অসম্ভব ক্রোধ ও প্রতিহিংসা। ময়রার দোকান থেকে আমু কুকুরের মতো বিতাড়িত হয়, অথচ শহরে হাজারও মানুষের নিত্য গতায়াত, বিচরণ। কিন্তু তারা আত্মকেন্দ্রিক, অন্যের প্রতি দৃষ্টিদানের বিন্দুমাত্র অবসর তাদের নেই। শহরের আবহাওয়া, জীবন তাই আমুকে ক্ষুব্ধ করেছে। নিরুপায় আমু তখন খুঁজছে নয়নচারা গ্রাম, সেখানকার চিরচেনা মানুষ ও প্রকৃতিকে। কিন্তু তা তাঁর শহর-অনভিজ্ঞ ও নাগরিক লোকচরিত্র জ্ঞানবিবর্জিত মনের ব্যর্থ অন্বেষণ। অকস্মাৎ একটি মেয়ে তাকে সামান্য অন্ন দিলে আমু হয়েছে অভিভূত। তার মনে হয়েছে, এ কন্যার পিতৃগৃহ নিশ্চয়ই নয়নচারা গ্রামে। অন্যথায় তার প্রতি এই করুণাধারা বর্ষিত হতো না। 'নয়নচারা' তাই আমু ভুতনি-ভুতোর ক্ষুধাদীর্ণ মনের কথা; তাদেরই শহরাভিজ্ঞতার এক রুধিরাক্ত রূপকল্প। বস্তুত, 'নয়নচারা-য়' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমুর ক্ষুৎপীড়িত অন্তরের কথকতা নির্মাণের মাধ্যমেই তাঁর কালের সমাজ ও মানুষের সঙ্গে হয়েছেন সহমর্মী, অভিন্নহৃদয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *নয়নচারা*- সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে কাহিনী-বর্ণনায় স্বচ্ছন্দ। প্রারম্ভিক গল্প 'নয়নচারা'-য়ও আমরা গল্পকারের বিবরণের মাধ্যমেই আমুর চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হই। গল্পকার তাঁর প্রান্তবর্তী প্রেক্ষণবিন্দু গ্রাম ও শহরে সমান্তরালভাবে প্রসারিত করেই গল্পের ঘটনাংশকে করেছেন বিকশিত। এই নিষ্ঠা ও অনাসক্তি সর্বত্র আবার রক্ষিত হয়নি। উপস্থাপন ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রেক্ষণ বিন্দুর পূর্বোক্ত অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে কাহিনী অভ্যন্তরে শ্রুত হয় মাঝে-মাঝে ঘটনান্তর্গত চরিত্রের সংলাপ, প্রত্যক্ষ করা যায় চরিত্রের উত্তম পুরুষে উপস্থিতি। নিচের দৃষ্টান্তে দৃষ্টিকোণের এই সামবায়িক ব্যবহার লক্ষ্যণীয় :

> ...তাদের পানে চাইলে কি যেন হঠাৎ সমস্ত কিছু ছাপিয়ে বিপুল বাহু মেলে আসে, আসে...। কিন্তু যা এসেছিলো, মুহূর্তে তা সব শূন্য রিক্ত করে দিয়ে গেল। কিছু

নেই ...। শুধু ঘুম নেই। কিন্তু তাই যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে। নদীতে জোয়ার না ভাটা ? মনে হচ্ছে ভাটা, এবং এ-ভাটাতে ভেসে যাবার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে তার। সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, দূরে বহুদূরে—কোথায় গো? যেখানে শান্তি—সেইখানে? কিন্তু সেই শান্তি কী বিস্তৃত বালুচরের শান্তি ? ৫৬

দুর্ভিক্ষ-দীর্ণ আমু খাদ্যের সন্ধানে শহরে এলেও তার প্রত্যাশা হয় বিপন্ন ও বিধ্বস্ত। অতঃপর রাজপথে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে নিয়োজিত হয় আত্ম-অনুসন্ধানে। নাগরিক আয়োজনপূর্ণ রাতের শহর উজ্জ্বল। কিন্তু আমুর হৃদয় অপূর্ণ, গ্রামাভিমুখি। ফলে সবকিছুর মধ্যে সে গ্রামকেই আবিষ্কার করতে চেয়েছে। আমুর এই মনোভাবনা ও চৈতন্যস্বরূপের বর্ণনা গল্পকার সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই করেছেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই তিনি পূর্ব-অবস্থান ও প্রতিজ্ঞা থেকে হয়েছেন বিচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত। তাই একই অনুচ্ছেদ-অন্তর্গত-'সে ভেসে যাবে, যাবে, প্রশস্ত নদী তাকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে দূরে বহুদূরে-কোথায় গো' বাক্যের প্রারম্ভিক অংশ প্রথম পুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত হলেও শেষাংশের 'কোথায় গো' উচ্চারণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে উত্তম পুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু।

গল্পের শিল্প-সংগঠনের প্রেক্ষণবিন্দুর অনিবার্য ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সব মহৎ প্রতিভাই সদা অতৃপ্ত ও পরীক্ষাপ্রবণ। ' নয়নচারা'-র প্রেক্ষণবিন্দুগত ব্যবহারেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষাশীল ও সতর্ক এবং প্রেক্ষণবিন্দুর আকস্মিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে বক্তব্যকে অনিবার্য ও অন্তর্গত করে তুলতে আগ্রহী।

ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ, তার চৈতন্যস্বরূপের নিগূঢ় ভাষ্যই কথাসাহিত্য, গল্প। ফলে গল্পধৃত সত্য চরিত্রকে আশ্রয় করেই মূর্ত ও রূপময় হয়ে ওঠে। গল্পের চরিত্র সে-হিসেবে গল্পকারেরই মানস-পুত্তলিকা। কিন্তু চরিত্রায়ণ গুণেই একটি চরিত্র সার্থক, সমগ্র হয়ে ওঠে। স্মরণীয়, চরিত্র ও চরিত্রায়ণ সমার্থক নয়, এ দুয়ের পার্থক্য স্পষ্ট ও মৌলিক :

> The term "Character" refers to one of the person's in the story—the end produce of the writer's effort to create a distinct personality. "Characteriztion" on the oiher hand, refers to the means the another employs to create the sum of traits and actions which constitute " Character".[৫৭]

অর্থাৎ, গল্পের একটি চরিত্র কীভাবে তার স্রষ্টার মানস-রসায়নে পরিশীলিত হয়ে পার্সন থেকে ইন্‌ডিভিডিউজালে রূপান্তরিত হয়, চরিত্র-সৃষ্টির সেই প্রক্রিয়াই হচ্ছে চরিত্রায়ণ। অন্যভাবে বলা যায়, চরিত্রায়ণ-গুণেই সাহিত্যের চরিত্র নির্বিশেষ থেকে বিশেষ, সুস্থির ও স্বাবলম্ব হয়ে ওঠে।

গল্পের সব চরিত্রই গল্পকারের চেতনা-অনুগত সৃষ্টি হলেও তাদের শ্রেণী-পরিচয় হয় বিভিন্ন ও বিষম। জীবনের-প্রকাশ বিচিত্র ও বহুধা বিভক্ত বলেই চরিত্রের এই নানা মাত্রিক রূপ। বস্তুত, চরিত্র-রূপায়ণের ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিকে

তার পারিপার্শ্বিকতা, জীবনদৃষ্টি ও সমাজ-পরিচয়সহ রূপময় করে তোলা। এ জন্য চরিত্রায়ণ-কৌশলে অনুসৃত হয় বিবিধ ভঙ্গি, অসমরীতি। 'নয়নচারা' গল্পের চরিত্রায়ণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বৈচিত্র্য-অন্বেষী ও নিরীক্ষাপ্রিয়। দুর্ভিক্ষ-তাড়িত আমু গ্রাম থেকে শহরে এলেও নগর তার অনাত্মীয়, গ্রামীণ স্বচ্ছলতা ও শান্তিই তার অন্বিষ্ট। আমুর এই স্মৃতিচারী ও অনুভূতিময় ব্যক্তিস্বরূপের জন্যই তার চরিত্রায়ণে গল্পকার ব্যবহার করেছেন চেতনাপ্রবাহ রীতি, আমুর স্মৃতিময় অনুষঙ্গ :

> লালপেড়ে শাড়ি ঝলকাচ্ছে : রক্ত ছুটছে। যেমন করিম মিঞার মুখ দিয়ে সেদিন ফিনকি দিয়ে ছুটেছিলো রক্ত। তবে মেয়েটার গলার নিচেটা শাদা, এত শাদা যে মনটা হঠাৎ স্নেহের ছায়ায় ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়বার জন্যে খাঁ-খাঁ করে ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ দুটি পয়সা দিয়ে চলে গেলো রক্ত ঝলকিয়ে। কিন্তু একটা কথা: ও কী ভেবেছে যে তার মাথায় সাজানো চুল তারই? আমু কী জানে না—আসলে ও চুল কার। ও-চুল নয়নচারা গাঁয়ের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল।[৫৮]

সাহিত্য ও চিত্রকলা—উভয় প্রকাশ-মাধ্যমের প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ থাকলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সাহিত্যকেই নির্বাচন করেছেন। কেননা, তাঁর বিবেচনায় চিত্রকলার তুলনায় সাহিত্য দ্রুতগামী, সর্বাধিক আদ্রিত ও বিপুল মানুষের অন্তরস্পর্শী। বস্তুত, চিত্রকলার প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্ত হওয়ায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্মে, তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষা ও আঙ্গিক-শৈলীতে চিত্ররীতির উপস্থিতি প্রবলভাবে লক্ষণীয়। 'নয়নাচারা' গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ অনিবার্য কারণেই দৃশ্যগুণময় পরিচর্যা এবং পৌনঃপুনিকভাবে ছবি এঁকে বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী ও উৎসুক। ' নয়নচারা'-র ভাষা মুখ্যত চিত্ররূপময়। পাত্র-পাত্রীর অবস্থান, সংকট ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাঠ ও শ্রুতির মাধ্যমে আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করার পূর্বেই আমরা তাদের দেখি, দর্শন-ইন্দিয়ের সাহায্যেই তারা আমাদের মনোলোকে প্রবেশ করে:

> ময়ূরাক্ষীর তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর: শান্ত নদী। দূরে একটি নৌকায় খরতাল ঝনঝন করছে, আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে।[৫৯]

আধুনিক ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ডিটেইল্স বা পুঙ্খতার ব্যবহার। বস্তুর যতটুকু আমরা দেখি তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে অদেখা। ইমপ্রেশনিস্টিক শিল্পী তাই বস্তুর খুঁটিনাটি পরিহার করে নির্বাচিত রেখা, রঙের সাহায্যেই বস্তুর সমগ্র রূপকে ধরতে চান।[৬০] উপরের উদ্ধৃতিটিতে মূর্ত-হয়ে-ওঠা চিত্র অতিরিক্ত-তথ্য পরিবেশন করেনি। নির্বাচিত শব্দ, বিশেষণ ও মূল্যায়নধর্মী পদ এবং নিসর্গ, পারিপার্শ্বিকতা ও ব্যক্তির অবস্থানসম্ভূত ঐক্য-সমন্বিত সামগ্রিক চিত্রই এখানে নির্মিত হয়েছে। এ ক্যানভাস একজন কথাকোবিদের হলেও এর অন্তরে অবস্থান করছেন কোনো রূপদক্ষ প্রকাশবাদী শিল্পী।

আধুনিক চিত্রকলা ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা সুররিয়ালিজম। এই চেতনায় বিশ্বাসী শিল্পী, সৃষ্টিশীল সত্তা কোনো প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস ও কথিত বা প্রতিষ্ঠিত নান্দনিক প্রত্যয়ের আলোকে বস্তু ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেননি। ব্যক্তির চেতনাকে

সার্বভৌম জ্ঞান[৬১] করায় জগৎ ও জীবনকে তাঁরা চরিত্রের অন্তর্গত চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে নির্মিত হয়েছে সুপার রিয়ালিটি বা পরাবাস্তবতার।

কাজি আফসারউদ্দিনকে লিখিত পত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সুররিয়ালিজম-সচেতন মনের পরিচয় আমরা পেয়েছি। আর এই বিশেষ মেধার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করি *নয়নচারা*-র গল্পসমূহে; বিশেষত, 'নয়নচারা' গল্পে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যে-সব চরিত্র সমস্যায় আকীর্ণ, মনোলোকের গভীরে কোনো বিষাদ কিংবা বিপর্যয়কে ধারণ করে চলমান সেই সব চরিত্রের চৈতন্যসংকট, নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও বিক্ষেপচেতনা রূপায়ণে গল্পকার প্রথাগত ভঙ্গিতে, আচরণের বাস্তবিক বিবরণ দানের পরিবর্তে আশ্রয় করেছেন সুররিয়ালিস্টিক পদ্ধতি। বাইরের জগৎ , পারিবেশিক অবস্থান কিংবা বস্তুর স্বরূপ তাই এ-সব চরিত্রের উপলব্ধিতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত, ব্যক্তির মগ্নচেতনার আলোকেই রূপময়। 'নয়নচারা'-র আমুর ক্ষুধাময় চৈতন্যে অনাহারের যন্ত্রণাবোধ এবং খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে বন্ধ ঘরের জানালা দিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো কিংবা ময়রার দোকান ও তার আয়োজন আমুর আকাঙ্ক্ষাকেই আরো তীব্র করেছে, তার চেতনায় বিভ্রম ঘটিয়ে জন্ম দিয়েছে পরাবাস্তবতার। প্রথাবদ্ধ রীতিতে, তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে আমুর এ চৈতন্যস্বরূপ নির্মাণ সম্ভব ছিল না। গল্পকার তাই ব্যবহার করেছেন সুররিয়ালিস্টিক রীতি ও ভাষাশৈলী:

১ আগুনটা দুলছে না তো যেন হাসছে: আমুরা যখন ক্ষুধাব যন্ত্রণায় কঁকায়–তখন পথচলতি লোকেরা যেমন আলাদা অপরিচিত দুনিয়ার কোনো আজানা কথা নিয়ে হাসে, এ-ও যেন তেমনি হাসছে।[৬২]

২ ময়রার দোকানে মাছি বোঁ-বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী-কোমলতা, সে চোখময় পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারে ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। ওধারে একটা দোকানে যে ক-কাড়ি কলা ঝুলছে, সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়। ওগুলো কলা নয়তো, যেন হলুদ-রঙা স্বপ্ন ঝুলছে।[৬৩]

এতদ্‌ব্যতীত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'নয়নচারা' গল্পের চরিত্রায়ণে ব্যক্তিকে তার দ্বৈরথ সত্তা, তার বর্তমানের ঘটনাবহুল জীবন ও অতীত-অবস্থান এবং আচরণসৃষ্ট প্রতিক্রিয়াসহ চলমান করে নির্মাণ করেছেন। তাঁর এ পর্যায়ের অধিকাংশ গল্পের প্রধান চরিত্রই তাদের সত্তা ও চেতনাপ্রবাহে সুপার-ইগোকে ধারণ করেছে। ফলে বর্তমান তাদের কাছে হয়েছে বিষাদময় ও বীতবর্ণ।[৬৪] 'নয়নচারা'-র আমুর চেতনায় তার সুখ-স্মৃতিময় গ্রাম ও শহরের বেদনাময় অভিজ্ঞতা সমান জাগ্রত। আর এই দুই বিপরীতমুখি, গুণগতভাবে পৃথক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ হয়েছে বলেই সে ব্যথাতুর, যন্ত্রণাময় ও উন্মূল-বোধে আচ্ছন্ন।

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *নয়নচারা* গ্রন্থের নাম-গল্প 'নয়নচারা'-র বিষয়বিবেচনায় সময় ও সমাজ-সচেতন ও মানবিক দায়িত্ববোধ-জাগরিত এবং রূপাঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি চিত্রকলাপ্রিয়, আধুনিক মনস্তত্ত্বজ্ঞান-পরিস্রুত।

'মৃত্যু-যাত্রা'-য় দুর্ভিক্ষ রূপ লাভ করেছে 'নয়নচারা' থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়, ব্যাপক মানুষের বাস্তব ও ক্ষুধা-উৎসারিত চৈতন্যের একান্তবর্তী হয়ে। গ্রামে খাদ্য নেই। দীর্ঘ অনাহারে নির্জীব কঙ্কালসার মানুষগুলি তাই গঞ্জে চলেছে। কিন্তু সে-পথ অনেক দূরের। এ অভিযান বন্ধুর, প্রতীক্ষার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। অভীষ্ট স্থানে তাই অনেকেই পৌঁছতে পারেনি। পথেই অনেক অনাহারী- জীবন অকালে ঝরে গেছে। বস্তুত, 'মৃত্যু-যাত্রা' সেই সব মানুষের ব্যর্থ যাত্রার কাহিনী যারা ক্ষুধায় কাতর, শীর্ণ, অস্থিচর্মসার; অথচ পরমভাবে তারা আকাঙ্ক্ষা করেছে বাঁচার, সামান্যতম আশ্রয়ের, ক্ষুধার খাদ্যের।

'নয়নচারা' ও 'মৃত্যু-যাত্রা' দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত হলেও গল্পদ্বয়ের চরিত্রায়ণ কৌশল, লেখকের প্রেক্ষণবিন্দুগত অবস্থান অভিন্ন নয়; পৃথক-সূত্রাশ্রয়ী, চরিত্রসমূহের বাস্তব অবস্থান সংশ্বলিত। 'মৃত্যু যাত্রা'-য় কোনো একক চরিত্র গল্পকারের আকর্ষণ-কেন্দ্র নয়। এ গল্পে তিনি ব্যক্তিক চেতনার বাইরে গিয়ে সমগ্র গ্রামবাসীর অখণ্ড চৈতন্যরূপকে ধরতে চেয়েছেন। ক্যানভাসের এই ব্যাপ্তির কারণে একজন নিপুণ স্কেচ-শিল্পীর মতোই তিনি তুলির সংক্ষিপ্ত রেখাভাসে 'মৃত্যু-যাত্রা'-র চরিত্রসমূহ মূর্ত ও রূপান্তরিত করেছেন। তিনু, করিম, কলমি, মতি, আসগর—কারোর প্রতিই গল্পকারের বিশেষ অভিনিবেশ নেই, অথচ তাঁর চরিত্রচিত্রায়ণের মৌলিকত্বে প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব, নিজস্ব চারিত্রে বিশিষ্ট ও পরিচিত। করিম উদাস স্বভাবের, জীবনকে সে বাউলদৃষ্টি দিয়েই দেখতে চায়। তার কণ্ঠ থেকে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় লোককথা, কলমন পরীর উপাখ্যান। সে-তুলনায় তিনু বাস্তববুদ্ধি-সচেতন, নিজস্ব বিবেচনায় সুস্থির ও সংগ্রামী। 'মতি নাপতের বউ' কলমির বয়স অল্প। কিন্তু ক্রমাগত অনাহারে থাকায় সে রুগ্ন, বীতলাবণ্য। ঘুমন্ত মতির গোঙানির শব্দ তাই ভিন্ন সত্য, তার অধিবাস্তবিক সত্তাকেই প্রতীকায়িত করেছে। তিনুর মনে হয়েছে: 'কলমির বুকে যেন নোংরা কুৎসিত যতো জীব বাসা বেঁধেছে।' আসগরকে বিদ্রোহী, প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে নির্মাণ করতে গিয়ে লেখক তাকে 'ইবলিশ সয়তানের চেলা' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র আসগরের অবয়ব বর্ণনায় ওয়ালীউল্লাহ্র তথ্যবহ পরিচর্যা ও চিত্ররূপময় রীতির সমীকরণ লক্ষণীয় :

> ...বিচিত্র ছেলে এই আসগর। চেহারা তার রুক্ষ এবং স্বভাবটাও রুক্ষ। সর্বক্ষণ চোখ দুটো জ্বলে ধক্‌ধক্ ক'রে এবং এমন একটি অমঙ্গল তার সে-চাহনিতে যে, মানুষের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।[৬৫]

মুনীর চৌধুরী[৬৬] (১৯২৫-১৯৭১) জানিয়েছেন যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'নোয়াখালী ও ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ও ডায়ালেক্ট প্রচুর পরিমাণে' ব্যবহার করে তাঁর রচনার ও 'পূর্ববাংলার গদ্যরীতির উৎকর্ষ' সাধন করেছেন। তাঁর এ বিবেচনা মুখ্যত *লালসালু* (১৯৪৮), *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৫) ও *দুই তীর* (১৯৬৫)-এর ভাষাশৈলী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে।

মুনীর চৌধুরীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে মতান্তরের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি *নয়নচারা*-র গল্পগুলি আলোচনা-অন্তর্গত করলেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন যে,

'মৃত্যু-যাত্রা' এবং 'জাহাজী' 'রক্ত', 'খুনী' প্রভৃতি গল্পে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উপভাষা সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, স্থানিক বর্ণিমার শিল্পিত ব্যবহারের ফলে এ সব গল্পের চরিত্র তাদের জীবনসংকট, সমস্যাসহই তাদের নিজস্ব অঞ্চল বিশেষের মৃত্তিকামূলে প্রোথিত হয়েই, নির্বিশেষ রূপ পেয়েছে। তারা হয়ে উঠেছে 'বৃহত্তর দুর্জ্ঞেয় জীবন-রহস্যের প্রতীক'। 'মৃত্যু-যাত্রা'-র চরিত্রসমূহের ভাষায় অংকিত হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ছাপ। স্মরণীয়. পদের শেষধ্বনিক-এর স্থলে গ উচ্চারণ, এ-এর ক্ষেত্রে ই (হবে > হব; দিলে > দিলি), শব্দের আদিতে ল-এর স্থলে ন ব্যবহার (লাগে > নাগে) প্রভৃতি রংপুরের উপভাষারই[৬৭] বৈশিষ্ট্য 'মৃত্যু-যাত্রা'-র তিনু-র ভাষা প্রসঙ্গত স্মরণীয় :

> –কুতি যাবা আজ? সন্দি নাগে-নাগে, গঞ্জে পৌঁছুতি অনেক রাত হয়ি যাবে। তার চাইতি চল মোরা গাঁয়ে যাই। এক চৌধুরী সায়েবের কথা শোনলাম, পায়ে ধরি পড়লি পরে শুতি খাতি দেবেন না কী।[৬৮]

বস্তুত, 'মৃত্যু-যাত্রা'-য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি বিশেষ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-দীর্ণ নিরুপায় মানুষের প্রতিকারহীন যন্ত্রণাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। ফলে এ গল্পে যেমন কোনো একক চরিত্র প্রাধান্য পায়নি, তেমনি এর ভাষাশৈলীও হয়েছে আঞ্চলিক উপাদানে প্রাত্যহিক ও বিশিষ্ট।

'সেই পৃথিবী' গল্পের সাদেক অপরাধ জগতের অধিবাসী। যুদ্ধই তার দেহ ও মনে কদর্যের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জীবনাদর্শের দিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কখনো মানবাত্মার পরাভব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেননি। মানুষের সৎ, শুভ, স্বাধীন ও দায়িত্ববান সত্তাতেই তিনি ছিলেন আস্থাবান। সাদেক তাই শেষপর্যন্ত স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনে হয়েছে পুনর্বাসিত এবং ভীতিশূন্য, নিরাপদ জীবনের স্বাদ পাওয়ার পর পূর্বের বিপত্তিক্ষুব্ধ ও পঙ্কিল জীবনের প্রতি তার অন্তরে জেগেছে প্রবল গ্লানি, প্রগাঢ় অনুশোচনা। 'নয়নচারা'-র আমুর মতোই 'সেই পৃথিবী'-র সাদেক–অতীত ও বর্তমানের জীবন-জিজ্ঞাসা তাড়িত, দ্বৈতসত্তার অন্তর্পীড়নে অসুখী। ফলে সাদেকের চাকরি-প্রাপ্তির আনন্দও স্থায়ী হয়নি। সৎভাবে উপার্জিত অর্থের হিসেব মেলাতে গিয়ে পূর্বজীবন তার বর্তমানকে বিস্বাদময় করে দিয়েছে :

> নিজেকে তার ভারি-ভারি ঠেকছে এখনো, তবে তলায় অনেক নোংরা জমেছে। জীবনে যে সে নোংরাই ঘেঁটেছে তা নয়, তার মধ্যেও নোংরা জমে উঠেছে ঢের, আজ তাই চেতনায় জেগে নিজেকে ভারি বোধ হচ্ছে।[৬৯]

'জাহাজী' ও 'রক্ত' গল্পদ্বয় পাঠ করতে গেলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬)-এর 'সারেঙ'-এর কথা মনে পড়ে। 'সারেঙ' নামের মাধ্যমেই গল্পটির আখ্যান সংকেতায়িত হয়েছে। সারেঙ তার কীর্তনখোলা নদীর পুনরাবৃত্ত জীবন বহন করেও শেষপর্যন্ত উপনীত হয়েছে এক মহৎ চেতনায়। নতুন বউয়ের হার-চুরি-করা খালাসি ছেলেটির পরিচয় জেনেও নাসিমকেই সে সিঁড়ি ধরার নির্দেশ দিয়েছে। আর একই সঙ্গে সে, সারেঙ হয়ে উঠেছে তার নববধূর পূর্বস্বামীর, পুত্র নাসিমের বাপ। কিন্তু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'জাহাজী'-র করিম সারেঙ কিংবা 'রক্ত'-র আবদুল খালাসি কোন মহৎ আদর্শ কিংবা চিন্তার ভাবলোকে উন্নত হয়নি। গল্পকার তাঁর ঐতিহ্যমুখি ও বিশ্বকেন্দ্রিক জীবনাদর্শে সংশ্লেষায়িত করেই তাদের নির্মাণ করেছেন। ফলে 'জাহাজী' ও 'রক্ত' গল্প হিসেবে ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে; করিম ও আবদুল পেয়েছে অন্তর্মুখি সংবেদনজাত স্বাতন্ত্র্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন অভিজ্ঞান-উৎসারিত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য।

করিমের সারা জীবন কেটেছে জাহাজে। জীবনের গোধূলি বেলায় হিসেব মেলাতে গিয়ে সে দেখেছে যে, সামান্য অর্থ ছাড়া তার জীবনখাতায় আর কিছুই জমা হয়নি। সমুদ্র চিরবহমান ও চঞ্চল হলেও করিমের জীবন এক অচঞ্চল বিন্দুতে স্থির, কিংবা মরুভূমির মতোই বন্ধ্যা ও শস্যহীন। সে তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলার বন্দরে পৌছেই জাহাজি-জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে। অকস্মাৎ রাত ও দিনের সন্ধিক্ষণে, ফজরের নামাজ অন্তে একটি ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গত সন্ধ্যে থেকে কার্গোউইঞ্চে কাজ করছিল লস্কর ছাত্তার। চিফ্ অফিসারের হুকুম রাতের মধ্যেই সব কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু দ্রব্যের আধিক্য হেতু তা সহজ ছিল না। তবু লস্করেরা চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। ভোরের দিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কারণে ছাত্তার হাচওয়ের আড়ালে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করতে চেয়েছিল। আর তখনই তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে চিফ্ অফিসারের। ফলে ছাত্তারের প্রাপ্তি হয় কয়েকটি লাথি।

ছাত্তার সদ্য গ্রাম থেকে আসা এবং এ তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। গ্রামীণ স্বাভাবিক সারল্য-ভরা তার মন তাই পদ ও সামাজিক স্তরভেদে বিরাজিত পার্থক্যজ্ঞান-রহিত। ফলে চিফ অফিসারের আচরণে ছাত্তার অন্তরে গভীর অপমান ও পীড়ন বোধ করে। প্রতিকারের আশায় অতঃপর সে সারেঙের সঙ্গে দেখা করে। করিম সারেঙ তখন আলোছায়াময় সামুদ্রিক দুর্লভ এক পরিবেশের একান্তবর্তী বেদনাময় চেতনায় সম্মহিত ছিল বলে ছাত্তারের জন্যে তার মাঝে সঞ্চারিত হয় গভীর পিতৃস্নেহ। করিমের জীবনে ঠিকমতো নোঙর পড়লে তারও হয়ত ছাত্তারের মতো পুত্র থাকত। ছাত্তারকে তাই সে বলে : 'যা আঁই দেই ক্যুম।' আলাপচারিতায় করিম জেনেছে যে, ছাত্তার বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এ আগমন স্নেহের সমুদ্রে অবগাহন নয়, বিপদ-সমুদ্রে বিরতিহীন যাত্রা। করিম তাই কলকাতা বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই ছাত্তারকে বাড়ি যেতে বলে। কিন্তু তার অবসর গ্রহণ করা হয় না। সে নতুন করে জাহাজে হয় চুক্তিবদ্ধ। করিম সারেঙের একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্য ও উত্তরাধিকারহীন এক বেদনা—'জাহাজী' গল্পে তাই রূপ লাভ করেছে।

'জাহাজী'-র করিম সারেঙ্গ এবং 'রক্ত'-এর আবদুলের সংকট ও আত্ম-মূল্যায়নের তেমন তারতম্য, লক্ষণীয় বৈশাদৃশ্য না-থাকলেও তাদের অবস্থান পরস্পরবিরোধী, উপলব্ধির স্বরূপ স্বতন্ত্র। 'জাহাজী'-র করিম সারেঙ বলে তার শ্রেণী-অবস্থান খালাসি আবদুল থেকে উচ্চ, অভিজাত। আবদুল কর্মচ্যুত, বেকার হলেও করিম স্বপদে আসীন, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। আবদুলের বয়সও তার নেই। পরনের শ্বেত বসনের

মতোই করিমের কেশ শুভ্র। তার উচ্চারণ, আচরণ ও জীবনপদ্ধতিও আবদুল থেকে ভিন্ন, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত। করিমের নিঃসঙ্গ চেতনার রূপায়ণে গল্পকার ব্যবহার করেছেন সমুদ্রের শান্ত ও দিগন্তবিস্তারী উপমান চিত্র, ভোর-আকাশের শুকতারার প্রতীক, কেবিন ঘরের দেয়ালে প্রতিফলিত করিমের ছায়ার রূপক ও কঙ্কালের চোখের উপমা। কিন্তু আবদুলের চরিত্রায়ণে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী উপমা-রূপক ও উপমান চিত্র নির্বাচন করেছেন যা একান্তভাবেই আবদুলের চেতনাতলস্পর্শী, তার বর্তমান জীবন ও অবস্থানের সমান্তরাল। বদ্ধ গুদাম ঘর, কিংবা গ্যাস পোস্টের ধোঁয়ার মতো রহস্যময় ক্ষীণ আলোই আবদুল চরিত্রের অনিবার্য ছবি, চিত্রকল্প ও শব্দরূপ।

'জাহাজী'-র অন্তর্গঠন 'নয়নচারা'-র মতোই সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার এবং ঘটনান্তর্গত চরিত্রের সংলাপ অর্থাৎ, উত্তমপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গতিময়। অন্য কথায়, 'জাহাজী' গল্পের চরিত্রায়ণে যুগপৎভাবে লেখকের ও গল্পাশ্রিত চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর পরিচর্যা গৃহীত হয়েছে :

১ স্মৃতিমন্থনে অদ্ভুত বেদনা। যে-দিন কেটে গেছে, সে-দিন আর কখনো ফিরবে না। এবং জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে ব্যর্থই হলো। করিম সারেঙ্গের ভেতরটা যেন ফাঁপা, শূন্য, প্রচণ্ড ব্যর্থতায় রিক্ত। এবার সে-অন্তরে আবার সে-প্রশ্নটি অবুঝ গোঁয়ার ছেলের মতো গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে লাগলো। **তুমি কী দিলে আমাকে, আর আমি কী দিলাম তোমাকে**। স্বীকার করি, কিছু অর্থ মিলেছে কিন্তু সে-থেকে বঞ্চিত হলেই কী অর্ধমের বন্যা ছুটবে, আর মিললেই কী ধর্মের বজ্র ঘোষণা হবে?[৭০]

২ সারেঙ্গ স্তব্ধ। কিন্তু ঘরের আলো শীঘ্র ম্লান ও নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তা উঠুক, তবে কী-একটা প্রশ্ন—অতি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য-প্রায় কী-একটা প্রশ্ন—থেকে থেকে মাথানাড়া দিয়ে উঠছে। দীর্ঘ জীবন-তো অতিক্রান্ত হলো প্রায়, কর্মজীবনের অবসান ঘনিয়ে এসেছে. **কিন্তু তুমি আমাকে কী দিলে, আর আমি তোমাকে কী দিলাম?** সারেঙ্গ কিছু চঞ্চল হয়ে উঠলো : পবিত্র প্রভাত—এ সময়ে বেদনার মতো অবসান ঘনিয়ে উঠছে কেন মনে ?[৭১]

প্রথম উদ্ধৃতিতে করিম সারেঙের নৈঃসঙ্গ্যনুভূতি কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণিত হওয়ায় উদ্ধৃতাংশটি গীতরূপময় অথচ দর্শনপরিস্রুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সেই একই চিত্রগীতিরূপময় emotive চেতনারূপ। এখানে গল্পকার করিম সারেঙের বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ চিত্ততলকেই উপস্থাপন করেছেন। স্মরণীয়, মেধাকে আবেগে এবং আবেগকে চিত্ররীতিতে উপস্থাপন করা ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি বৈশিষ্ট্য।

বস্তুত, 'জাহাজী' বৃদ্ধ করিম সারেঙের নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনামথিত কাহিনী; তারই অন্তর গভীরে লালিত একটি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ক্ষণিক উদ্ভাসনচিত্র।

'রক্ত'-এর আবদুলের সমস্যা ভিন্ন; তারই স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমুদ্রিত। সাত বৎসর আগে সে জাহাজে চাকরি নিয়েছিল। কিন্তু এত বৎসরের বিরামহীন পরিশ্রম ও

অনিয়মে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাই আবদুলকে চাকরি থেকে জবাব দিয়েছেন। আবদুল অতঃপর বেকার, এক ব্যর্থ হতাশা ও শূন্যতাবোধে বিপন্ন, মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। তার চারিদিকে কেবলই নিশ্চল, স্থির আর ফ্যাকাশে সমুদ্র। আশাশূন্য জীবনের সায়াহ্নিক মুহূর্তে পানের দোকানে টুলে বসে আবদুল যখন সাফল্য- ব্যর্থতার সালতামামিতে ব্যস্ত তখনই তার সঙ্গে পরিচয় হয় আক্কাসের। অভিন্ন জীবনার্থের কারণে অল্পতেই উভয়ে হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। আবদুল আক্কাসকে চা খাওয়ায়, বিড়ি দেয়, কথা বলে। শহরতলীর এক বস্তিতে সে থাকে। সংসারে তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু তাকেও আক্কাস খেতে দিতে পারে না। নিত্য অনাহার আর উপোষ তাদের সঙ্গী। কিন্তু আবদুল দেখেছে যে, তার গ্রন্থিহীন জীবন থেকে আক্কাসের জীবন ভালো, সুখচর্চিত। আক্কাসের ঘরের বাইরে দড়ির খাটিয়ায় যখন এ সব অন্তঃচারী ভাবনায় আবদুল নিমজ্জিত তখনই তার মুখ থেকে রক্ত নির্গত হয়। আক্কাস ও তার স্ত্রী আবদুলের শুশ্রূষা করে আর এই অন্তরঙ্গ পরিচর্যায় আবদুলের মরুময় জীবনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ আরো প্রসারিত, গভীর হয়ে ওঠে। 'রক্ত' তাই আবদুলের কথকতা; তারই নিরাশাকরোজ্জ্বল জীবনের বাকশিল্প। শহরতলী, রাত, পারিপার্শ্বিকের পুরোভূমি আর পটভূমি অংকন ও তার অবশ্যম্ভাবী আন্তর-ক্রিয়া সৃষ্ট 'রক্ত' গল্পের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রান্ত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'পরাজয়' ও 'খুনী' গল্পদ্বয় পূর্ববাংলার নদী তীরের জেগে-ওঠা চরতাড়িত ও চরপীড়িত জীবনেরই নির্মম ভাষ্য, নিরাবেগ কাহিনী। আঞ্চলিক মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়ণের এ প্রয়াস তিন দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম লক্ষণীয় প্রবণতা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) এ-ক্ষেত্রে সবিশেষ কৃতী। তাঁর 'কয়লাকুঠি' গল্প প্রকাশিত হয় সাহিত্য-প্রতিভা হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্মপ্রকাশের পূর্বে, কার্তিক ১৩২৯/১৯২২ সংখ্যা মাসিক *বসুমতী*-তে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, শৈলজানন্দের গল্পের পটভূমিই কেবল বাংলা কিংবা বিহারের খনি অঞ্চল, গল্পের মৌল সংকট একান্তই ব্যক্তিগত, কখনও একটি আবার কখনো একাধিক চরিত্র-কেন্দ্রিক। আর এই বিশেষ মনোভঙ্গির কারণেই তাঁর 'কয়লাকুঠি' খনি অঞ্চলের শিল্পালেখ্য হওয়ার পরিবর্তে হয়ে উঠেছে নান্‌কু-বিলাসীর দাম্পত্য জীবনের ভাষ্য, আর তাঁর 'নারীর মন' (১৯২৩) গল্প প্রধানত পীরু-ভুলি-টুরনীর ত্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন তাঁর নিজের সমাজ ও মানুষদের জীবনাশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তেমনি তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্যানুরক্তিতে মুক্তি খুঁজলে চিত্রল পতঙ্গের মতোই আহুতি দিতে হবে। তাই উত্তরাধিকারে সমর্পিত ও ঐতিহ্যকে স্বীকরণ করেই তিনি আত্মমুক্তি অন্বেষণ করেছেন। ফলে তাঁর চরাঞ্চল আশ্রিত গল্পগুলিতে সেই বিশেষ অঞ্চল, নির্দিষ্ট এলাকার নির্বিশেষ মানুষের জীবনসংগ্রামই মুখ্য, ব্যক্তি সেখানে সমষ্টিরই প্রতিনিধি, প্রতীক ও প্রতিভূ।

নদী-চরের জীবন অনিশ্চিত। এজীবন প্রকৃতির কাছে অসহায়, নিরুপায়ভাবে পরাজিত। কিন্তু বিপত্তি, পৌনঃপুনিক বিপর্যয় ও পরাভব সত্ত্বেও তাদের সংগ্রাম থামে

না। নব আশা ও চেতনায় দীপ্ত ও প্রাণিত হয়ে জীবন আবার সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবেই নতুন চরে মাচা বেঁধেছিল ছমির ও কুলসুম। কিন্তু তাদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা সফল হয়নি। মাচায় ওঠার অনতিকাল পরেই সর্পদষ্ট হয়ে ছমির মারা যায়। তখন মধ্য রাত। নিকটবর্তী ছেরাদের মাচার আলো দেখা গেলেও দুই মাচার ব্যবধান বিস্তর। তাই রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে কুলসুমের অনুচ্চ কণ্ঠের ডাক কেবল শূন্যেই মিলিয়ে গেছে, কুলসুমের সাহায্যে কেউ আসেনি। পরের দিন মজনু ও কালু এসে ছমিরের মৃতদেহ নিয়ে গেছে, সঙ্গে সদ্য বিধবা কুলসুমকেও। চরের জীবন এমনই শ্বাপদসংকুল, মৃত্যু ও মড়কের মধ্য দিয়ে বহমান। ছমির-কুলসুম তাই কোনো বিচ্ছিন্ন দম্পতি নয়, চরবাসী মানুষদেরই তারা প্রতিভূ, বিশেষে নির্বিশেষ।

সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'পরাজয়' গল্পের ভাষা নোয়াখালি-রংপুর অঞ্চলের পরিচয় বহন করেও ইমপ্রেশনিস্‌টিক, আলো-ছায়ার ব্যবহারে প্রোজ্জ্বল :

> আড় চোখে সে-নৌকার ছই-এর ভেতরে তাকালো মজনু : কাঁচা সোনার মতো রঙের সে এক মেয়ে বসে রয়েছে সেখানে। মুখে তার ঘোমটা নেই, পরনে কালো শাড়ি।[৭২]

বেদনাকে নিঃশব্দের মধ্যে পারণ 'পরাজয়' গল্পের ভাষাশৈলীর সাফল্যের অন্যতম প্রান্তবর্তী এলাকা। কুলসুমের মুখে গল্পকার তেমন কোনো সংলাপ দেননি। তার অন্তর্গত বেদনাকে তিনি বর্ণনার মাধ্যমেই করেছেন হৃদয়স্পর্শী: আর সে-বর্ণনা চিত্রাত্মক, নৈঃশব্দ্যে ভরা :

> ... মাচার মাঝখানের একমাত্র দরজার সামনে দুই হাঁটু উঁচু করে বসে ছমিরের বউ কুলসুম স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিচে নৌকা বেঁধে ওরা দুজন যখন ওপরে উঠে এলো, তখনো সে নড়লো না। মাচার কোণে অন্ধকার, সে-অন্ধকারে খড়ের বিছানায় ছমির গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মজনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো কুলসুমের পানে, তার মুখে ঘোমটা নেই, স্থির চোখে অদ্ভুত স্তব্ধতা।[৭৩]

গভীরভাবে বেদনাময়, সুতীব্র উত্তেজনাকর পরিবেশ কিংবা পরিস্থিতি রূপায়িত করতে গিয়ে চকিতে একটি গীতল, কাব্যময় পরিবেশের ইংগিতও দান করা হয়েছে 'পরাজয়' গল্পে :

> ওদিকে রোদ খরখর করছে, নদীর বিস্তৃত বুক ঝকঝক করছে: সেদিকে তাকানো যায় না। কিন্তু হঠাৎ দিগন্তরেখা পেরিয়ে মেঘ জাগতে লাগলো, এবং তারই ছায়ায় নদীর সে-প্রান্ত উঠলো ধূসর হয়ে। এধারে এখনো শান্তি আর নীরবতা: নদীর জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা মাছরাঙা উড়ে আসছে এদিকে, আর আকাশে ঘুরে-ঘুরে উড়ছে শঙ্খচিল।[৭৪]

বস্তুত, 'পরাজয়' গল্প কুলসুমের বেদনাময় প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত, আর এর সংগঠন ও ভাষার মাধ্যমেই সেই বিশেষ বেদনাকে শিল্পিত প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে।

'খুনী' ঘাতক রাজ্জাকের কথামালা। চর অলেকজাণ্ডারের সোনাডাঙা গ্রামের মৌলভীদের ছেলে সে। আকস্মিক উত্তেজনায় ফজু মিঞার পুত্র ফইন্নাকে খুন করে সে

হয় নিরুদ্দিষ্ট। প্রাণের ভয় তীব্রভাবে তাকে তাড়া করেছে। শেষে উত্তরবঙ্গের এক মহকুমা শহরে বৃদ্ধ দর্জি আবেদ মিঞার স্নেহ ও প্রশ্রয় রাজ্জাক লাভ করেছে। তবে তা রাজ্জাক-রূপে নয় দর্জির হারানো ছেলে মোমেন হিসেবে। কিন্তু এ জীবন তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারেনি। আবেদ ও তার বিবির একান্ত স্নেহধারাও নির্বাপিত করতে পারেনি রাজ্জাকের অন্তর্গত অনুশোচনার আগুন। তাই নিরুদ্দিষ্ট মোমেন বাড়ি ফিরলেই সে যাত্রা করেছে শান্তির খোঁজে, নতুনভাবে বাঁচার ঠিকানার সন্ধানে।

'খুনী'-র সংগঠন চেতনাপ্রবাহরীতির। গল্প-মধ্যে একই সঙ্গে দুটি কাহিনী, বাহির ও আন্তর কাহিনী সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। আবেদ দর্জির আশ্রিত রাজ্জাকের অন্তর্লোকে সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত রয়েছে পূর্বজীবনের স্মৃতিময়, হৃদয় গভীরে অপরাধ-বোধকে বহনকারী আর-এক রাজ্জাক।

চরিত্রের বাস্তবতার প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'খুনী' গল্পে নোয়াখালি ও রংপুরের উপভাষাকে প্রসঙ্গবদ্ধ করেছেন। রাজ্জাকের কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপ, তার মধ্যবর্তী ম-ধ্বনির অনুনাসিক উচ্চারণ, শব্দের আদি ধ্বনি প-এর স্থলে ফ ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ করেই আমরা বুঝি যে, সে নোয়াখালির সেই বিশেষ চরাঞ্চলের অধিবাসী, যেখানে জীবনের জটিলতা, বৈরী প্রকৃতির কারণেই মানুষ হয় রুক্ষ, অল্পতেই উত্তেজিত। আর উত্তরবঙ্গের 'কোন এক মহকুমা শহর'-এর অধিবাসী আবেদ দর্জি 'কেডা বাহে', 'মোর ছেইলা' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করলেই আমরা জানতে পারি যে, সেই মহকুমা শহরটি রংপুর কিংবা এ অঞ্চলের কোনো নগর-জনপদ। তবে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উপভাষা সংগ্রহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য ছিল না। একজন প্রকৃত ন্যাচারালিস্ট চিত্রশিল্পী যেমন নিসর্গচিত্রে রং ব্যবহার করেন সেভাবে, অনুরূপ প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে স্থানিক বর্ণিমা (local colour) প্রয়োগ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর গল্পের সংগঠন ও ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীর মুখ-নির্গত আঞ্চলিক বুলি তাই তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা, শ্রেণী-অবস্থান, স্থানিক পরিচয়কেই সমুন্নত, উচ্চকিত ও বাস্তবানুগ করেছে।

এ কালের সাহিত্য-সংগঠন একটি সামবায়িক শিল্প। পূর্ববর্তী শতাব্দীর structure of the ladder-এর স্থলে বিশ শতকের প্রকাশমাধ্যমের অন্তর্বয়নে structure of the cobweb[৭৫]-এর প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পূর্বধারণা-প্রসূত এবং মানববিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ব্যতীত যুদ্ধোত্তর উপন্যাস কিংবা গল্পের সংগঠন বিবেচনা সম্ভব নয়। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমর-পরবর্তী কালে লেখকদের মনোবিশ্ব সেভাবে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তাসূত্রে গড়ে উঠেছে। আমরাও দেখেছি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *নয়নচারা* পর্যায়ের গল্পগুলির চরিত্র-সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন তাঁর আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান। তাঁর ' নয়নচারা' গল্পের আমু, 'সেই পৃথিবী'-র সাদেক তাদের সজ্ঞান সত্তায় সুপার ইগোকে বহন করে। সেই একই বোধ, দ্বৈত সত্তা 'রক্ত'-এর আক্কাস, 'জাহাজী'-র করিম সারেঙ, 'খুনী'-র রাজ্জাকেরও বাস্তব পরিচয়। করিম সারেঙ ('জাহাজী') জীবনের গোধূলি বেলায়

অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও অতৃপ্ত, স্মৃতিবিধুর, বর্তমানের বাস্তবতায় বিষণ্ন। রাজ্জাক ('খুনী') আবেদ দর্জি কর্তৃক পুনর্বাসিত হয়েও অতৃপ্ত। তার আত্ম-উপলব্ধির জগতে বার-বার ছায়া ফেলে তারই কৃত খুনের সেই অবিনাশী স্মৃতি। কোনো আশ্রয়ই তাই তাকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করতে পারেনি। প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে সে বোধ করেছে গভীর আত্মপীড়ন, পৌনঃপুনিক আত্মশ্লাঘা :

> দর্জি আর তার বিবি তাকে ভালোবাসে, কিন্তু সে-ভালোবাসা তার অন্তর স্পর্শ করেনি, যদিও স্তব্ধ-স্থবির মন সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহভাবে সজ্ঞান। কিন্তু আজ ওপারে বালুর চরে ধুলো উড়তে দেখে হঠাৎ চর আলেকজান্দ্রার কথা মনে হলো, এবং সে আকস্মিকভাবে অনুভব করলো যে, দূরে কোথাও স্নেহমমতার জোয়ার বইছে, কিন্তু এখানে কেবল কালো মাটি, যে-কালো মাটির বুকে বাস করছে এক নকল রাজ্জাক এবং বাস করছে নিঃসঙ্গ হয়ে, আর তার মন আবদ্ধ হয়ে আছে অর্থহীন স্থবিরতায়।[৭৬]

'রক্ত'-র আবদুলও একই চেতনায় বিদ্ধ ও যন্ত্রণাহত। আক্কাসের পরিচর্চা ও তার বিবির শুশ্রূষা লাভ করেও তার বিরাণ হৃদয়ে শস্যের শ্যামল ছায়াপাত ঘটেনি বরং এই অন্তরঙ্গ পরিচর্যা তার অন্তর-লালিত মরুপ্রদেশকে আরো বিস্তৃত ও বহুদূর প্রসারিত করেছে। আক্কাসের উঠোনে ও তার বিবির সান্নিধ্যে থেকেও আবদুল হয়ে পড়েছে নিঃসঙ্গ:

> আবদুল চোখ বুজলে। কিন্তু কোথায় স্নেহের উৎস? শ্রান্তপায়ে মস্তিষ্কের অলিগলিতে মন হাঁটছে খুঁজতে-খুঁজতে, কোথাও দেখলে, নদী রয়েছে বটে তবে নিষ্করুণ শুষ্কতায় ধুধু করছে দিগন্তব্যাপী, কোথাও-বা অনাত্মীয় নিঃসঙ্গতা তীররেখাশূন্য নীল সাগরের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আবার কেউ কোথাও মাকে ডাকলে, কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ওপারে ঘন অন্ধকার নেবেছে, আর এধারে খেয়াঘাটে লোকও নেই নৌকাও নেই।[৭৭]

'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পটিকে পূর্বোক্ত কোনো বিন্যাসেই ফেলা যায় না এবং তা বস্তি জীবনের ক্লিন্নতা, মালিন্য, অসংগতি ও বিকৃতির চিত্ররূপেই গ্রহণীয়। তবে 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)-র 'আলোর বৃত্তে' নয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবিন্যাস-শৃঙ্খলে সুরক্ষিত ও দীপিত। সমরেশ বসু যেখানে উদ্বাস্তু বস্তিবাসী কেদার ও টগরের জীবিকার সংকট রূপায়ণে যত্নবান তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টি বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তাঁর সমাজের বিস্তৃত ভূমিতে প্রসারিত। ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে নগরের উপান্তে পল্লবিত জীবনের এক বাস্তব চিত্র যা শেখ জব্বারের হয়েও নির্বিশেষ বস্তি মালিকের, সেই সব স্ত্রীর যারা নিরুপায় হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে বহু-বিবাহের নিষ্ঠুর গিলোটিনে।

শেখ জব্বার তার চতুর্থ স্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মহল্লার প্রত্যেককে বিরানি খাইয়েছে। আবার নিজের আনন্দ-অগ্নির উত্তাপ সকলের মধ্যে সংক্রামিত করতেও সে হয়েছে সচেষ্ট। তার মহলের বাইরে গ্রামাফোনে বাইজি নাচের গান হচ্ছে ; আর

জব্বারের ঘোড়াগুলিকে ঘাস-ভুসি খাওয়ানো ছেলেটি ঘাঘরা, ওড়না ও ঘুঙুর পরে নাচছে। অন্যদিকে জব্বারের অন্দরে তার প্রাক্তন তিন স্ত্রী তাদের অবস্থান পরখ করছে নতুন বিবির সঙ্গে। মেয়েদের শক্তি পরীক্ষার এ পরিবেশ স্থূল, লঘু, হাতাহাতি ও চুলোচুলিতে সংঘাতময়, উচ্চকণ্ঠ বাক্যালাপে মুখর হলেও বাস্তব, সমাজ–সত্যেরই স্মারক।

বস্তুত, বিষয়বস্তু-নির্বাচন, দৃষ্টিকোণের সুষম ব্যবহার, প্রেক্ষণবিন্দুর অনিবার্য প্রয়োগ, চরিত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গুরুত্বদান, এবং ব্যক্তিকে তার চেতন ও অবেচতন সত্তা, মৌল এষণাসহ উপস্থাপন, ভাষা-শৈলী সৃষ্টিতে চিত্রকলার প্রকরণ প্রয়োগ ও আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার গুণে *নয়নচারা* পর্যায়ের গল্পগুলি পূর্ববর্তী গল্পসমূহের তুলনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বহুপ্রসারিত মনোবিশ্ব ও তাঁর প্রাগ্রসর মেধার মতোই শিল্পসমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময়, অর্থবহ ও শিল্পশীলিত।

দুইতীর ও অন্যান্য গল্প

নয়নচারা (১৯৪৫) প্রকাশের বিশ বছর পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে রচিত। এ গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুচ্ছ হলো : 'দুইতীর', 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', 'পাগড়ি', 'কেরায়া', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', 'গ্রীষ্মের ছুটি', 'মালেকা', 'স্তন', ও 'মতিউদ্দিনের প্রেম।'

নয়নচারা পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিবিধ দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে ব্যক্তিকে তার পূর্বাবস্থান ও বর্তমান জীবনের দ্বন্দ্বময় পটভূমিতে স্থাপন করে নির্মাণ করেছেন। *দুইতীর* পর্যায়ের গল্পগুলির অন্তর্বয়ন, পরিচর্যা, সংগঠনেও তিনি সতর্ক যত্নশীল ও পরীক্ষাপ্রবণ। এ পর্যায়ের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ চরিত্রই বিবিধ বিচ্ছিন্নতা-চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ায় গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য, স্বতন্ত্র রীতি ও কৌশল।

নগরকেন্দ্রিক ধনবাদী সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে মানুষের জীবনানুভূতি ও জীবন বাস্তবতায় মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি-চেতনা, শ্রেণী-অবস্থানগত কারণে মানুষ তার উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা কখনো আত্মগতভাবে, কখনো আবার তা পরিবার, আপনজন থেকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সমাজ–সংকট তার এই বিছিন্নতা–বোধ ও নৈঃসঙ্গ্য চেতনাকে করেছে আরো তীব্র, সূচিমুখ। এ কালের মানুষমাত্রই যন্ত্রণাবিদ্ধ, অসহায়, অপরাধমনা, ভাবাবেগে কম-বেশি আবিষ্ট এবং অপার নাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত।[৭৮] এ পর্যায়ে আলোচিত প্রথম গল্প 'দুইতীর'-এ এই বিচ্ছিন্ন-চেতনাই শব্দরূপ পেয়েছে আফসারউদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য-জীবনের মাধ্যমে।

আফসারউদ্দিন ও হাসিনা একই বাড়িতে, অভিন্ন শয্যায় পাশাপাশি অবস্থান করে। কিন্তু তারা পরস্পর অনাত্মীয়, নিত্য নিঃসঙ্গ। আফসারউদ্দিন স্ত্রীর প্রেমে ও ভালোবাসায় শিকড়ায়িত হয়েই বাঁচতে চান। কিন্তু হাসিনাই এ-ক্ষেত্রে প্রবল বাধা। আফসারউদ্দিনের মতে তাদের দাম্পত্য জীবন নিষ্ফল, তার আকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ হওয়ার কারণ মুখ্যত ত্রিবিধ: [এক] তার সঙ্গে হাসিনার বিয়েতে আফসারউদ্দিননের শ্বশুর আরশাদ আলীর মত থাকলেও হাসিনার মা মরিয়ম খানমের ছিল আপত্তি। [দুই] আফসারউদ্দিনের দারিদ্র্যজর্জরিত অতিসাধারণ পারিবারিক পটভূমি' যাতে 'হাসিনার আভিজাত্য–সচেতন মন গলে নাই'। [তিন] আরশাদ আলী-মরিয়ম খানমের 'অসুখী দাম্পত্যজীবন' যা তাদের কন্যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে হয়েছে সঞ্চারিত। তীক্ষ্ণধী, সচেতন ও সংবেদনশীল আফসারউদ্দিন হাসিনাকে পুনর্জাত করারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একজন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ মানুষ feels unable to control his own destiny or to have any significant effects on the important events of the world through his actions.[৭৯] আফসারউদ্দিনও তাই বাস্তবতাকে এই বলে মেনে নিয়েছেন যে, 'জীবনের ধারা পরিবর্তন করা যায় না।' বস্তুত, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত করলেই বিয়ের মাধ্যমে দুটি জীবন অভিন্ন বিন্দুতে মিলিত হতে পারে না—তাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত সাধর্ম্য ও সাদৃশ্য থাকার প্রয়োজন হয়। অন্যথায় মিলন পরিণত হয় শৃঙ্খলে, পাশাপাশি বাস করেও দুটি জীবন রূপান্তরিত হয় দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। আফসারউদ্দিনের বিচ্ছিন্নতা-বোধ আকস্মিক নয়, অভিজ্ঞতায় তা স্তরীভূত। জীবনের একটি পর্যায়ে পৌঁছেই তাঁর এ উপলব্ধি হয়েছে সুতীব্র। ফলে 'দুইতীর'-এর কাহিনীগ্রন্থন প্রচলিত নয়, বৈচিত্র্যধর্মী। আফসারউদ্দিন-হাসিনার মূলকাহিনীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে আরশাদ আলী-মরিয়ম খানমের উপকাহিনী। অতঃপর একটি পর্যায়ে এসে, আফসারউদ্দিনের 'টুওরে' যাওয়ার পর থেকেই দুই কাহিনী মিশে হয়েছে অভিন্ন ও লক্ষ্যাভিমুখি। জীবনের মধ্যপর্যায়ে এসেই যেহেতু বিছিন্নতা-বোধের প্রাবল্য তাই 'দুইতীর' গল্পে কালগত ব্যবহার বিষম, ভগ্নক্রমিক এবং কখনো বর্তমান ও অতীত পাশাপাশি অগ্রসর, কখনো বর্তমান কালের সঙ্গে সহ-অবস্থান করেছে ভবিষ্যৎ কাল আবার কখনো অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে ব্যক্তিহৃদয়ে বর্তমান। যেমন, গল্পের সূচনায় বর্তমানকাল স্থির আর আফসারউদ্দিননের চেতনায়, তাঁর স্বীকারোক্তিতে অতীত ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে উপস্থিত।

> প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে বসলে পায়ের সামনে আবদুল ঝুঁকে পড়ে তার জুতা-মোজা খোলে। ভৃত্যের এ-সেবায় আফসারউদ্দিন যে আনন্দ বোধ করে, তা নয়। বরঞ্চ জুতা বাড়াতে গিয়ে প্রতিদিন কেমন জড়তা বোধ করে, তার পা-দুটি পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে। সে আশা করেছিলো নিত্যকার এ-সাহেবিয়ানা অনুষ্ঠানে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো হয় নাই। ভাবে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটবে। তা-ও হয়ে ওঠেনা।[৮০]

অন্যত্র আরশাদ আলী-মরিয়ম খানমের উপাখ্যান বর্ণনায় সাধারণ অতীত কালের ব্যবহারেই গল্পকার অধিকতর স্বচ্ছন্দ :

> আরশাদ আলী সাহেবের কখনো আর্থিক দৈন্য না থাকলেও জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি সুখী হতে পারেন নাই। ... তাঁর স্ত্রী মরিয়ম খানম নিজেরই খালাত বোন; ... তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেই হোক বা মরিয়ম খানমের মেজাজ অতিশয় রুক্ষ ধরনের বলেই হোক, তাদের মধ্যে কখনো বনিবনা হয় নাই। তাঁদের একমাত্র ছেলেটির মৃত্যু ঘটলে মরিয়ম সাহেবা আলাদা হয়ে গিয়ে তার বাপের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন।[৮১]

প্রত্যাশা-ব্যাকুল আফসারউদ্দিনের চেতনাস্বরূপ উন্মোচনে তিন কালই-একই সঙ্গে উপস্থিত :

> মনে হয় হাসিনা নেবেই আসবে। তার পাশে কালো বোরখায় আবৃতা মরিয়ম খানমের চোখে ভীতি জেগেছে, তাঁর নিশ্চয়তার ভাব খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসিনার চোখ তাঁর দিকে নেই। সে নেবেই আসবে। আফসারউদ্দিনের বুকের স্পন্দন আরো দ্রুত হয়ে ওঠে। হাসিনা নেবে এসে তার সামনে দাঁড়ালে সে কী করবে? যখন দেখবে হাসিনার সে-মুখ আর সে-মুখ নাই, সে-চোখ আর সে-চোখ নাই, তখন তাকে সে কী বলবে?[৮২]

'দুইতীর'-এর আভ্যন্তর পরিচর্যা দৃশ্যবদ্ধ, ইমপ্রেশনিস্টিক চিত্রের মতো রঙের ব্যবহারে বর্ণিল, ইন্দ্রিয়ানুভূতিময় :

১ বাইরে সান্ধ্য হাওয়া জেগেছে। পেছনের বারান্দায় দড়িতে ধূসর রঙের মোজাজোড়া সে–হাওয়ায় দোলে। গোসলের পর হাওয়াটি অতিস্নিগ্ধ মধুর মনে হয়। নিমীলিত চোখে ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আফসারউদ্দিন ভাবে।[৮৩]

২ হাসিনার পরনে উজ্জ্বল লাল শাড়ি। মরিয়ম খানমের দেহ কালো বোরখায় আবৃত। কেবল তার মুখটি উন্মুক্ত। সে-মুখ দিনের আলোয় রক্তহীন, ফ্যাকাশে এবং ভাবনাশূন্য দেখায়। আড়চোখে আফসারউদ্দিন একবার হাসিনার দিকে তাকায়। তার মুখের পার্শ্বদিকটাই কেবল নজরে পড়ে।[৮৪]

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় পর্যায়ের গল্পসমূহের প্রারম্ভিক গল্প 'দুইতীর' কাহিনী ও আঙ্গিক উভয়তর বিবেচনাতেই স্বতন্ত্র ও গুরুত্ববহ।

'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-তেও ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা-বোধ স্পষ্ট।' কিন্তু তা 'দুইতীর'-এর আফসারউদ্দিনের মতো ব্যক্তিগত পরিসীমায় আবর্তিত নয়। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-র বিচ্ছিন্নতার পটভূমি বিস্তৃত, দেশ-কাল ও সমকালীন রাজনীতির স্রোতধারা-বাহিত হয়েই তা ব্যক্তিকে স্পর্শ করেছে ও তাঁর অন্তরে হয়েছে কেন্দ্রীভূত।

'দেশভঙ্গের হুজুগে কর্মস্থল ও পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করে পূর্ববাংলার এক শহরে এসেছে মতিন, বদরুদ্দিন, এনায়েত, ইউনুস, মোদাব্বের ও মকসুদ। তারা এ শহরে বহিরাগত ও নিরাশ্রয়। কিন্তু অচিরেই একটি পরিত্যক্ত 'হিন্দুবাড়ি' দখলের মাধ্যমে

তারা অর্জন করেছে নিজেদের নির্দিষ্ট ঠিকানা। অতীতের সংকীর্ণ পল্লির দুর্গন্ধযুক্ত ও নোঙরা পরিবেশের তুলনায় 'বড়ো-বড়ো কামরা, নীলকুঠির দালানের ফ্যাশানের মস্ত-মস্ত জানালা' খোলা-মেলা উঠোনের বর্তমান বাড়িটি রাজসিক, মুক্ত-বাতাস ও পর্যাপ্ত পরিসরে স্বাস্থ্যময়। দখলকারীরা তাই তৃপ্ত ও স্বপ্নাতুর। কিন্তু অচিরেই তাদের মধ্যে এক বিষণ্নতা বোধ, সচেতনতা জাগ্রত হয়। একদিন সকালে বাড়িটির রান্নাঘরসংলগ্ন উঁচু জায়গায় আবিষ্কৃত হয় একটি বিবর্ণ, শীর্ণ–প্রায় তুলসীগাছ আর সেই অনুষঙ্গে তাদের হৃদয়ে জেগেছে গৃহকর্ত্রীর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, এক অনুচ্চারিত সহমর্মিতা বোধ। তারা ভেবেছে, সময়ের ক্রমধারায় বাড়িতে কখনো দুর্দিনের ঝড় বয়েছে, কখনো বিরাজ করেছে উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু একদিনের জন্যও তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া বন্ধ হয়নি। কিন্তু দেশভাগের ফলে সেই ধারা হয়েছে ছিন্ন। গৃহকর্ত্রী হয়তো এখন আসানসোল, বৌদ্যহাটি, নিলুয়া কিংবা হাওড়ার কোনো আত্মীয় বাড়িতে দুর্ভোগ ও অনাদরে কাল কাটাচ্ছেন। 'তুলসী গাছ হিন্দুয়ানি'-র চিহ্ন বলে মোদাব্বের তা উৎপাটিত করতে চেয়েছে। অন্যান্যেরও তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে তাদেরই কেউ তুলসীগাছে জলসিঞ্চন ও মঞ্চের আবর্জনা পরিষ্কার করেছে। ফলে শুষ্ক, পীতবর্ণ গাছটি ভরে উঠেছে সবুজের সমারোহে। শেষপর্যন্ত বাড়িটিতে বাসের অধিকার তারা পায়নি। সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করেছেন। তারা গৃহকর্ত্রীর মতোই হয়েছে উন্মূলিত। বস্তুত, পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রিত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন বলেই ভীত, একদা আশ্রয় পেয়েও বিতাড়িত। সাম্প্রদায়িক সংকট, দুই বাংলার মানুষদের বাস্তুভিটা ত্যাগের কারণেই তাদের এই বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর পরস্পরকে অনাত্মীয় ও শত্রুজ্ঞান।

'একটি তুলসীগাছে কাহিনী'-তে তুলসীগাছটিই গল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। ফলে কোনো একক চরিত্র এখানে বিকশিত হয়নি। স্রষ্টার মানস-প্রবণতাও সে-দিকে নিবদ্ধ ছিল না। মেস বাড়িতে বাস-করা স্বল্প বেতনের বিভিন্ন চরিত্র তাদের ভীতিবোধ, অসহায়ত্ব-চেতনা ও মুদ্রাদোষসহই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তির অন্তর্সংবেদনার পরিচয় তাই 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-তে নেই। এখানে তার বহির্মুখি সত্তাই রূপায়িত হয়েছে। 'বাড়ি দখলের ব্যাপারটা তদারক করবার জন্যে পুলিশ' এলে তারা সবাই 'রুখে দাঁড়ায়' ও বলে: 'আমরা দরিদ্র কেরানি মানুষ বটে কিন্তু সবাই ভদ্রঘরের ছেলে। বাড়ি দখল করেছি বটে কিন্তু জানালা-দরজা ভাঙি নাই, ইট-পাথর খসিয়ে চোরাবাজারেও চালান করে দিই নাই।'[৮৫] কিন্তু পুলিশ চলে গেলেই কাদের বলেছে: 'সাব-ইন্সপেক্টরের দ্বিতীয় বউ আমার এক রকম আত্মীয়া।[৮৬] মোদাব্বের 'হুজুগে মানুষ' তাই হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করা তার স্বভাব। হাবিবুল্লাহ্ সংগীতরসিক বলে প্রায়ই বেসুরো গান গায়। মতিন রেলওয়ে ক্লার্ক। তাই তার চোখের সামনে 'রেলপট্টির ছবি ভাসে'। এনায়েত 'মৌলবী' হওয়ায় তার অবসর কাটে ধর্মানুশীলনে। মকসুদ একদা বামপন্থী আদর্শের দিকে ঝুঁকে ছিল। ফলে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেলেই সে হয় প্রতিবাদী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগাল্পিক সত্তা মূল্যায়নে একটি 'তুলসীগাছের কাহিনী' সবিশেষ সমালোচক-আনুকূল্য ও অনুসন্ধিৎসা লাভ করেছে। আবু জাফর শামসুদ্দীন রচনাটিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'প্রথম সার্থক ছোটগল্প'[৮৭] বলেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ (জন্ম ১৯৪৩) মোতাহের হোসেন চৌধুরী[৮৮] (১৯০৩-১৯৫৬)-র মতো বৃক্ষকেই জীবনের প্রতীকজ্ঞানে স্থিতধী হয়ে মন্তব্য করেছেন :

> সব ক্লিন্ন রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতির উপরে যে-মানুষ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা—এই গল্পে আছে তার ভাস্বর চিত্রণ। ...'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' আসলে বৃক্ষের কাহিনী নয়—মানুষের কাহিনী।[৮৯]

আর তানভীর মোকাম্মেল গল্পটির মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্যন্তিক 'সমাজচেতনা' আবিষ্কার করে লিখেছেন :

> দেশভাগের ট্রাজেডীর ঋত্বিকীয় যন্ত্রণাময় আর্তি ছাড়াও আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য "একটি তুলসীগাছের কাহিনী" গল্পটিতে মূর্ত, তা হচ্ছে স্বল্পবেতনভূক পেটিবুর্জোয়া কেরানীকুলের চরিত্রচিত্রণে ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রশংনীয় দক্ষতা, যাদের মধ্যে সবচে "বামপন্থী"–টির কাঁটাও সংশয়ে দুলে দুলে অবশেষে ডান দিকেই হেলে পড়ে।[৯০]

আবু জাফর শামসুদ্দীন কোনো রকম তুলনামূলক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, এমন কি 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-র গভীরে প্রবেশের ক্লেশ স্বীকার করতেও তিনি কুণ্ঠিত। তাঁর মন্তব্য তাই ব্যক্তিগত আবেগসম্ভূত ও চকিত। আর প্রতীকবাদী মাসিকতাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিলে সাহিত্য-বিবেচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-র প্রতীকার্থকে আমরাও মানি। কিন্তু প্রতীকের সংজ্ঞার্থ, উৎস ও বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, কখনো কখনো তা কালস্পর্শী ও কালান্তরের ইংগিতও বহন করে। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রতীকান্বেষণ তাই সমগ্রতাসন্ধানী নয়, সীমাবদ্ধ অর্থেই তা কেবল সত্য। একই কারণে তানভীর মোকাম্মেলের বিবেচনাকেও আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্তর্লোকের অনির্বচনীয় ভাষ্য; 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'-কে এর স্রষ্টার মানস-প্রেরণার পরম ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, বামপন্থী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও সাহিত্য-রচনা করতে গিয়ে তিনি কখনোই শ্রেণীসংগ্রামের ব্যবস্থাপত্র দান করতে চাননি কিংবা শ্রেণীসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে দক্ষিণপন্থীদের জয়যুক্ত করাও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। সমাজ ও সমকালসংলগ্ন মানুষের অন্তর্গত অস্তিত্ব-স্বরূপ উন্মোচনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মার্কস অপেক্ষা লরেন্সের সাহিত্যাদর্শের প্রতিই ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সবিশেষ অনুরাগ। বস্তুত, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও তানভীর মোকাম্মেলের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সুসমন্বয় সাধন করলেই 'একটি তুলীগাছের কাহিনী'র প্রতীকার্থ সঠিকভাবে আবিষ্কার ও অনুধাবন সম্ভব হয়। এ গল্পে প্রতীকের প্রয়োগ ঘটেছে দুটি বিষয়, তুলসীগাছ ও পুরোনো আমলের দোতলা বাড়িটিকে আশ্রয় করে। শীর্ণ তুলসীগাছটি দেশ-বিভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত, বিশীর্ণ ব্যক্তিদের অস্তিত্বেরই প্রতীক। আর পুরোনো বাড়িটি দ্বিজাতি তত্ত্ব-নির্ভর এ দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতাকেই করেছে প্রতীকায়িত। আশ্রয়হারা, উন্মূল মানুষগুলি যে

গৃহের আশ্রয়কে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তা তাদের নির্ভরতা দিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তারা হয়েছে আশ্রয়হারা। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে পূর্ববাংলার অধিবাসীরাও তাঁদের স্বদেশ ও স্বাদেশিক অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখেছেন যে, তাঁরা মূলত বাস্তুচ্যুত, নিজদেশে পরবাসী। এ পরিচয় ত্যাগ করে তাই কালান্তরে নতুনভাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় তাদের সংগ্রামী হতে হয়েছে। ফলকথা, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' এ দেশীয় সমাজের এককালীন সংকট, দেশবিভাগপীড়িত ও প্রহৃত ব্যক্তিদের অস্তিত্ব-অন্বেষার রূপকল্প, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অসাম্প্রদায়িক ও মানবপ্রেমী চৈতন্য, তাঁর সমকালকে স্পর্শ করে কালান্তরে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টারই আলেখ্য, রূপবর্ণিমা।

কিছুটা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ও কার্যকারণসৃষ্ট হলেও 'দুইতীর'-এর আফসারউদ্দিনের মতোই 'পাগড়ি' প্রৌঢ় খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের নিঃসঙ্গতাবোধ, তাঁরই জীবনকে 'পদে-পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ'-আকাঙ্ক্ষার রূপকল্প। মফস্বল শহরের উকিল হলেও মোত্তালেব সাহেব আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত, পেশাগত সাফল্যে গর্বিত। কিন্তু জীবনের মধ্যপর্বে পৌঁছে তাঁর মধ্যে জেগেছে গভীর অতৃপ্তিবোধ। কারণ স্ত্রীর মনঃরোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি। পঞ্চম সন্তানের জন্মের পরই মোত্তালেব সাহেবের স্ত্রীর মানসিক ভারসাম্য হয়েছে বিনষ্ট। আর সেই থেকে তিনি অন্তরে অসুখী। এতো কাল এ অবস্থা সহ্য হলেও এখন তিনি আর তা পারছেন না। জীবনকে উপভোগের ইচ্ছা এ মধ্যপর্বে তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়েছে। মোত্তালেব সাহেব স্থির করেছেন দ্বিতীয় বিয়ে করার। দ্বিধার সঙ্গে হলেও সন্তানদের কাছে তিনি তাঁর এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাঝ-বয়সী পিতার এ সিদ্ধান্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম দিলেও বাহ্যিক সংযম তারা হারায়নি। অতঃপর নজু মিঞার মাধ্যমে চলেছে বিয়ের আয়োজন। এ উপলক্ষে মোত্তালেব সাহেব নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়েছেন, বজ্‌রা ভাড়া করেছেন, নববধূর জন্য শাড়ি-গহনা কিনেছেন। কিন্তু ক্রয় করতে পারেননি নতুন পাগড়ি। কেননা তা তাঁর বিবেচনায় 'আড়ম্বরের চুম্বকশীর্ষ' প্রকাশ, ' নওজোয়ানের উদগ্র নিশানা' এবং প্রৌঢ় ব্যক্তির বিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে, অনাড়ম্বরে হওয়াই শ্রেয়। তাই সবার অজান্তেই মোত্তালেব সাহেবের বিয়ে নিষ্পন্ন হয়। অতঃপর নববধূসহ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তার পোশাক, শরীর ভিজে যায়। অথচ মোত্তালেব সাহেবের প্রথম বিয়ের 'মাসহাদি পাগড়িতে এতটুকু জলের স্পর্শ লাগেনি এবং যেমনি গিয়েছিল তেমনি সেটি হাতবাক্‌শে লুকিয়ে ফিরেছে।'

'পাগড়ি' গল্পের আরম্ভ মোত্তালেব সাহেবের জীবনের মধ্যপর্ব অর্থাৎ, স্ত্রী-সম্পর্কিত তাঁর অতৃপ্তিবোধের সূচনা থেকে। ফলে মোত্তালেব সাহেবের পূর্বজীবন এসেছে অতীত প্রক্ষেপণ রীতিতে। মোত্তালেব সাহেবের দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে যাত্রা করার সঙ্গেই বর্তমানের সাথে অতীতকে সমীকৃত করার কৌশল পরিত্যক্ত হয়ে কাহিনী হয়েছে একমুখি, শীর্ষমুহূর্ত, ক্লাইম্যাক্‌সের দিকে ধাবমান।

'পাগড়ি' গল্পের চরিত্রগুলি বিশেষত, মোত্তালেব সাহেব ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে একটি অন্তর্মুখি বেদনা, ' মনে না-নিলেও মেনে নেয়া'-র একটি নিরুপায় যন্ত্রণা বর্তমান থাকায় তাদের উপস্থিতি প্রায় নিঃশব্দ, ভীরু ও কম্পিত পদে। ফজু মিঞা কেবল হাতব্যাগসহ মোত্তালেব সাহেবের টমটমে উঠে নিজের ঘটক-চরিত্র জানান দিয়েছে আর নববধূসহ মোত্তালেব সাহেব উপস্থিত হলে তাঁর মেয়েরা নীরবে তাদের নতুন মাকে সালাম করেছে। মোত্তালেব সাহেবের ছেলেদের বাইরে থেকে প্রতিক্রিয়াশূন্য মনে হলেও তারা ছিল বেদনাময়, পিতৃ-আচরণে বিক্ষুব্ধ। পূর্বাপর প্রায় নির্বাক থেকে এবং নিজেদের মাথা চুলকিয়েই তারা জনকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছে তাদের অন্তরের ঘৃণা।

বস্তুত, 'পাগড়ি' গল্প মোত্তালেব সাহেবের অবচেতন-আকাঙ্ক্ষা; তাঁরই আসঙ্গ-লিপ্সু সত্তার আলেখ্য, পুরুষ–শাসিত সমাজের উপভৌগিক মানসিকতা ও বহুবিবাহ-প্রথার এক বাস্তবানুগ চিত্র। সামন্ত চেতনা-নির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় প্রৌঢ় ও প্রায়-বৃদ্ধ ব্যক্তির অবচেতন মনের অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থের বাসনা, আর সেই লিবিডো-চেতনাকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ফ্রয়েড-ইয়ং-লরেন্সের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই এ গল্পে রূপায়িত করেছেন।

গল্পের নাম 'কেরায়া'[৯১] হলেও তা মাঝিদের কেরায়াবঞ্চিত যাত্রার কাহিনী; তাদের ব্যর্থপ্রত্যাশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার এক পিঙ্গল আখ্যান। গত পরশু থেকে দু-জন মাঝি এবং তাদের 'ফাই-ফরমাশ' খাটা একটি এতিম ছেলে গুড়ের কেরায়ার জন্য অপেক্ষা করছে। মহাজন তাদের সে-মতোই আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করেও তার দেখা নেই। মাঝিরা তাই ঠিক করেছে শূন্য নৌকাসহই ফিরে যেতে। অকস্মাৎ এক মুমূর্ষু বৃদ্ধ নৌকার পাটাতনে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার একটিই প্রার্থনা: মাঝিরা যেন তাকে নিয়ে যায় ; কেননা 'পাক-পাগাড়ে' কিংবা ' বিদেশ বিভূঁই'-এ সে মরতে চায় না। নিজের গ্রামে, আপনজনদের মধ্যেই সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে চায়। এমন একজন মানুষকে কিছু বলা যায় না, ভাড়া দাবি করাও নিরর্থক। আর কেরায়া চাইলেও তা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। বৃদ্ধকে তাড়িয়ে না-দিলেও মাঝিরা তাই ছিল তার প্রতি উদাসীন, বীত-উৎসাহ। এমনকি বুড়োর গোঙানি, মরণযন্ত্রণাও তাদের স্পর্শ, আকৃষ্ট করেনি। ক্রমে তারা বৃদ্ধের নদীতীরবর্তী গ্রামে পৌঁছেছে এবং তার প্রাণহীন দেহ গ্রামবাসী ও তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু মাঝিদের দিকে কেউ খেয়াল করেনি। রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে তারা যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি আবার সবার অজান্তেই যাত্রা করেছে তাদের গৃহের উদ্দেশে।

কেরায়া নৌকার মাঝিদের জীবন পেশাগত কারণেই বিচ্ছিন্নতায় ভরা। নিঃসঙ্গ নদী ও তীরবর্তী নিসর্গকে তারা যে-পরিমাণে জানে সমভূমির মানুষদের সঙ্গে তাদের পরিচয় ততো ঘনিষ্ঠ হয় না। মাঝিদের জীবনে স্বচ্ছলতাও অনুপস্থিত। দারিদ্র ও প্রত্যাশা-ভঙ্গের বেদনাই তাদের বাস্তব পরিচয়। গল্পকার তাই নিঃসঙ্গ রাত্রি, পৌনঃপুনিক অন্ধকারকে আবহ হিসেবে গ্রহণ করেই তাঁর উদ্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তমিস্রাময় ও জনবিরল পরিবেশের মধ্যে দিয়েই গল্পের ঘটনাস্রোত অগ্রসর

হয়েছে। রাত্রিশেষে একটি দিনের উপস্থিতি ঘটলেও তা রাতেরই সমতুল্য। কেননা মাঝিরা তখন জনবসতি থেকে দূরে, নদীতে ভাসমান নৌকায় বন্দি। তারপর মৃতদেহটি বহন করে যখন তারা কূলে, লোকালয়ে উপস্থিত হয়েছে তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

বস্তুত, অন্তর্লোকে, নিজের অবিভাজ্য সত্তায় প্রতিটি মানুষই বিচ্ছিন্ন, পরমভাবে একা। তৎসত্ত্বেও জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলেছে। 'কেরায়া' গল্পে মাঝিদের জীবন বাস্তবতার মাধ্যমে এবং অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ পরিবেশকে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে গ্রহণ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানব-মনের এই শাশ্বত উপলব্ধিকেই শিল্পরূপ দান করেছেন।

'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' একটি অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের গল্প। জীবনের গোধূলিপর্যায়ে পৌঁছে বৃদ্ধ সদরউদ্দিনের মধ্যে এক অদ্ভুত মনোবৈকল্যের জন্ম হয়েছে। তার মনে হয়েছে, মৃত্যু সমাসন্ন অথচ মানুষের কাছে তার মাফ চাওয়ার এখনো বাকি। আর এই ' অন্তিম খেয়াল পূর্ণ করতে' সদরউদ্দিন পথে নেমেছে। পঙ্গু শরীর নিয়েও সে পরিচিত প্রত্যেকের কাছে গিয়েছে ও মাফ চেয়েছে। কিন্তু আখলাক তরফদারের বাড়ির সামনে উপনীত হলেই তার আত্ম-অনুশোচনার অনুতাপ হয়েছে আরো গভীর ও মর্মন্তুদ। সদরউদ্দিন জীবনে এই একটি লোককেই সবচেয়ে কষ্ট, সর্বাধিক বেদনা দিয়েছে। তারই কূট অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে আখলাকের জীবন হয়েছে বিপৎসঙ্কুল, দুঃখময় ও দারিদ্রকীর্ণ। আখলাক তরফদারের কাছে মাফ চাওয়া তাই তার আবশ্যিক দায়িত্ব। কিন্তু সদরউদ্দিনের মন দ্বিধাপন্ন। কেননা চিরশত্রুকে এতোদিন পর নিজের বাড়িতে দেখে আখলাক কী আচরণ করবে সদরউদ্দিন তা জানে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, সদরউদ্দিনকে কাছে পেয়ে আখলাক রইল নিরুত্তর, আর তার চোখ হয়ে উঠল অশ্রুময় যা দেখে সদরউদ্দিন বুঝল যে, আখলাক তাকে ক্ষমা করেছে। অতঃপর পরম নির্ভাবনায়, প্রশান্ত চিত্তে সদরউদ্দিন বাড়ি ফেরে। মৃত্যুতে তার আর কোনো ভয় কিংবা আপত্তি নেই।

নির্জ্ঞান সত্তা থেকে দায়িত্বময় জ্ঞানবান সত্তায় উপনীত হলেই মানুষ হয় অস্তিত্ববান, সারস্বত সত্তার অধিকারী।'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এই অস্তিত্ববাদী চেতনারই বহির্প্রকাশ ঘটেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেই সদরউদ্দিনের মধ্যে সূচিত হয়েছে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ। অতঃপর সে-অবচেতন মনের অপরাধময় অন্ধকার জগৎ থেকে উপস্থিত হয়েছে অস্তিত্বময় আলোর ভুবনে। জীবনের জরাকে তাই সে গ্রাহ্য করেনি, শরীরের অসহযোগিতা সত্ত্বেও বের হয়েছে সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করতে। স্বভাবতই গল্পের প্রচল ও প্রথাবদ্ধ সময় ধারণা 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'-য় অনুসৃত হয়নি। বর্তমানের সঙ্গে অতীত পরস্পরিত হয়ে, চেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয়েই এ গল্পের ঘটনাস্রোত হয়েছে অগ্রসর। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মাফ চাইতে গিয়েই সদরউদ্দিনের মনে পড়েছে বাল্যস্মৃতি, আখলাক তরফদারের সঙ্গে তার শত্রুতার প্রসঙ্গ। বৈরিতার এ কারণ নিতান্ত বালসুলভ মনে হলেও সদরউদ্দিনের

চেতনানুসারে তা একান্ত স্বাভাবিক, তার অস্বভাবী মনস্তত্ত্বে তা নিগূঢ়। তাই গল্পকার সচেতনভাবেই সদরউদ্দিনের জীবনার্থ নির্মাণে একটি বৈকল্যধর্মী মানসিকতা, অস্বভাবী মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রণে তাকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে সংলাপের সঙ্গে এসেছে সদরউদ্দিনের স্বীকারোক্তি, আত্মকথন, আলোর মধ্যে অবস্থান করেও সদরউদ্দিনের মনোজগতে বিরাজ করেছে অন্ধকার। বস্তুত, কাহিনী ও সংগঠন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের কোনো ভিন্ন প্রসঙ্গ নয়। আখ্যানভাগ ও অন্তর্সংগঠনকে অভিন্ন বিন্দুতে স্থাপন করে বক্তব্য উপস্থাপনই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য যার দৃঢ়রেখ ও সুমিত প্রয়োগ 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'-য়ও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

'গ্রীষ্মের ছুটি' সেলিনার অবকাশকালীন অভিজ্ঞতার কাহিনী। গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল সেলিনারা। কিন্তু তাদের আসার দু-দিন পরেই একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। দাদাসাহেবের প্রজা তারা মিঞা তার ছোট ভাই সোনা মিঞাকে মাত্র দু-আনার জন্য খুন করে। খবর পেয়ে দাদাসাহেব তারা মিঞার বাড়ি উপস্থিত হলে সেলিনাও তার সঙ্গী হয় এবং সেলিনাই লণ্ঠনের আলোয় ঐ দু-আনার মুদ্রাটি দেখতে পায়। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'পরদিনই সেলিনার ভীষণ জ্বর ওঠে।' তখন তারা মিঞার উঠোনে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা হয় : 'কেনো সেলিনা মৃত মানুষের বীভৎস দৃশ্যটি দেখে একটু শব্দ করে নাই, বা সে ক্ষুদ্র মুদ্রাটি দেখার পরই তীক্ষ্ণভাবে চিৎকার করে ওঠে।' দাদাসাহেবের আশ্রিত আম মৌলবীই 'এসব গবেষণা করে'। সাত-দিন পর জ্বর ছাড়লেও সেলিনার স্বভাব পরিবর্তিত হয়। সে গম্ভীর ও স্বল্পভাষী হয়ে ওঠে এবং একাকী বিচরণ করে অথবা নিঃসঙ্গ বসে থাকে।

অতঃপর এক অপরাহ্নে বাড়ির পেছনে 'জঙ্গলের মতো স্থানে' সেলিনা উপস্থিত হয় ও মনের আনন্দে ছুটতে থাকে। এক সময় জঙ্গল শেষ হলে ধু-ধু মাঠের সামনে সেলিনা দাঁড়ায়। মাঠের অনুষঙ্গে তখন তার মন হয় ঊর্ধ্বচারী, মুক্তপক্ষ। সতেরো জন অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের শ্রুত কাহিনী সেলিনার মনে পড়ে। মাছের মধ্যে সে অশ্বারোহীদের উপস্থিতিও অনুভব করে। অকস্মাৎ সেখানে হাজির হয় আমমৌলবী। কিন্তু তার উপস্থিতির চেয়ে আমমৌলবীর মুখে শোনা মাছ-কেন্দ্রিক ভৌতিক কাহিনীই সেলিনাকে আকৃষ্ট করে বেশি। সেলিনার আগ্রহে মৌলবীও উৎসাহ পায়। সে আরো ফেনিলাকারে অপ্রাকৃত গল্প বলে। ক্রমে সেলিনার বিশ্বাস জন্মে যে, অশ্বারোহীরা ভূত-প্রেতই ছিল। রাতে সেলিনার আবার জ্বর আসে। ফলে আমমৌলবীর কথামালাও বাড়ে। সে বলে: অশ্বারোহী বেশে দুরাত্মারাই সেলিনার উপর ভর করেছে। পূর্বের মতোই দাদাসাহেব ও আমমৌলবী সেলিনাকে ঝাড়ে, দোয়া-তাবিজ দেয়, জ্বরও এক সময় ছাড়ে।

অতঃপর ঘটে তৃতীয় ঘটনা। সেলিনা সেদিন উঠোনে গিয়ে দেখে আমমৌলবী তার ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছে। তাকে দেখে মৌলবীর খুশি বৃদ্ধি পায় ও নিমগাছের ডাল আনার জন্য সেলিনাকে গাছের কাছে নিয়ে যায়। মৌলবীই গাছে ওঠে ও ডাল ভাঙে। অকস্মাৎ একটি ডাল সেলিনার মাথায় পড়লে সে সামান্য আহত হয়। গাছ থেকে নেমে মৌলবী তখন 'একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সেলিনার

সামনে উবু হয়ে বসে তার গালের ক্ষত স্থানে মুখ দিয়ে সে চুষতে থাকে ক্ষত স্থানটি।' ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে বিমূঢ় হলেও পরক্ষণেই সেলিনা সম্বিত ফিরে পায়। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে। আমমৌলবী তখন দৌড় দেয়, লোকজন ছুটে আসে। সেলিনাকে বাড়ি আনা হয়। দাদাসাহেব সেলিনাকে জেরা করেন। কিন্তু সে কিছুই বলে না। মগরেবের নামাজের পর আমমৌলবী ঘরে ফেরে। দাদাসাহেবের কথায় সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, মাঠের ভূতপেত্নীই সেলিনাকে ভয় দেখিয়েছে। আগে এসেছিল ঘোড়সওয়ারের বেশে আর এবার এসেছে তার রূপ ধরে। অতঃপর দীর্ঘ আলোচনা শেষে ঠিক হয় যে, সেলিনার রূপের জন্যই তার বারবার বিপত্তি ঘটছে। তাই দোয়া-দরুদ পড়া শেষ হলে হাতিমের মার পরামর্শে সেলিনার মাথাভরা কালো রেশমের মতো চুল কর্তন করে তাকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয় যাতে কোনো দুরাত্মা তার উপর ভর করতে না পারে। ছুটিশেষে, সেলিনা আবার ফিরে যায় শহরে।

'গ্রীষ্মের ছুটি' সেলিনার কথকতা হলেও আমমৌলবীই এ গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্র নির্মাণ ক্ষমতার সার্থক উদাহরণ। তার পরিচয় দিতে গিয়ে গল্পকার বলেছেন :

> আম-মৌলবী দাদাসাহেবের আশ্রিত মানুষ। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সমগ্র কোরান তার জিহ্বাগ্রে থাকলেও সে অতি দরিদ্র মানুষ। দাদাসাহেবের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সে কোরান-হাদিস শেখায়, পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেয়, নানাপ্রকার ধর্মীয় ব্যাপারে সম্পাদনা–নেতৃত্ব করে। আমের প্রতি তার অত্যধিক লোভের জন্যে কবে কে তার নাম দিয়েছিল আম-মৌলবী ; সে-নামেই এখন সে পরিচিত।[৯২]

সে দেখতে কুৎসিত হলেও তার রজতশুভ্র দাঁত সেলিনার দৃষ্টি হরণ করে। আম-মৌলবীও সে সম্পর্কে সচেতন। সময় পেলেই সে দাঁত পরিষ্কার করে। সেলিনাকেও সে বলেছে : 'দাঁত মেছোয়াক করা সুন্নত। আর মেছোয়াকের জন্যে নিমের ডালের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই।' আবার নামের পূর্বে 'মৌলবী' অভিজ্ঞান যুক্ত হলেও সেই পরিমাণ বাক ও মানস-সংযম তার নেই। সে যেমন প্রগল্‌ভ, বাচাল ও অদূরদর্শী তেমনি খুব সহজেই 'লুঙিতে মালকোঁচা মেরে ধাঁ করে' গাছে উঠতে পারে। আমমৌলবী কৌতুকের উদ্রেক করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অদ্ভুত ক্ষমতা তার অধিগত। সেলিনার প্রথম জ্বর সম্পর্কে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সকলেই সহজে বিশ্বাস করেছে। সেলিনার দ্বিতীয় বার জ্বরের হেতু, অশ্বারোহী উপাখ্যান সম্পর্কিত তার বিশ্লেষণও কেউ অবিশ্বাস করতে পারেনি। এ-ক্ষেত্রে নিজের সাফল্য জাহির করতেও আমমৌলবী হয়েছে তৎপর। আবার দাদাসাহেবের রাখাল ছেলের কাছ থেকে শ্রুত আমমৌলবীর সেলিনা-কেন্দ্রিক আচরণ উপস্থাপিত হলে সে অভিযোগের চকিত অথচ মেধাবী জবাব দিয়ে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করেছে। ফলে এবারও সে হয়েছে সবার বিশ্বাসভাজন। আমমৌলবীর মেধার উৎকর্ষ ও বুদ্ধির প্রাখর্য তাকে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'গ্রীষ্মের ছুটি'-র শুরু একেবারে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে একটি হত্যা-সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে :

> সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সেলিনারা দাদাব বাড়িতে বেড়াতে আসার দু-দিন পরেই গ্রামে একটি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দাদাসাহেবেরই প্রজা তারা মিঞা তার ছোটভাই সোনা মিঞাকে কোচবিদ্ধ করে খুন করে। নির্মম ঘটনাটি তুচ্ছ একটি দু-আনা পয়সা নিয়ে ঘটে।[৯৩]

কিন্তু অচিরেই গল্পকার ঘটনান্তর এক গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক জগতে উপনীত হয়েছেন। কোচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু গ্রামীণ বাংলাদেশের সাধারণ ঘটনা হলেও শহরে লালিত সেলিনা তা কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। ফলে তা তার মনোগঠন ও মনস্তত্ত্বে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে আর এরই বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেছে জ্বরের মাধ্যমে। পরবর্তীতেও এ প্রতিক্রিয়া বর্তমান। পরিবেশকে অনাত্মীয় বলে মনে হলেই সেলিনা ভুগেছে 'ভীষণ জ্বরে'। এ অবস্থায় সাময়িকভাবে হলেও সে হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যাক্রান্ত।

জনৈক সমালোচক[৯৪] 'গ্রীষ্মের ছুটি'-কে মনোবিকলনধর্মী গল্প বলে উল্লেখ করেছেন। স্মরণীয়, ইংরেজি psychoanalytical-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'মনোবিকলন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অস্বভাবী মনস্তত্ত্বে মনোবিকলন-প্রসঙ্গ বিস্তৃত পরিসরে হয় আলোচিত। মনস্তত্ত্ব সাহিত্য নয়; তৎসত্ত্বেও এ দুইয়ের মধ্যে অনাত্মীয়তা অপেক্ষা নৈকট্যই সহজলক্ষ এবং এই মেল-বন্ধনের মূলে আছে মানব-চৈতন্যের স্বরূপ-অন্বেষা। ব্যক্তির সমাজ-আশ্রিত ও দেশকাল-সংলগ্ন সত্তা, তার অভীপ্সা চেতন ও অবচেতন মনের রূপান্বিত রূপকই হলো সাহিত্য আর তার বিচিত্রমুখ ব্যক্তিস্বরূপ ও জঙ্গম পুরুষকারের অনুপুঙ্খ অন্বীক্ষাই হচ্ছে মনস্তত্ত্ব। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'গ্রীষ্মের ছুটি' সাধারণ মনোবিকলন অভিধা-অতিরিক্ত পরিচয় বহন করে। গল্পটিকে আমরা সাইকো-ফোবিক (psycho-phobic)[৯৫] পর্যায়ভুক্ত করে উল্লেখ ও আলোচনা করাই অধিক যুক্তযুক্ত বলে মনে করি। কেননা একটি অপ্রিয় অনুষঙ্গ, মাত্র দু-আনা পয়সার জন্য হত্যা, রক্ত দর্শনের ফলেই সেলিনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে গভীর প্রতিক্রিয় আর এরই প্রভাব পড়েছে তার শরীরে ও স্বভাবে। গল্পকারও সেলিনার এই মানস-বিক্রিয়া, অন্তর অনুভূতির স্বরূপ স্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করার জন্য হত্যাকাণ্ডটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন এবং সেলিনাকে স্থাপন করেছেন দিগন্তপ্রসারিত এমন এক মাঠের সামনে যেখানে আমরা না-দেখলেও সেলিনা প্রত্যক্ষ করেছে অশ্বারোহীদের সশব্দ আগমন। সেলিনার ইনস্যানেটি, বৈকল্যও দীর্ঘস্থায়ী নয়, একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের মধ্যেই তা সীমায়িত থেকেছে। আমমৌলবী 'তার গালের ক্ষতস্থানে মুখ' দিলেই সেলিনার আত্মজাগরণ ঘটেছে। কঠিন দৃষ্টিতে আম-মৌলবীর দিকে তাকিয়ে 'কঠিনতর কণ্ঠে' সে বলেছে: 'আপনি আমার গা ধরেছেন। দাদাসাহেবকে বলে দেবো।' আর সেই সঙ্গে সেলিনা ফিরে পেয়েছে তার জাগর সত্তা, নারী ব্যক্তিত্ব ও সচেতনতা।

বস্তুত, আত্মিক পরিশুদ্ধি না-ঘটলে, এবং অধীত-বিদ্যা ব্যক্তির চেতনায় শিকড়ায়িত হয়ে তাকে পুনর্জাত না-করলে মানুষ মনের অবদমিত ইচ্ছার গলায় রজ্জু পরাতে পারে না। সুযোগ পেলেই তার অবচেতন মনের গুহায়িত কামনা নখ-দন্ত

বিস্তার করে। আমাদের ধর্মশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ণ, একদেশদর্শী হওয়ায় ধর্মবেত্তা বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে চারিত্রিক অসংগতি, প্রবল মানস-বিকার ও বৈকল্যের উপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট। 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সেলিনার কথামালা ও আম মৌলবীর আচরণের মাধ্যমে গল্পকারের সেই মানব মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানী ও অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত সমাজে ব্যক্তি-মননের স্বরূপ-সচেতন অন্তরের প্রকাশ ঘটেছে।

'মালেকা' নামকরণের মাধ্যমেই গল্পের কথাবস্তু আভাসিত। মাইনর স্কুল পাসের পর তোজাম্মেল তরফদারের সঙ্গে মালেকার বিয়ে হয়েছিল। বধূজীবনের প্রারম্ভিক পর্বে মালেকা সুখেই ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। তোজাম্মেল ব্যবসায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়; আর যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ তাদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাকে আরো বিপন্ন করে তোলে। গ্রামের বাস উঠিয়ে মালেকা স্বামীর সঙ্গে শহরে আসে। ম্যাট্রিক ফেল তোজাম্মেল শত চেষ্টা করেও বেকারত্ব দূর করতে পারেনি। তাই মালেকাকেই সংসার নির্বাহের, নিজের-সন্তান ও স্বামীর ভরণপোষণের জন্য স্কুলে চাকরি গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকতাসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ সামান্যই। মালেকার গার্হস্থ্য জীবন তাই দারিদ্রদষ্ট, হিসাব-শাসিত, অভাবক্লিন্ন ও অপ্রাপ্তির বেদনায় দীর্ঘায়িত। 'মালেকা' সেদিক থেকে তারই সংগ্রামী সত্তা; এবং জীবনযুদ্ধের করুণ অথচ বাস্তবানুগ কাহিনী।

গল্পের নাম 'মালেকা' হলেও গল্পকারের সার্বক্ষণিক অভিনিবেশ তারই প্রতি নিবদ্ধ থাকেনি। প্রধানশিক্ষিকা ও দাই-এর প্রতিও তিনি সমান সহানুভূতিশীল। ফলে তিনটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে সযত্নচর্চিত ও জীবন্ত। মালেকা জীবনযুদ্ধে পরাজিত, অস্তিত্বের সংকটে বিধ্বস্ত হলেও প্রধানশিক্ষিকা স্বচ্ছল ও অতিমাত্রায় হিসেবী। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তিনটি চরিত্রের মধ্যে দাই-ই সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও স্বাতন্ত্র্য-উচ্চকিত। তার ব্যক্তিস্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পকার বলেন :

> দাই-এর ধৈর্য যেমন সীমাবদ্ধ, তার মুখটাও তেমনি চাঁছাছোলা। তার ভয়ও নাই কাউকে। সত্য কথা গোলার মতো বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, কোথাও আটকায় না।[৯৬]

পরবর্তী 'স্তন' গল্পেও আমরা একজন দাই-এর সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু দু-জনের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর ও নির্দেশযোগ্য। 'স্তন'-এর দাই নির্জীব, ব্যক্তিত্বহীন, অন্য-চালিত ও টাইপ বিশেষ। কিন্তু 'মালেকা-র দাই প্রগল্‌ভ, স্পষ্টবাদী এবং অপ্রিয় হলেও সত্যভাষণে বীতকুণ্ঠ।

'স্তন'[৯৭] মাজেদার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, শারীরিক অক্ষমতা ও তার অবচেতন মনে স্তরীভূত প্রত্যয়কে মুছে ফেলে ব্যক্তিত্বে সুস্থির, জাগরিত হয়ে ওঠার গল্প। একই সময়ে সালাহ্‌উদ্দিন সাহেবের মেয়ে খালেদা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এবং কাদেরের স্ত্রী মাজেদা তার সন্তান জন্মের পরই মারা যায়। সালাহউদ্দিন সাহেব নবজাতককে দুধ দিয়ে লালন করার জন্য মালেকার কাছে প্রেরণ করেন। সালাহ্‌উদ্দিন সাহেবের দূরাত্মীয় কাদের ও তার স্ত্রী মালেকা এ প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু অন্তরায় হয়েছে

মাজেদার দেহযন্ত্র। তার বুকে দুধ নেই। শত চেষ্টা করেও সে মাতৃহীন শিশুটির মুখে এক ফোঁটা দুধ তুলে দিতে পারেনি। মাজেদার বিশ্বাস : নিজের সন্তান বাঁচেনি বলেই অন্যের ছেলের জন্য তার বুকে দুধ উৎপাদিত হচ্ছে না। কিন্তু সে কোনো পরাভব স্বীকার করতে চায় না। এক সময় মাজেদার মনে হয় : তার 'কুচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। বোতলের গলায় ছিপি আটকে গেলে যেমন কিছু সরে না।' মাজেদা অতঃপর 'একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা' দিয়ে প্রথমে ডান তারপর বাম স্তন বিদ্ধ করে আর তখনই তার স্তনযুগল থেকে তরল পদার্থ নির্গত হয়। কিন্তু 'সে দুধের বর্ণ শাদা নয় লাল।'

'স্তন'-এর সূচনা সালাহ্উদ্দিন সাহেবের জীবনার্থের নিরাভরণ বর্ণনার মাধ্যমে হলেও অনতিকাল পরেই লেখক মূলসংকটের গভীরে প্রবেশ করেছেন। 'আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করাটা' তার 'পারিবারিক ফরজ' হলেও কাদেরের বাড়িতে তিনি গিয়েছেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে, তাঁর নাতির জীবন-রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে। তাই গল্পের প্রারম্ভে যে নাট্যিক মুহূর্ত, আকস্মিকতার স্থান ছিল তা হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলিত। পূর্ববর্তী সমালোচক[৯৮] 'গ্রীষ্মের ছুটি'-র সঙ্গে পরস্পরিত করে 'স্তন'-কেও বলেছেন মনোবিকলনধর্মী গল্প ; আর শিবনারায়ণ রায়ের মতে 'স্তন' 'বৈকল্যের বিশ্লেষণে' বিশিষ্ট।[৯৯] কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও বিবেচনার অপূর্ণতা লক্ষণীয়। কেননা 'স্তন'-এর মাজেদার মধ্যে কোনো ফোবিয়া গল্পকার সঞ্চারিত করেননি। মাজেদার বিকলন সত্তার মূলে আছে তারই শারীরিক অক্ষমতা, মাতৃহীন জীবিত সন্তানটিকে দুগ্ধ-দানের ব্যর্থতা। আর এই অপারগতার যন্ত্রণা তার হৃদয়ের অন্তর্প্রদেশে প্রবিষ্ট করিয়েই মাজেদাকে আরো বিকলনধর্মী করার জন্যই গল্পকার তার মধ্যে মূলীভূত করেছেন এক সুদৃঢ় বিশ্বাস : 'দুধ তার সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তার সন্তানটি আর নেই বলে সে-দুধ এমনভাবে জমে গেছে।' মাজেদার আচরণ তাই অস্বভাবী এবং শারীরিক অক্ষমতাসৃষ্ট মনোবিকলনের জগতেই সে রয়ে গেছে। তার মনোবিকোলন কখনোই 'গ্রীষ্মের ছুটি'-র সেলিনার মতো সাইকো-ফোবিক নয়। মাজেদার মনোবিকলন অথবা বৈকল্য মূলত সাইকোসোমাটিক জাতীয়।[১০০]

একটি অলীক প্রত্যক্ষণ, স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি-চরিত্রের কীভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে 'মতিনউদ্দিনের প্রেম'-এ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সে-চিত্রই নির্মাণ করেছেন। মতিনউদ্দিনের দুই রূপ : অফিসে সহকর্মী-বন্ধুদের কাছে সে অতি নিরীহ, মিতভাষী ও বিনয়ী। কিন্তু খালেদার কাছে সে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিচয়ে উপস্থিত। ঘরে স্ত্রী খালেদা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো লোক না-থাকলেও মনে হয় যেন তার হুকুম তামিল করার জন্য 'সাহেব-গোমস্তা, বাবুর্চি-খানসামা-পেয়াদা হুকুমবরদারের অন্ত নেই।' অকস্মাৎ মতিনউদ্দিনের স্বভাব ঘরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তিত হয়। একদা মতিনউদ্দিন স্বপ্ন দেখে যে, তার গোসল-করার পুকুরের ধারে বিরাট হাট বসেছে। ক্রেতা-বিক্রেতার সমাবেশ ও গোরু-ছাগলের পায়ের ধুলোয় স্থানটি আচ্ছাদিত। অকস্মাৎ সে এক নারীর আর্তনাদ শোনে। সেই ললনা তাকে উদ্ধারের

জন্য মতিনউদ্দিনকে আহ্বান জানায়। ঘুম ভাঙলে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলেই মতিনউদ্দিন গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু তার প্রচেষ্টা জয়ী হয় না। সব বুঝেও স্বপ্নের মধ্যে ক্ষণিক চেনা সেই মানবীর আর্তি ও আকুতি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নিরুপায় মতিনউদ্দিন তখন বন্দি পাখির মতো ডানা ঝাপটায়, মুক্তি খোঁজে।

এ পর্যায়ের অন্যান্য গল্পের মতো ' মতিনউদ্দিনের প্রেম'-এর পাশাপাশি গল্পকারের সবিশেষ সহানুভূতি লাভ করেছে খালেদা। স্বামীর উচ্চকণ্ঠ উপস্থিতি নিরস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব-বর্জিত বলে মনে হলেও যে-মুহূর্তে মতিনউদ্দিন দিবাস্বপ্ন তাড়িত হয়ে ব্যতিক্রমী আচরণ করেছে সেই মুহূর্ত থেকেই জাগরণ ঘটেছে খালেদার; নির্জন ঘর ও স্বপ্নঘোরে আবিষ্ট স্বামীকে প্রত্যক্ষ করেই সে হয়ে উঠেছে সচেতন।

' মতিনউদ্দিনের প্রেম'–কে মনোবিকলনধর্মী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।[১০১] কিন্তু গল্পটির সাংগঠনিক ও বিষয়-বৈচিত্র্যের গৌরব অন্যত্র নিহিত রয়েছে। এ গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্পষ্টতই বহির্জগৎকে সংহরণ করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মনোজগতের সর্বৈব প্রাধান্য। গল্পের আবহ উঠে এসেছে মতিনউদ্দিনের চেতন ও অর্ধচেতন জগৎ থেকে। তার স্বপ্ন-দর্শনের ঘটনাও মনোজাগতিক। বস্তুত, ' মতিনউদ্দিনের প্রেম'-এর প্রতিপাদ্য, প্রমাণ ও বাস্তবতা— কোথাও বহির্জগতের স্থান নেই। প্রকৃত-অর্থেই এ গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চেতনাপ্রবাহরীতির অনুসারী, অন্তর্জগতে নিমগ্ন হয়ে বহির্জগৎ নির্মাণে সচেষ্ট। গল্প-শেষে তাই একটি অপার শূন্যতাবোধে উপনীত হওয়া ছাড়া আমরা আর কোনো পুরস্কার লাভ করি না। স্মরণীয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)-র ঘটনাধারাও মনোজাগতিক। আরেফ আলীর সংবেদনশীল চেতনালোকেই উপন্যাসের মৌল সংকটের সৃষ্টি আবার আরেফের জাগর চৈতন্যই এই সংকট থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। একটি নারী কণ্ঠের গোঙানি, মৃতদেহই আরেফ আলীকে নিমজ্জিত করেছে সংকট ও সচেতনার গভীরে। অনুরূপভাবে এ গল্পেও স্বপ্নের মধ্যে অর্থাৎ, অর্ধচেতন মনোজগতেই মতিনউদ্দিন সুতন্বী এক নারীর কান্না শুনেছে, তারই মুক্তিব্যাকুল আবেদন মতিনউদ্দিনকে 'নিরবলম্ব অবস্থায় শূন্যে ঝুলিয়ে' রেখেছে। সে-অর্থে ' মতিনউদ্দিনের প্রেম' *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসেরই প্রস্তুতিপর্ব আর সে-হিসেবেই তা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য।

দুইতীর ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আবদুল হক (জন্ম ১৯১৮) সংকলনটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীল সত্তার মৌলিকত্ব স্বীকার করেও[১০২] কতিপয় চকিত মন্তব্য করেন: "ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই যে এ বইয়ের ৯টি গল্পের মধ্যে চারটি গল্পে আদৌ সংলাপ নেই ('পাগড়ি', 'কেরায়া', 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা', মতিনউদ্দিনের প্রেম') এবং দুটি গল্পে আছে নামমাত্র ('দুইতীর', 'স্তন')। যেখানে আছে সেখানেও সংলাপ হয় কয়েকটি কথার বিনিময় মাত্র অথবা স্বগতোক্তি।"[১০৩] তাঁর এ সিদ্ধান্ত *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প*-এর ভাষাশৈলী

বিচারে পরবর্তীতে আলোচকদের করেছে প্রভাবিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের অভিমত: 'পাগড়ি—এটি এক নিঃশব্দতার গল্প। এ গল্পে নেই একটিও সংলাপ।"[১০৪] ... সংলাপ বিরল এ গল্পে ['স্তন'] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি পুরোনো পদ্ধতি অবলম্বন করছেন।'[১০৫] ... 'কেরায়া' গল্পেও তো সংলাপ দুতিনটি মাত্র।"[১০৬]

আবদুল হক ও আবদুল মান্নান সৈয়দের অভিমত আক্ষরিক, আপাত অর্থে সত্য হলেও স্তরবহুলতার প্রশ্নে এ জাতীয় এক মাত্রিক মন্তব্য অনেক পাঠকের বিভ্রান্তিকর বিবেচিত হতে পারে। বিষয়টি তাই ভিন্ন মাত্রায় বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গল্পের কাহিনী পাঠকচিত্তে অভিপ্রেত প্রতীতি সৃষ্টির জন্য গল্পকার কাহিনী-বর্ণনায় পাত্র-পাত্রীর সংলাপ অঙ্গীভূত করেন। ছোটগল্পের ভাষা-সংগঠনের এ এক প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। সে-দিক থেকে গল্পে সংলাপের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য। কিন্তু এ শর্ত গল্পের সংগঠনে সর্বত্র অনিবার্য, অবশ্য অনুসৃত হতে হবে এমন কোনো ধ্রুববিধান নেই। সংলাপরিক্ত গল্পও শিল্পোত্তীর্ণ, পাঠক-আদৃত হয়, আর সংলাপ বলতে সাধারণত প্রত্যক্ষ উক্তিকে বোঝালেও ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বা পরোক্ষ উক্তিও সংলাপ। 'পাগড়ি'-তে সে-পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছে। মোত্তালেব সাহেব ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা পরোক্ষ উক্তিতেই কথা বলেছে :

১ নীরবতা ভেঙে হঠাৎ মোত্তালেব সাহেব কথা বলতে শুরু করেন। অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে বলেন যে, তিনি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি নতুন মা আনবেন বলে স্থির করেছেন।[১০৭]

২ সালাম শেষ করে বড় মেয়েটি নিচের ঠোঁট কাটে দাঁত দিয়ে। তার ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি তাদের মা হেসে উঠবেন। তার বিদ্রূপ-ভরা তীক্ষ্ণ কর্কশ হাসির কথা ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। মনে মনে শঙ্কা-ভয়ে অস্থির হয়ে সে খোদার কাছে, দোয়া করে; **খোদা, খোদা, আম্মা যেন হেসে না ওঠেন।**[১০৮]

৩ মেয়েরা চোখ মুছতে-মুছতে বাইরের ঘরে ছুটে যায়। লজ্জায় তারা কেমন মুষড়ে পড়েছে। তারা বিড়বিড় করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, **ছি ছি কী ঘুম পেয়েছিল! বাদলার দিন কিনা।**[১০৯]

'পাগড়ি'-কে শূন্যসংলাপের গল্প বললে সে-তথ্য তাই গল্পের আভ্যন্তর সাক্ষ্য অনুমোদন করে না। উল্লেখযোগ্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটনামুখ্য গল্প রচনা করেননি। ঘটনাসৃষ্ট চরিত্রের রূপকল্প নির্মাণই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল। 'পাগড়ি'-তেও তিনি মোত্তালেব সাহেবের অন্তর্ভাবনার শব্দরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে তার অন্তর্লোকের উপলব্ধি উপস্থাপন ও একাকিত্ববোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষ যখন আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয় তখন সে কেবলই স্বীকারোক্তি করে, নিজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনার মাধ্যমেই অনাবৃত করে তার হৃদয়ক্ষত। এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ উক্তির চেয়ে পরোক্ষ সংলাপই উপযুক্ত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই শৈল্পিক প্রয়োজনেই 'পাগড়ি'-তে চেনা পথ পরিহার করে হয়েছেন পরীক্ষাপ্রবণ, অবলম্বন করেছেন পরোক্ষ সংলাপ উচ্চারণ পদ্ধতি। কিন্তু 'কেরায়া' ও 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' সে-তুলনায় স্বতন্ত্র,

আরো বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ রীতির সংলাপ অবলম্বনে গ্রথিত। 'কেরায়া' র বৃদ্ধ রাতের তৃতীয় প্রহরে মাঝিরা যখন নিদ্রাচ্ছন্ন তার ফাইফরমাশ খাটা ঘুমবিভোর ছেলেটিকে 'বাপজান' সম্বোধনে কাছে ডাকা ছাড়াও তার উদ্দেশে বলেছে :

এদিকে এসো বাপজান।[১১০]

[আর 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'-র সদরউদ্দিন যখন তার পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে মাপ্ চেয়েছেন তখন তার কন্যাও পিতার সঙ্গে উপস্থিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলেছে :]

··· মাফ দিয়ে দেন, মাফ দিয়ে দেন। মরবার আগে একটি বুড়ো মানুষ মাফ চাইছে, তাকে মাফ করে দেন।[১১১]

'মতিনউদ্দিনের প্রেম'-ও সংলাপ বিবর্জিত নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ রীতির সংলাপসমবায়েই নির্মিত। এ গল্পে খালেদা তার স্বামীর অকস্মাৎ পরিবর্তিত স্বভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজেই নজেকে প্রশ্ন করেছে আবার নিজেই সে-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে :

খালেদা তার মনের বন্ধুকে বলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বন্ধু উত্তর দেয়, বোঝা মুশকিল।

তারপর খালেদা এবং তার মনের বন্ধু দুজনেই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে।

··· অবশেষে তার বন্ধুই বলে, আমার কি মনে হয় জানো ?

কি? সে উত্তর দেয়।

মনে হয় কোন মেয়েলোকের উপর তোমার স্বামীর দিল পড়েছে।

সে টক করে উত্তর দেয় না। কথাটা সে যেন বোঝে না : দিল পড়ার অর্থ কি ? কেনই-বা একটি পুরুষের দিল একটি মেয়ে মানুষের ওপর পড়ে ? তাছাড়া, সে-ও কি মেয়েমানুষ নয় ?

তার মনের বন্ধু উত্তর দেয়, হয়তো মেয়েলোকটি সুন্দরী।

খালেদা কিন্তু তার মনের বন্ধুর কথা মানতে চায় না। মাথায় একটু ঝামটা দিয়ে বলে, আমি জানি তার কি হয়েছে।

কি হয়েছে ?

কোন ফকির-দরবেশের ডাক পড়েছে। মনের বন্ধু হাসে, ফকির-দরবেশের ডাক পড়েছে না কচু হয়েছে। দেখ না কেমন যত্ন করে সিঁথি কাটে আজকাল, মুখে-চোখে কেমন আবেশ।[১১২]

আবদুল হকের দ্বিতীয় মন্তব্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প*-এর রচনারীতিকে কৃত্রিম, পশ্চাৎমুখি এবং অনবধানতাক্লিষ্ট[১১৩] বলে যে-অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাও গল্পের আভ্যন্তর সাক্ষ্য বিবেচনায় প্রতিষ্ঠা হারায়। কেননা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ-পর্বের গল্পসমূহের ভাষা ও রচনাশৈলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অন্তঃসারময়, শব্দ-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার, বাক্যের অন্বয়গত শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত

হয়েই এ সব গল্পে স্রষ্টার অন্তর্লীন প্রতিভার মৌলিকত্ব ও তাঁর চলিষ্ণু সত্তার দৃঢ়রেখ পরিচয় হয়েছে উচ্চকিত।

ভাষা স্রষ্টার অন্তর্গত শিল্পব্যক্তিত্বের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ও অঙ্গীভূত এবং প্রত্যেক লেখকের রচনারই কিছু নিজস্ব চারিত্র থাকে, যা তার 'ধ্বনিবিন্যাস, বাক্যযোজনা, প্যারাগ্রাফ বা স্তবক-রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার' ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়'[১১৪]। এ পর্বের প্রথম গল্প 'দুইতীর' ব্যক্তির নিঃসঙ্গ সত্তার রূপকল্প হিসেবে উল্লেখযোগ্য ও সাংগঠনিক গৌরবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষাশৈলীগত উৎকর্ষের প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। সম্পূর্ণ নির্ভার ও সব ধরনের অতিরেক বর্জিত এ গল্পের ভাষা মুখ্যত উপমা-প্রসাধিত, চিত্রাত্মক বাক্যবন্ধে উজ্জ্বলিত। হাসিনার সঙ্গে নিরবলম্ব দাম্পত্য জীবনের গুরুভার বহন করে আফসারউদ্দিন ক্লান্ত, নৈঃসঙ্গ্যদীর্ণ। তাঁর এ উপলব্ধির ব্যাপকতা প্রকাশ করতে গল্পকার ব্যবহার করেছেন উপর্যুপরি পাথরের উপমা ও অনুষঙ্গবাহী শব্দ :

১ আজও চাকরটি তার **পাথরের মতো** ভারি পা-দুটি থেকে প্রথমে জুতা খোলে, তারপর মোজা।[১১৫]

২ শীঘ্র নীরব ঘরে হাসিনার কণ্ঠ শোনা যায়। তার মুখ থেকে যে-শব্দগুলি বের হয়, সে-শব্দগুলি **পাথরের মতো** ভারি, **পাথরের মতো** স্বয়ংসম্পূর্ণ।[১১৬]

৩ হাসিনা তার দিকে বিশেষভাবে না তাকালেও তার দৃষ্টি **পাথরের মতো** নিষ্প্রাণনিরাসক্ত নয়।

পাথর নিষ্প্রাণ, জড়ো; আফসারউদ্দিন-হাসিনার দাম্পত্য জীবনও নীরক্ত, অন্তঃসারশূন্য। ফলে তাদের সেই গ্রন্থিহীন ও ত্রিশঙ্কুবৎ জীবনের সত্যস্বরূপ উন্মোচনে পাথরই অনিবার্য উপমা, বিকল্পহীন অনুষঙ্গ। আবার আফসারউদ্দিন-হাসিনা একই বাড়িতে, একই ছাদের নিচে পাশাপাশি বিছানায় রাত্রি যাপন করলেও তারা পরস্পর অচেনা, অপরিচিত; হাসিনাকে দেখা, তার কায়া সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া গেলেও সে আফসারউদ্দিনের অধরা, নিষিদ্ধ এলাকা। আফসারউদ্দিনের জীবনে হাসিনার এই দুরন্বয়ী অবস্থান বর্ণনার তাই সবচেয়ে সহায়ক উপমা হচ্ছে মেঘ এবং আকাশে ভাসমান মেঘ :

১ হাসিনা পুরানো আমলের একটি ক্ষুদ্র ড্রেসিং-টেবিলের সামনে চুল আঁচড়াতে বসে। **মেঘের মতোই** তাকে অতি দূর মনে হয়।[১১৮]

২ পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে আফসারউদ্দিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে আকাশে স্তরের পর স্তর **মেঘ** জমে আছে। মশারির জালের মধ্যে দিয়ে সে-**মেঘসম্ভার** বেদনাভরা স্মৃতির মতো মনে হয়। তবু তা যেন অতিদূরে। এত দূরে যে তার দিকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তাকানো যায়।[১১৯]

গল্প ও প্রবন্ধের পার্থক্য যেমন বিষয়গত তেমনি তা ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, রচনার আভ্যন্তর শৃঙ্খলা ও অন্বয় ভিত্তিক। আবার এই দুই প্রকাশ-মাধ্যমের মধ্যে এ কালের

কোনো প্রতিভা অনাত্মীয়তা কিংবা বৈরিতা স্বীকার করেন না। আধুনিক প্রবন্ধকার ও কথাকোবিদ তাঁদের নিজস্ব জীবনবোধ ও শিল্প-চৈতন্যে সুস্থির থেকেও উভয়বিধ আঙ্গিকের সাংগঠনিক কৌশলকে, সমান্তরালভাবে আলিঙ্গন করতে পারেন। অন্য কথায়, এ কালের গল্পের মধ্যে যেমন প্রবন্ধের বন্ধনগত শৃঙ্খলা দুর্লক্ষ নয় তেমনি আধুনিক প্রবন্ধ লাভ করেছে গল্পের দীপ্তি, গীতলতা ও মাধুর্য।

প্রবন্ধকার তাঁর রচনায় কেবল তথ্য পরিবেশন কিংবা বিষয়বস্তু বর্ণনার মাধ্যমেই নিজের কর্তব্য শেষ করেন না— প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাসের আলোকে তাঁকে নতুন সিদ্ধান্তে উপস্থিত, পূর্বোক্ত কিংবা উদ্দিষ্ট অনুচ্ছেদের সারাৎসার উল্লেখ করতে হয়। এ-জন্য অনুচ্ছেদের শেষে কিংবা প্রবন্ধের উপসংহারে প্রায়ই তিনি 'বস্তুত', 'মোটকথা', 'অর্থাৎ', 'বলা বাহুল্য' ইত্যাদি শব্দ বা পদপরম্পরা ব্যবহার করেন। ফলে অনায়াসেই প্রবন্ধকারের উদ্দিষ্ট তথ্য বর্ণনা ও মন্তব্য প্রদানের মধ্যবর্তী ব্যবধান হয় অতিক্রান্ত।; আর প্রবন্ধের ভাষায় আসে সংহতি, নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা। কিন্তু সৃষ্টিশীল রচনায় বিশেষত, গল্পের ভাষায়ও যে এ জাতীয় প্রবন্ধগন্ধী শব্দের ব্যবহার দূষণীয়, গল্পের রসনিষ্পত্তির জন্য ক্ষতিকর নয় তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ পর্বের গল্পগুলি লক্ষ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ' দুইতীর'-এর প্রারম্ভিক তিনটি অনুচ্ছেদেই মুখ্যত উল্লেখিত হয়েছে আফসারউদ্দিনের আসঙ্গলিপ্সু প্রাত্যহিক জীবন, ভৃত্য আবদুলের প্রতি তাঁর নির্ভরশীল স্বভাব। কিন্তু এ চারিত্র আফসারউদ্দিনের জন্মসূত্রে অর্জিত নয়, পরিস্থিতিসৃষ্ট। ফলে নিজের জাগ্রত বিবেকের প্রচ্ছন্ন বাধা তিনি সবসময়ই বোধ করেছেন। চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে আফসারউদ্দিনের বর্তমান জীবনধারা বর্ণনার পরই লেখক তুলে ধরেছেন আফসারউদ্দিনের অতীত সত্তা ও অবস্থান। আর এই কাল পরিবর্তনের উপায়রূপে প্রযুক্ত হয়েছে প্রাবন্ধিক কৌশল :

> দু-বছর আগে কেউ আফসারউদ্দিনের জুতা খুলতো না। **বস্তুত** একটি মানুষের দিকে পা বাড়িয়ে দেবে এমন কথা তখন সে কল্পনাও করতে পারতো না। তখন সে মেসবাড়ির হাওয়াবদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বাস করতো।[১২০]

একই গল্পের অন্যত্র :

> তাসবাজি করে, কালোয়াতি গানের আসর বসিয়ে এবং শিকার-পিকনিক করেও যখন তাঁর [আরশাদ আলী] **জীবনের নিঃসঙ্গতা** কাটলো না তখন তাঁর মরুভূমির মতো জীবনে একটা মরূদ্যান-সৃষ্টির প্রয়াসে তিনি ছয় বছরের মেয়ে হাসিনাকে তাঁর কার্যস্থলে নিয়ে যান। **বলা বাহুল্য**, এ-বিষয়ে মরিয়ম খানমের মত পাওয়া সহজ হয় নাই; তাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয়।[১২১]

এ জাতীয় প্রয়োগ 'মতিনউদ্দিনের প্রেম'-এও বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

১ সে যে তার [মতিনউদ্দিন] পারিবারিক জীবনের বা খালেদার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আপন মনে এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তা নয়। **বস্তুত**, এ-পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও সে-সব কথা তার মনে পড়ে নাই।[১২২]

২ মতিনউদ্দিনের খড়মেও কম আওয়াজ হয় না। বরাবর দেখে-শুনে শক্ত মজবুত খড়ম কেনে সে। বস্তুত, তার ঘরের জাঁদরেল সত্তাটির একধারে তার গলা অন্যধারে খড়ম।[১২৩]

অগ্রন্থিত গল্পসমূহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বাক্যযোজনা ছিল দীর্ঘ, 'এবং', 'কিন্তু', 'ও' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়ের শৃঙ্খলে প্রলম্বিত। *নয়নচারা* পর্বে পরিমাণে স্বল্প হলেও বাক্যের এই আন্বয়িক বন্ধন আমরা লক্ষ করেছি। *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প*-এ এ জাতীয় বাক্যসংগঠনে তিনি আবারও পূর্বপ্রত্যয়ে ফিরে গেলেও সংযোজক অব্যয়সমূহ লক্ষণীয়ভাবে স্থান পরিবর্তন করায় বাক্যের আন্তর চারিত্রের বেশ রূপান্তর ঘটেছে। ইংরেজি একাধিক বিধেয়সংবলিত বাক্যের অনুকল্পেই তিনি *দুইতীর* পর্যায়ের দীর্ঘ বাক্যগুচ্ছ নির্মাণে যত্নশীল হওয়ায় আগের সংযোজক অব্যয়ের স্থান দখল করেছে 'যে', 'সে', 'যেভাবে', 'সেভাবে' ইত্যাদি সংযোজক সর্বনাম:

১ আফসারউদ্দিন জানে, যে-জীবন সে ছেড়ে এসেছে, সে-জীবনের প্রতি তার কোন মমতা নাই।[১২৪]

২ তার মনে হয়, তার যে-সুদিন এসেছে সে-সুদিন তার মনের গভীর কোন অঞ্চলে কেমন একটা ভয়-শঙ্কার সৃষ্টি করে।[১২৫]

৩ ভাগ্যবশে এবং যোগ্যতা-অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে-জীবনে সে প্রবেশ করেছে সে-জীবন সমস্যা উৎকণ্ঠা–উদ্বেগশূন্য না হলেও তাতে আর্থিক অভাব-অনটন দুঃখ-কষ্টের ছায়া নাই।[১২৬]

৪ সে-খানদানী আবার অর্থ সম্পদে পোক্তাবন্দি, যে-অর্থসম্পদ ইদানীং চা-বাগান কলকারখানায় টাকা খাটানোর ফলে বিশেষভাবে বৃদ্ধি লাভই করেছে।[১২৭]

৫ যে-বৃদ্ধ লোকটির ছায়া এখনো তাদের পথে পড়েনি কিন্তু শীঘ্র পড়বে, সে-ছায়া মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দিনই আনে।[১২৮]

৬ সদরউদ্দিনের চক্রান্তে সে যে-দীর্ঘমকদ্দমায় লিপ্ত হয়, সে-মোকদ্দমায় সে সর্বস্বান্ত হয়। সদরউদ্দিন তার বুকে যে-সর্বনাশী আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়, সে-আগুনে সে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়।[১২৯]

৭ এক সময় সদর-দরজায় সবুজ রঙ ছিল; সে-রঙ অনেকদিন হলো বিবর্ণ হয়ে গেছে।[১৩০]

'দুইতীর' ও 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' থেকে সমাহৃত উদাহরণগুলি বাংলা বাক্যগঠনের প্রচল নিয়ম-অনুমোদিত নয় বলেই সম্ভবত আবদুল হকের কাছে স্রষ্টার 'ভাষাগত অসাবধানতা'-র পরিচয়বাহী বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বাক্যগঠনের এ রীতি কখনোই যান্ত্রিক কিংবা বহিরারোপিত নয়, গল্পের বাস্তবতার অনিবার্য প্রয়োজন-প্রসূত বলেই আমরা তা মানি। 'দুইতীর' ও 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'–দুটি গল্পই ব্যক্তির আত্ম-অবিষ্কার ও স্বীকারোক্তির শব্দরূপ। আফসারউদ্দিন ('দুইতীর') নৈঃসঙ্গ্য ও আত্মিক অনিকেত চেতনায় বিপন্ন আর সদরউদ্দিন ('নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা') জীবনসন্ধ্যায় উপলব্ধি করেছে অপার অনুশোচনা। ফলে উভয়ের কাছেই সময় দুর্বহ

পাথর হয়েই ধরা দিয়েছে। তাদের এই চেতনাস্বরূপ নির্মাণে পেলব, সীতল গদ্যরীতির পরিবর্তে সংযোজক সর্বনাম-আশ্রিত ও অসমাপিকা ক্রিয়াসংবলিত দীর্ঘ বাক্যই তাই বিশেষ উপযোগী।

গদ্যাত্মক রচনা বিশেষত উপন্যাস, গল্পের ভাষাগত বিশ্লেষণে বিশেষণ পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিশেষণ বস্তুকে বিশেষিত করা ছাড়াও রচয়িতার নিজস্ব চারিত্র, কণ্ঠস্বর মানস-অভীপ্সাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *'দুই তীর'* পর্বের গল্পগুলির পটভূমি ও পরিবেশ এবং চরিত্রসমূহের অন্তর্গত স্বরূপ উন্মোচনে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি প্রত্যক্ষ করলে আমরা তাঁর এ পর্যায়ের গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা প্রথম থেকেই বিশেষণদীপ্ত হলেও এ পর্বের বিশেষণ ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও স্রষ্টার অধিক সচেতনতাপ্রসূত। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের নীতিবোধ-পরিচালিত হয়ে পরিসংখ্যান প্রদান করতে গেলে আমরা তাই দেখি যে, দুইতীর পর্বের গল্পসমূহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মুখ্যত দুটি অভিলাষ বা প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, একই ধ্বনিসাম্যবহ বা অর্থবাহী বিশেষণের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে তাঁর গল্পের ভাষা প্রতিধ্বনিময়, অনুপ্রাস-উজ্জ্বল হয়েই লাভ করেছে সংগীতধর্মী, গীতল ও শ্রুতিমধুর এবং একসপ্রেশনিস্টিক বৈশিষ্ট্য।[১৩১] যেমন,

১ খাড়া নাকে কড়া রোদ, গর্তে-ঢোকা চোখে ঘোলাটে অন্ধকার এবং লম্বা শীর্ণ হাড়সার পায়ে কাঠ-কাঠ ভাব, শহরের অলিগলি দিয়ে হেঁটে-হেঁটে সে বন্ধু-শত্রুর সন্ধান করে।[১৩২]
২ তাদের কাছে মাফ না নেওয়া পর্যন্ত সে মরবে না, লকলকে পায়ে অনিশ্চিত পদক্ষেপে যে শহর ভ্রমণ শুরু করেছে সে-শহর ভ্রমণ হবে না।[১৩৩]
৩ একগুঁয়ে-ভাবে হাতের লাঠি ঠুকে-ঠুকে মরণাপন্ন বৃদ্ধ সদরউদ্দিন অগ্রসর হয়।[১৩৪]
৪ অদূরে পাটিতে বসে সেলাই শেখার নামে তার চৌদ্দ বছরের বোন আনোয়ারা সমবয়সী চাচাতো বোনের সঙ্গে ফিসফিস-গুজগাজ করছিলো এবং থেকে-থেকে একটু শব্দ না করে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ছিলো।[১৩৫]
৫ তারপর মাজেদার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।[১৩৬]
৬ একটি অদম্য কান্নার বেগে তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে।[১৩৭]

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাকে দৃশ্যমান, পরিবেশ ও ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় নৈকট্যে উপস্থাপন করতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন চিত্রাত্মক, গুণবাচক শব্দ বা বিশেষণ। যেমন, 'মতিনউদ্দিনের প্রেমে' মতিনউদ্দিনের বর্ণনা:

> মতিনউদ্দিন মেদমাংসশূন্য ক্ষীণ কাঠামোর ক্ষুদ্র আকৃতির মানুষ। ক্ষিপ্রবেগে চলার অভ্যাস সত্ত্বেও পথেঘাটে সে সহজে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বাচালতা দোষ নাই বলে অন্যদের মতো অজস্র কথায় সৃষ্ট একটি স্পর্শনীয় দৃশ্যমান চরিত্রও তার নয়। আফিসে দীর্ঘ বারান্দা-ঘরের সহযোগীদের মতো রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যাপারে তার মতামত থাকলেও কৃচিৎই তা সে প্রকাশ করে। কেবল চাল-ডালের দামের কথা উঠলে সে একটি বিশেষ মন্তব্য না করে যেন পারে না। একই ভঙ্গিতে একই স্বরে সে প্রতিবার বলে, শায়েস্তা খানের আমলে এক মণ চাল পাওয়া যেত মাত্র দু-আনায়।[১৩৮]

আবার 'পাগড়ি' গল্পে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের বর্ণনার ভাষা :

> রাস্তার ধারে ধুলোভারাচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ভাবেন। ভাবেন যে সে-কথা তার চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চোখের নিচে মাংসের থলে। বড় গোছের চোখ দুটো তার মধ্যে ভারি দেখায়। অনেকটা মার্বেলের মতো। তাও ড্রেনের কোণে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চল মার্বেল। [১৩৯]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *দ্বিতীয়* পর্যায়ের গল্পসমূহের ভাষার আর-একটি লক্ষণীয় ও দিগ্‌নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্য প্রবাদ-প্রবচনের সুচারু ও শিল্পিত ব্যবহার। স্মরণীয়, প্রবাদ-প্রবচন জীবন বিচ্ছিন্ন নয়, প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের সঙ্গেই তা সম্পর্কিত এবং প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে জীবনের আবেগ, উত্তাপ ও নির্যাসই নিষ্কাশিত হয়।[১৪০] এ-পর্বের গল্পগুলির পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিরূপ উপস্থাপন, তাদের অন্তর্গত সত্তাকে চিহ্নিত ও বক্তব্যকে অন্তর্ভেদী করতে দ্ব্যর্থহীনভাবেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাংলা প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। উদাহরণত 'মালেকা' গল্পে তিনটি ভিন্ন প্রসঙ্গে প্রযুক্ত ত্রয়ী প্রবাদকে গ্রহণ করা যায়। 'মালেকা'-র দাই লোকায়ত নারী, পল্লির সীমাসন্ধিতেই তার বাস। তাই তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বভাব বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে লোকজ প্রবাদ :

> দাই-এর ধৈর্য যেমন সীমাবদ্ধ, তার মুখটাও তেমনি **চাঁছাছোলা**।[১৪১]

মালেকার স্বামী তোজাম্মেলের ভাগ্যবিপর্যয়ের মূল তার ব্যবসায়িক ব্যর্থতা। ফলে তার অবস্থা বর্ণনায় এ বিষয়ক বহুল প্রবাদটিকে গল্পকার উৎকলন করেছেন ;

> "সে-ব্যবসায় **লালবাতি** জ্বালিয়ে এখন চাকুরির উমেদারিতে **চরকির মতো রাতদিন ঘোরে**।[১৪২]

গল্পের প্রধানশিক্ষিকা তাঁর শ্রেণী-অবস্থানের জন্য অতিমাত্রায় মর্যাদা-সচেতন বলে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক প্রবচন :

> যাই করো, ছাত্রীদের সামনে আপন মানটা খুইয়ো না। **জান দেওয়া যায়, মান দেওয়া যায় না**।[১৪৩]

উল্লেখযোগ্য যে, প্রবচন, প্রাজ্ঞোক্তি ভাষার বাকসংগঠনকে সুদৃঢ়, আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলাকে সুসংহত করা ছাড়াও স্রষ্টার সমাজ নৈকট্য, জনজীবন-গভীরে প্রোথিত তাঁর অবস্থানকে নির্দেশ ও উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে অনিবার্য, লক্ষ্যাভিমুখি, বেগ ও আবেগে কল্লোলায়িত করে।

আমরা দেখেছি, শিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে বহির্জগতের তুলনায় অন্তর্জগতই বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর চরিত্রেরা অন্তর্মুখি, সংবেদনাময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, জগৎ থেকে আলোকিত ভুবনে পুনর্বাসিত, জ্ঞানময় অস্তিত্ববাদী সত্তায় জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত হতেই ব্যাকুল ও ব্যগ্র। ফলে বাইরের ঘটনাবহুল তীব্র আলোয় উজ্জ্বল পৃথিবীর উপস্থিতি তাঁর গল্পে নেই। বহির্জগৎকে বিচ্ছিন্ন করে একটি অন্তর-বাস্তবতা নির্মাণেই তিনি থেকেছেন সচেষ্ট ও সনিষ্ঠ; আর এই বিশেষ প্রবণতার কারণেই অন্ধকার ও প্রায়-অন্ধকার পরিবেশ, শব্দহীনতা, নিঃসঙ্গতাকে তিনি গল্পের

পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই বিশেষ প্রবণতার পরিচয় *নয়নচারা* পর্যায়ের 'জাহাজী', 'খুনী', 'রক্ত', 'সেই পৃথিবী' প্রভৃতি গল্পেও মেলে। *দুইতীর* পর্যায়ে এসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই এষণা, প্রবণতা আরো স্পষ্ট, গল্পকারের অভিজ্ঞতায় পরিস্রুত ও তাঁর জীবনদর্শনে পরিস্নাত হয়ে শিলীভূত রূপ লাভ করেছে, হয়ে উঠেছে চরিত্রের অন্তর্গত বিষাদ, মনোজগতের বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতিমান ও অবভাস। যেমন, 'পাগড়ি' গল্পে খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেব যখন বৃষ্টিতে ভিজে তাঁর 'নতুন বিবি'-সহ উপস্থিত হয়েছেন তখন তাঁর পুরো বাড়িটি অন্ধকারে নিমজ্জিত; আর তাঁর ছেলে-মেয়েরা নিঃশব্দ, অন্তর্লোকে বিপর্যস্ত হয়েই প্রতিক্রিয়াশূন্য, আত্মগত ভাবনায় সমর্পিত:

> বাড়িতে কোন সাড়া জাগে না। ছোট ছেলেটির একটু পাঁচড়ার ভাব। অন্ধকারে সে দেহ চুলকাচ্ছিলো; হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। বড় ছেলেটি ভাবছিলো উঠে লণ্ঠন জ্বালিয়ে অন্যকোন মহাদেশের সীমারেখা অনুসরণ করবে। সেও এবার হিমশীতল হয়ে গুপটি মেরে থাকে। মেয়েরা মনে দ্রুতগতিশীল বিচিত্র দ্বন্দ্ববোধ করলেও রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো নিশ্চল হয়ে থাকে।[১৪৪]

অন্ধকারে অনুপুঙ্খ বাস্তবতার প্রকাশ থাকে না-বলে এ অবস্থায় ব্যক্তি হয় আত্মমগ্ন, অনুভূতিময় ও কল্পনাময় এক অধিবাস্তব জগতে পুনর্বাসিত। 'পাগড়ি'-র মোত্তালেব সাহেবের আগমনের জন্য বৃষ্টিমুখর অন্ধকারময় পরিবেশ সু-উপযুক্ত হলেও তাঁর সন্তানদের জীবনে তা ভিন্ন এক অন্ধকারের ইংগিত বয়ে এনেছে। নিজেদের জননীর অপমান ও বয়স্ক পিতার আচরণ তাদের মধ্যে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা ও নিদারুণ দুঃখবোধের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তাদের এই মনোবেদনা ও সংক্ষোভ প্রকাশে তারা অপারগ। ফলে গল্পকার তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে স্থাপন করেই মোত্তালেব সাহেব থেকে তাঁর সন্তানদের বিচ্ছিন্ন ও তাদেরই অন্তর্ভাবনার জগতে আবদ্ধ করেছেন।

'কেরায়া' গল্পটিতে অন্ধকারের ব্যাপক প্রাধান্য। গভীরতর বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ গল্পের অন্ধকার প্রতীকী, বহির্বাস্তব-অতিরেক মূল্যে তাৎপর্যময়। যেমন,

> তারপর রাতের অন্ধকার ভেদ করে একটি প্যাঁচা বেরিয়ে এসে নৌকাটার চারিদিকে ওড়ে, চক্র কাটে, ভারি পাখার শব্দ তুলে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়।[১৪৫]

সারাদিন মহাজনের জন্য প্রতীক্ষায় কাটিয়ে সন্ধ্যেয় মাঝিরা বুঝেছে যে, তাদের কাল হরণ ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে জেগেছে মহাজনের প্রতি ক্ষোভ, নিজেদের প্রতি গ্লানি। কিন্তু দিনের শেষে অন্ধকার নেমে এলেই তারা বহির্বাস্তব বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিরে এসেছে রাত্রির অন্ধকারে, অন্তর্গত বাস্তবতার জগতে। সেই মুহূর্তে তাদের ক্রোধও প্রশমিত হয়েছে আর তাদের মাথার উপর দিয়ে অন্ধকারে উড়ে যাওয়া প্যাঁচা অমঙ্গলের পরিবর্তে রূপান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞতার প্রতীকে। অতঃপর মাঝিরা বহির্জগৎ থেকে পরিপূর্ণভাবেই বিচ্ছিন্ন, জন্ম-মৃত্যুর ভাবনায় সমাহিত।

অন্ধকারের মতো রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ পর্বের গল্পের চরিত্রের অন্তর্গত-ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লক্ষ করলে স্পষ্ট হয় যে, *দুইতীর* পর্যায়ের গল্পে চড়া, উজ্জ্বল, সহজে দৃষ্টি হরণ করে এমন রঙের ব্যবহার অত্যন্ত বিরল। প্রায়শই তিনি ফ্যাকাশে, সাদা, পিঙ্গল রঙ, কখনো আবার বর্ণহীনতাকে উপজীব্য করেছেন। 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা' গল্পে সদরউদ্দিন ক্ষমা চাওয়ার জন্য রওনা হয়েছে তার 'চিরশত্রু' আখলাক তরফদারের বাড়ির উদ্দেশে। সদরউদ্দিন বৃদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী, পূর্বকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমাভিক্ষু। ফলে বর্ণিল জগতের উপস্থিতি তার চেতনালোকে অনুপস্থিত। আর অন্তরের বীতবর্ণের কারণে সে আখলাক তরফদারের গৃহকেও দেখেছে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে :

> সামনে ক্ষুদ্র উঠানটা সযত্নে লেপাজোকা; তার পাশে একটু গাঁদা ফুলের বাগান। কিন্তু সদরউদ্দিন জানে সে-বাড়ি কাঠে ঘুণ এবং তার ছিদ্রবহুল ছাদে বর্ষার পানি আর ধরে না। এক সময় সদর-দরজায় সবুজ রঙ ছিলো; সে-রঙ, অনেকদিন হলো বিবর্ণ হয়ে গেছে।[১৪৬]

এ বিবর্ণতা সাবজেকটিভ, সদরউদ্দিনের মগ্নচৈতন্য-আশ্রিত। তাই 'লেপাজোকা উঠান' ও গাঁদাফুলের ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও সদরউদ্দিনের কাছে তা ভিন্ন বাস্তবতা, তারই স্মৃতিময় অন্তর্বাস্তবতায় বিধৃত। আবার 'মালেকা' গল্পে মালেকার রূপবর্ণনাতেও সাদা রঙ, রক্তহীন ফ্যাকাশে অবস্থার উপস্থিতি :

> ছাত্রীদের পানে তাকিয়ে মালেকা নীরব হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চোখে জ্যোতি নাই, হাত দুটি শাদা ফ্যাকাসে। নখগুলো পর্যন্ত বীভৎসভাবে শাদা। দেহে কোথাও এক ফোটা রক্ত নাই যেন।[১৪৭]

সমাজ-প্রতিবেশের সঙ্গে মানুষ যখন অনাত্মীয়তার সম্পর্কে বদ্ধ হয় তখন তার বাহির ও অন্তর্জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। মালেকার অতিশাসিত, অস্বচ্ছলতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা, ক্লান্তিকরভাবে পুনরাবৃত্ত জীবনেই বস্তুজগৎ ও অন্তর্জগৎ সমভাবে গুরুত্বহীন। তার জীবনবাস্তবতার রূপবর্ণিমা তাই একমুখি। মালেকার অন্তর ও বাইরের পৃথিবীকে গল্পকার বর্ণহীনতায় ধারণ করেছেন।

বস্তুত, কোনো শিল্পরূপের অন্তর্গত চরিত্রের মনোভাব, আচার-আচরণ-উচ্চারণ, বাহির ও অন্তর্জগতের ক্রিয়াকর্মই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই সাহিত্যের ভাষাকে শুধু ব্যাকরণের শাসন মানলে চলে না। সাহিত্যের ভাষার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও তাই গল্পের অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীর জীবনাভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবনার্থ প্রকাশের জন্য উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্পময় অনুষঙ্গ, ইমেজ-রূপককে পরিচর্চিত করেই তাঁর *দুইতীর ও অন্যান্য গল্প*-এর ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ৫৪২-৪৬
২ দ্র! প্রাগুক্ত, পৃ ৫৪৭-৫০
৩ দ্র! প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫১-৫৫
৪ সীমাহীন এক নিমেষে'-র সন্ধান দানের কৃতিত্ব সৈয়দ আবুল মকসুদের
৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*-২ . পৃ ৪৮-৪৯
৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -রচনাবলী*-২ , পৃ ১৫৫
৭-৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭
৯-১০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩
১১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৪
১২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১
১৩ রোম্যানটিসিজমের উল্লেখযোগ্য চরিত্র-লক্ষণ হচ্ছে : হৃদয়-ধর্মের পরমমূল্যে বিশ্বাস হৃদয়-নিভৃতে জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত কোনো অনির্দেশ্য বেদনাবোধকে লালন, অতৃপ্তি ও নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি। দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আকরম হোসেন; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ৮১
১৪ শিশিরকুমার দাশ; এপ্রিল ১৯৮৭, *কবিতার মিল ও অমিল* , কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ ১০০
১৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২ , পৃ ১৫৮
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬০
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১
১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৪, *গল্পগুচ্ছ*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ ২৩৭
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৮
২০ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী-২ , পৃ ১৬১
২১ আনোয়ারের বক্তৃতায় বিবেকানন্দের 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, তোমার ভাই, তোমার রক্ত' ...স্মরণ করিয়ে দেয়
২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৩৫৫; পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫, যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়; *রবীন্দ্র-রচনাবলী*-২৬, কলিকাতা : বিশ্বভারতী, পৃ ৪৭৩
২৩ অরুণকুমার বসু; বৈশাখ ১৩৮৮, লিপিকা'র গদ্যভাষা : *বাঙলা গদ্যশৈলীবিজ্ঞান* (অরুণকুমার বসু সম্পাদিত) কলকাতা : সমতট প্রকাশনী, পৃ ১৫২
২৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২ , পৃ ১৬২
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৩
২৭ শিশিরকুমার দাশ; বৈশাখ ১৩৮৮, *সমান্তরালতা : বাঙলা গদ্যশৈলীবিজ্ঞান*, পৃ ২
২৮-২৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ- রচনাবলী-২ , পৃ ১৬৭
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০
৩২-৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৫

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৪
৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৩৩৬, নূতন সংস্করণ পুর্নমুদ্রন, বৈশাখ ১৩৮৯, *শেষের কবিতা*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পৃ ১২
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭
৩৭ অমলেন্দু বসু, *বাংলায় রম্যরচনা : সাহিত্য সংখ্যা দেশ* ১৩৯১, কলকাতা : আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেড, পৃ ৩৬
৩৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২ , পৃ ২৪৪
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৭
৪১-৪২ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৪
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৫-৬৬
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৭
৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *শেষের কবিতা*, পৃ ১৮
৪৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ২৭৬
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৮
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮০
৪৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী-২ , পৃ ৩৯২
৫০ রামেশ্বর শ', ১৯৮২, *আধুনিক বাংলা উপন্যাস : যুগ-পরিবেশ ও সামাজিক পটভূমি* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : উত্তরসূরি প্রকাশনী, পৃ ৬৪
৫১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; আশ্বিন ১৩৮৯, *কালের পুত্তলিকা*, কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, পৃ ৪৮৪
৫২ জগদীশ গুপ্তের গল্প-উপন্যাসে যুদ্ধক্ষত ও যুদ্ধ-উত্তর সমাজ-সংকটের ফলে সৃষ্ট মানুষের শূন্যতাবোধ, বিবিক্ত-চেতনা ও অনিকেত অনুভূতিই রূপায়িত হয়েছে : ' জটিল জীবনরহস্যের নিগূঢ় তাৎপর্য অন্বেষণে কথাসাহিত্যের যে একটি অনন্যসাধারণ ভূমিকা আছে, ...যুদ্ধোত্তর কালে কল্লোল-কালিকলমের লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে অল্পসংখ্যক যে কয়েকজনের সাহিত্য-সাধনায় তার নিশ্চিত সাক্ষ্য আছে, জগদীশচন্দ্র নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে কেবল অন্যতম ন'ন বিশিষ্ট একজন'
—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ১৩৮০, দে'জ সং ১৯৮৬, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ ৩১৫
৫৩ দুর্ভিক্ষকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে-সব গল্পে উপজীব্য করেছেন সেগুলি হচ্ছে : 'কালনাগ', 'বস্ত্র', 'হাড়', 'চিতা', 'কাক', 'স্বাক্ষর', 'টান' ইত্যাদি।
৫৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর যে-সব গল্পে মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাসমরকে প্রসঙ্গবদ্ধ করেছেন সেগুলি হচ্ছে : 'পুষ্করা', 'মৃত্যুবাণ', 'টোপ', 'ভোগবতী' ইত্যাদি।—
৫৫ কালের পুত্তলিকা, পৃ ৪৪৬
৫৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২ , পৃ ৫-৬
৫৭ Addison Hibbard: 1962 : Introduction : A Structural Appioach to Literature. New York : Holmon P 5
৫৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ৭
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৯
৬০ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; জানুয়ারি ১৯৮২, *রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমিকা*, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ ১৭৭

৬১ Herbert Read. Revised edn. 1968. Reprint 1986. *A Concise History of modern Art*. London . Thames and Hudson. P 133
৬২-৬৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২. পৃ ২৯-৩০
৬৪ Charles Rycroft. 1968. Reprinted 1979. *A Critical Dictionary of Psychoanalysis*. England : Penguin Books P 160
৬৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২ . পৃ ২৯-৩০
৬৬ মুনীর চৌধুরী: ১৯৭০. দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৭৫. *বাঙলা গদ্যরীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী. পৃ ৩৪-৩৫
৬৭ আঞ্চলিক ভাষার অভিধান [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (প্রধান সম্পাদক]; প্রথম খণ্ড. ১৯৬৫. দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৭৩. ঢাকা : বাংলা একাডেমী. পৃ ট
৬৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী-২ . পৃ ৩৬
৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৬০
৭০ প্রাগুক্ত. পৃ ১৫। মোটা-অক্ষর গ্রন্থকারের
৭১ প্রাগুক্ত. পৃ ১২। মোটা-অক্ষর গ্রন্থকারের
৭২ প্রাগুক্ত, পৃ ২০
৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ ২১
৭৪ প্রাগুক্ত. পৃ ২৩
৭৫ Alan Friedman. The Novel : *The Twenteeth Century Mind* (C B COX & A E Dyson ed.). Vol. I. London : oxford University Press, P 12
৭৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২. পৃ ৪১
৭৭ প্রাগুক্ত পৃ ৫১
৭৮ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৮১, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা : আশা প্রকাশনী, পৃ ৬৬
৭৯ William P. Scott: First Indian edition 1988. *Dictionary of Sociology*. Delhi : Goyl Saa B. P 9
৮০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ৬৯
৮১ প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
৮২ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*-২, পৃ ৪৮
৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪
৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪
৮৫-৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭
৮৭ সরদার ফজলুল করিম (সম্পাদিত), নভেম্বর ১৯৬৯, *আমাদের গল্প সাহিত্য : আমাদের সাহিত্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ২০৯
৮৮ মোতাহের হোসেন চৌধুরী; ফাল্গুন ১৩৬৫, *সংস্কৃতি-কথা*, ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী. পৃ ১৩৫-৩৭
৮৯ আবদুল মান্নান সৈয়দ: নভেম্বর ১৯৮৬, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ ৪৪
৯০ তানভীর মোকাম্মেল, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা*. ঢাকা : মুক্তধারা. পৃ ২৩
৯১ Cargo নামে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ইংরেজিতে গল্পটি প্রথম রচনা করেন। অতঃপর তা সৈয়দ শামসুল হক কর্তৃক অনুবাদিত হয়ে ত্রৈমাসিক *সংলাপ* (পৌষ -কার্তিক ১৩৬৮ / ১৯৬৯) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কালান্তরে গল্পটি গ্রন্থবদ্ধ করার সময় গল্পকার গল্পটির ব্যাপক পরিমার্জন করেন। দ্রষ্টব্য : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য*-১. পৃ ৭৩
৯২-৯৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২. পৃ ১১৪
৯৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ: *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*. পৃ ৫০

৯৫ অপ্রিয় ঘটনা, খোলা জায়গা, বন্ধ দরজা, রক্ত, খুন, একাকিত্ব ইত্যাদি সূত্রে ব্যক্তির মধ্যে এ-জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে মানসিক অসাম্য ব্যক্তিশরীরে প্রভাব বিস্তার করে। দ্রষ্টব্য: Fredrick Mears, Robert J Gathel : 1979, *Fundamentals of Abnormal Psychology*, Chicago : Rand Mc Nally College Publishing House, pp 45-48

৯৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ১৩০

৯৭ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'স্তন' গল্পের নামেই গ্রন্থটি পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'কিছু বাস্তব অসুবিধা', প্রচলিত সংস্কারকে বড়ো করে দেখে প্রকাশক ওয়ালীউল্লাহ্ প্রদত্ত নাম পরিবর্তন করেন। পরবর্তীতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তা সমর্থন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্-প্রকাশকের বক্তব্য স্মরণীয় :

> বই ছাপা শুরুর আগেই এবার আমি প্রচ্ছদ এঁকে পাঠাবার কথা বলে রাখলাম। … চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি 'কভার' এসে পৌঁছল। অধীর আগ্রহে আমি পার্সেলের মোড়ক খুলতে লাগলাম। মোড়ক খুলেই একটু ধাঁধায় পড়লাম বই-এর নামকরণ দেখে। তিনি তাঁর গল্পসংকলনের নাম রেখেছেন 'স্তন'। আমাদের দেশে প্রকাশিত একখানা বাংলা বইয়ের নাম 'স্তন' রাখা কতটা সংগত হবে, সমালোচকেরা কি বলবেন, অনুক্ষণ এ ভাবনা আমার মনে। ঠিক এ সময়ে দু'একদিন পরেই ভাগ্যক্রমে বাংলা একাডেমীতে দেখা পেলাম কবি সানাউল হক সাহেবের। গ্রন্থাকারের অপর এক বন্ধু তো সেখানে ছিলেনই। কথাটা পাড়তে বুঝতে পারলাম, চিঠিপত্রের মাধ্যমে বই-এর নামকরণের ব্যাপারে উভয়েই আগে থেকে জানতেন। তাঁরা উভয়েরই আমাকে সমর্থন করলেন। হেসে বললেন, ওঁকে আমাদের নাম করে চিঠি লিখে দিন, বই-এর সম্ভাব্য ক্রেতা বাঙালী মহিলা হলে তো কথাই নাই, পুরুষ হলেও দোকানে এসে এ নাম ধরে একখানা বই চাইতে লজ্জাবোধ করবে। …চিঠি লিখলাম, সুফলও পেলাম। বই-এর নাম পালটে করা হলো 'দুইতীর'।–মোহাম্মদ নাসির আলী: কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ অক্টোবর ১৯৭১

৯৮ আবদুল মান্নান সৈয়দ: *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ৬০

৯৯ শিবনারায়ণ রায়: জানুয়ারি ১৯৮৩, বিবেকী ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: *রবীন্দ্রনাথ, শেকস্‌পীয়র ও নক্ষত্রসংকেত*, কলকাতা : প্যাপিরাস, পৃ ১৫১

১০০ A Critical Dictionary of Psychoanalysis, P 133

১০১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ৬২

১০২ "এই পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্ততঃ এ বইয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পের কাহিনী ঘটে প্রধানতঃ মনোজগতে, দৃশ্যজগতে নয়; এবং এটা তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পের মানব-মানবীরা চিন্তা করে, গভীরভাবে চিন্তা করে, এবং চিন্তা করে বুদ্ধি দিয়ে যতোটা না, অনুভব দিয়ে তার চাইতে বেশী। তারা যতোটা ক্রিয়াশীল তার চাইতে বেশী চিন্তাশীল; এবং যতোটা চিন্তাশীল; তার চাইতে বেশী অনুভূতিপ্রবণ। তাঁর গল্পগুলি মূলতঃ চিন্তাস্রোত, ঘটনা-গ্রন্থন নয়।" —আবদুল হক, *মাহে-নাও*, ঢাকা : চৈত্র ১৩৭২

১০৩ আবদুল হক, প্রাগুক্ত, চৈত্র ১৩৭২

১০৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ৪৫

১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩

১০৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১০৭ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী-২, পৃ ৯৪

১০৮-০৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮

১১০ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭

১১২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩
১১৩ "...তার রচনারীতিতে কিছু কৃত্রিমতা পশ্চাদমুখিতা এবং এমনকি ভাষাগত অসাবধানতাও এনে দিয়েছে, সচেতন পাঠক মাত্রেরই যা নজরে পড়ে।"— *মাহে-নাও*, চৈত্র ১৩৭২
১১৪ পবিত্র সরকার; বৈশাখ ১৩৮৮, বাংলা গদ্যরীতি অনুধাবন; *বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা*, কলকাতা : সমতট প্রকাশনী, পৃ ৬৩
১১৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী-২ , পৃ ৬৯
১১৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬
১১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৯
১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৮১
১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৮০
১২০ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯
১২১ প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
১২২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৪
১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১
১২৪-১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৭০
১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৭১
১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯
১২৯-৩০ প্রাগুক্ত, পৃ ১১২
১৩১ "গূঢ় অনুভূতির অভিঘাতে, প্রবল আবেগের ধাক্কায় ভাষা পরিচিত অভিধা অতিক্রম করলেই জন্ম হয় একস্‌প্রেশনিজমের। স্বভাবতই ধ্বনাত্মক ও অনুকার শব্দ তখন স্রষ্টার আশ্রয় হয়।"—রবীন্দ্র-চিত্রকলা : *রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমিকা*, পৃ ২১৪-১৫
১৩২-৩৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-২, পৃ ১০৬
১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭
১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫
১৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬
১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮
১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪০
১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৯২
১৪০ Ediotns arise out to the contacts of daily life. They are be response of the human organism to the elements around it. They reflect the speed of life, the pressure of life, its very essence.— Herbert Read: 2nd edn. MCML-IV, *Collected Essays in Literary Criticism*, London : Faber & Faber, pp 55-56
১৪১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী–২, পৃ ১৩০
১৪২ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭
১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫
১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭
১৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১০১
১৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১১২
১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস

লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস *লালসালু* প্রকাশকালে প্রত্যাশিত পাঠকপ্রিয়তা ও সমালোচক-আনুকূল্য লাভে ব্যর্থ হলেও মাত্র বার বছরের ব্যবধানে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রকাশনা-সংস্থা 'কথা-বিতান' কর্তৃক *লালসালু*-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যাপক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ পর্বে সমালোচকেরাও *লালসালু*-র অপূর্বত্ব ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বরূপ অন্বেষায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মতে, লালসালু পূর্ববাংলার প্রথম ও 'শ্রেষ্ঠ উপন্যাস' আর এই শ্রেষ্ঠত্ব মূলত সমাজচিত্র, অবক্ষয়িত সমাজের আলেখ্য হিসেবে।[১] উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মজিদের মহব্বতনগরে আগমন, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য 'মোদাচ্ছের পীরের মাজার' ব্যবহার, গ্রামবাসীদের প্রতারিত করে মজিদের জোতজমি দখল, রহীমা ও জমিলাকে তার বিয়ে করা, ধর্মের প্রতি নিজে নিষ্ঠ না-হয়ে গ্রামবাসীদের চিত্তে কৌশলে ধর্মভাব জাগিয়ে তাদের শাসন ও শোষণ করা ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ জাতীয় বক্তব্যের আপাত সমর্থনও খুঁজে পাওয়া যায়।[২] পাঁচ ও ছয় দশকের সাহিত্য-বিবেচনা হিসেবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়ও। কিন্তু গভীরতর মূল্যায়নে তা সীমাবদ্ধ, এবং নিতান্তই উপরি-স্তরের। কেননা মহৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রই স্তরবহুল ও বহুমাত্রিক। তা ছাড়া এমন একটি সহজ ও একমুখি প্রতিপাদ্যের জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু* রচনা করেননি। কোনো প্রকার খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে তিনি মজিদকে দেখেননি। একটি দৃঢ় নির্দিষ্ট সমাজ-কাঠামো, আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির হয়ে ওঠার প্রকরণ, তার সামগ্রিক জীবন-প্যাটার্নের আলোকেই তিনি মজিদকে উপলব্ধি করেছেন। অন্য কথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মজিদ কোনো বিচ্ছিন্ন, একক সত্তা নয়, বিশেষ আর্থ-সামাজিক কাঠামো-সৃষ্ট নির্বিশেষ মানুষেরই সে প্রতিনিধি। আর তার চরিত্রের এই বিশেষ স্বরূপটি নির্মাণের জন্যই লেখক তাকে বিচিত্র বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অথচ অনিবার্য দেশ-কাল ও সমাজসংলগ্ন করে সৃষ্টি করেছেন।

মজিদ এমন এক এলাকার অধিবাসী যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' আবাদযোগ্য জমি থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় তা নিতান্তই স্বল্প।

আবার খরা, অতিবৃষ্টিতে জমির ফসল বিনষ্ট হয়, নদীর তোড়ে বিলীন হয় আবাদযোগ্য জমি। এ অবস্থায় এলাকার অধিকাংশ মানুষ নিরন্ন, ক্ষুধা দারিদ্রের শিকার। বাস্তবের এই অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তির বেদনা ভোলার জন্য তারা প্রত্যাবর্তন করে ধর্মের মোহন জগতে; মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু উদ্‌গমের পূর্বেই তারা আমসিপারা পড়ে, কোরানে হাফেজ হয়। কিন্তু 'খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে।' আর কেতাবের অক্ষরগুলি 'কোন এক বিগত যুগের চড়ায় পড়ে আটকে' থাকে। 'এরা তাই দেশ ত্যাগ করে', দূর-দূরান্তে গিয়ে নানা পেশায় নিয়োজিত হয়। অনেকে যায় আরো দূরে 'বাহে মুলুকে নয়াত মনিদের দেশে'। অর্থাৎ, অসমভাবে বিকশিত সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় নিমজ্জিত সত্তা হয়ে নিঃশেষিত হওয়া মজিদের অভিপ্রেত ছিল না। তাই সে উপস্থিত হয়েছে 'গারো পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল— সেখানেও।' কিন্তু অভিপ্রেত প্রতিষ্ঠা মজিদ এ জনবিরল অঞ্চলে পায়নি। তাই দূরে জঙ্গলে যখন বাঘ ডাকে, ' হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে' তখন মজিদের 'চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্য।'[২]

অকস্মাৎ এই বন্ধুর, কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় জনৈক শৌখিন সরকারি কর্মচারী শিকারে এলে মজিদ আশাবাদী হয়ে ওঠে, তার নিঃসঙ্গ ও বন্য জীবনে জাগে চাঞ্চল্য। অতঃপর হাওয়াশূন্য, নিরাকপড়া এক স্তব্ধ দুপুরে মজিদ উপস্থিত হয় মহব্বতনগরে। জীবন-অভিজ্ঞ মজিদ দেখেছে যে, সাধারণ ঘটনা সাধারণের কাছে ততেব আলোড়ন সৃষ্টি করে না। গ্রামের মানুষদের জীবন নিস্তরঙ্গ, ক্লান্তিকরভাবে পুনরাবৃত্ত বলে তারা 'নাটকেরই পক্ষপাতি।' মজিদও সরাসরি জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে গ্রামে আসেনি। মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে সে মহব্বতনগরে প্রবেশ করেছে।

মজিদ এতোকাল যে-স্বচ্ছল জনপদ, উর্বর এলাকার জন্যে উৎকর্ণ, সতৃষ্ণ ছিল মহব্বতনগরে সে তা প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে। মজিদ দেখেছে, 'গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরায় ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লীর গলা আকাশে ভাসে না।' এমন সরল, প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে-ওঠা গ্রামবাসীদের ভাবধর্মী কোনো আবেগে চালিত, শৃঙ্খলিত ও মোহবদ্ধ করতে পারলে তাদের শোষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জন সহজ ও অবারিত হয়। কৌশলী ও তীক্ষ্ণধী মজিদ সে-সুযোগই গ্রহণ করেছে। মহব্বতনগরের উপকণ্ঠে, বাঁশঝাড়ের অপর প্রান্তের পুকুরপাড়ে একটি পরিত্যক্ত কবর আবিষ্কার ও গ্রামবাসীদের তা নির্দেশ করে সে বলেছে :

> আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?[৩]

সেই সঙ্গে মজিদ আরো বলেছে যে, গারো পাহাড়ের নির্জন এলাকায় সে সুখেই ছিল। হঠাৎ একদিন মোদাচ্ছের পীর কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সে মহব্বতনগরে এসেছে।

সামন্ত শক্তির প্রতিনিধি খালেক ব্যাপারী, কিংবা নির্মজ্জিত অস্তিত্বের সাধারণ মানুষ, কারো কাছ থেকেই মজিদ কোনো রকম প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়নি। তার আঘাতে অভিপ্রেত ফল লাভ হয়েছে। মজিদের 'আগমনে চমকিত' গ্রামবাসীরা 'নিজেদের নিবুদ্ধিতা' সম্পর্কে সচেতন ও 'অনুশোচনায় জর্জরিত' হয়েছে। আশি বছরের বৃদ্ধের মধ্যেও জেগেছে ভয়, পূর্বকৃত কর্মের অনুতাপ। বস্তুত, আত্মপ্রতিষ্ঠা, মানবীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ ধর্মের আর্কে-টাইপকেই গ্রহণ করেছে।

মহব্বতনগরে আগমনের পূর্বপর্যন্ত মজিদ দ্বন্দ্বময়, ভীত, দোলাচলে বিচলিত। কারণ সে জানে, জীবনের প্রয়োজনে যে-খেলা সে খেলতে যাচ্ছে তার ফল শুভ নাও হতে পারে। কিন্তু স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার অধিকার তার আছে, বৈরিতাকে মেনে নিয়ে অসহায়ের মতো নিরস্তিত্ব হতে সে চায় না।

বস্তুত, মহব্বতনগরের অধিবাসীদের মধ্যে খোদাভীতি ও খালেক ব্যাপারী-ভীতি সঞ্চারিত করতে মজিদ ব্যর্থ হয়নি। অচিরকালেই তাই জঙ্গল সাফ হয়, ইট, সুরকি-সালু কাপড়ে পরিচর্চিত হয়ে জরাজীর্ণ, অজ্ঞাত ও অপরিচিত কবরটি হয়ে ওঠে মোদাচ্ছের পীরের মাজার। স্মরণীয়, আরবি 'মোদাচ্ছের' শব্দের অর্থ অজ্ঞাত, অপরিচিত, ঠিকানাহীন। কিন্তু গ্রামবাসীরা মজিদ-কথিত 'মোদাচ্ছের পীর'-এর অর্থও বোঝেনি।

কবরের চাকচিক্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধির সঙ্গে মজিদের জীবনে লক্ষণীয় ও গুণগত পরিবর্তন আসে। তার জোত-জমি হয়, ঘরবাড়ি ওঠে, বাইরের ঘর, আওয়াল ঘর আর এভাবেই অনিকেত, উন্মুলিত, বিপন্নসত্তা মজিদ বিত্ত-বৈভবের অধিকারী, 'স্বচ্ছলতায় শিকড়-গাড়া বৃক্ষ', মহব্বতনগরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠে। গ্রামে তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য, প্রগাঢ়; গ্রামের সংস্কার-পুনর্গঠনে মজিদ অপরিহার্য।

খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জিত এবং মানবীয় অস্তিত্ব রক্ষিত হলে মজিদ উপনীত হয়েছে উপভৌগিক স্তরে। মজিদ 'অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিলো। ... দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিলো। শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা।[৪] কিন্তু রহীমার সঙ্গে বিবাহিত জীবনে মজিদ ছিল অসুখী, অন্তরে অতৃপ্ত। কারণ, রহীমা মজিদকে কেবলই ভয় পায়, শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। তার কাছে মজিদ যতো-না স্বামী তার চেয়েও বেশি খোদাভক্ত পীর, কামেল- দরবেশ: আসলে সে [রহীমা] ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।'[৫]

বস্তুত, ন্যূনতম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মজিদ সমাজবিচ্ছিন্ন ও দায়িত্ববিশ্লিষ্ট হয়ে নিজের উপভৌগিক চেতনাকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। মজিদ বুঝেছে: জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-

যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখ ?[৬] আর এই পর্যায় থেকেই প্রকৃত অর্থে সে অগ্রসর হয়েছে শঠতার পথে। কেননা, অন্যায়ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে মজিদ যা অর্জন করেছে তা হারানোর ভয়ই তাকে সর্বক্ষণ ছায়ার মতো তাড়িত করেছে।

মহব্বতনগরের চৌম্বক ব্যক্তিত্ব মজিদকে গ্রামের লোকেরা ভয় পায়। স্ত্রী রহীমাও তার প্রতি লালন করে অনপনেয় ভীতি। কিন্তু সে ঈশ্বর, সমাজ ও পরিচয়-বিচ্ছিন্ন। আর তার এই নৈঃসঙ্গ্যবোধ এক সন্ধ্যায় প্রবল রূপ ধারণ করে। বাতাসে 'রূপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টা উল্টিয়ে' গেলে। সে-দৃশ্য মজিদকে চমকিয়ে দেয় : 'যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিলো, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উল্‌টানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে।' ফলে সে সঙ্গ চায়, উত্তরাধিকার দাবি করে। স্ত্রী রহীমার কাছেও মজিদ তার সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে: 'বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকতো!'[৮] নিঃসন্তান রহীমা 'হাসুনিরে পুষ্যি' রাখার কথা বলে। কিন্তু মজিদ তা চায় না। স্ত্রীর সন্তান বাৎসল্যকেই সে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে বলে: 'নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে?'[৯] অভিজ্ঞ মজিদ জানে এ-ক্ষেত্রে একাকী অগ্রসর হওয়ার চেয়ে স্ত্রীর সম্মতিতে এগিয়ে যাওয়াই অধিক নিরাপদ। অতঃপর একদিন 'অসম্ভব দ্রুততায়' কিশোরী জমিলার সঙ্গে মজিদের বিয়ে হয়। বস্তুত, জমিলাকে বিয়ের মাধ্যমে মজিদের বংশলতিকাগত সামূহিক নির্জ্ঞান সত্তা (collective unconscious)-রই প্রকাশ ঘটেছে।

জমিলাকে বিয়ে করা মজিদের জীবনে এক মারাত্মক ভুল। 'কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। ... একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার।'[১০] দীর্ঘজীবনে মজিদ কখনো এমন হাসি শোনেনি। রহীমা হাসে অস্ফুটে, আর মাজারে যারা আসে তারা 'দুঃখ-বেদনা বরফ গলা নদীর মত হু হু করে' কেবলই কাঁদে। জমিলার হাসি শুনে মজিদ তাই চমকিত, বিমুগ্ধ মানুষের মতো স্তব্ধ হয়। ক্রমান্বয়ে জমিলার আরো পরিচয় মজিদ লাভ করে যা তার যুগপৎ অপরিচিত ও অভাবিত। জমিলার নামাজ পড়তে ভুল হয়, সেজদায় গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে, পর্দাহীনভাবে বাইরে যায়, কখনো উত্তেজিত হলে মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করতেও জমিলার বাধে না। প্রথম স্ত্রী রহীমার 'উজ্জ্বল চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া' দেখেছে মজিদ। মহব্বতনগরের অধিবাসীরাও 'রহীমার অন্য সংস্করণ'। 'বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।'[১১] কিন্তু জমিলার সত্তা-স্বরূপ ভিন্ন। ঈশ্বরের ভয় ('ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা'।)[১২] মানুষের ভয় অর্থাৎ, মজিদভীতি ('সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই– মানুষের ভয় তো দূরের কথা'।)[১৩], মাজার ভীতি—এই ত্রয়ী ভীতির

কোনোটিই জমিলার মধ্যে নেই। তাই জমিলাকে কাছে, নিজের একান্ত সান্নিধ্যে পেয়েও 'ক্ষুদ্র লতার মত মেয়েটির প্রতি ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে' ওঠে মজিদের। উপভৌগিক অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে মজিদ মুখ্যত দু-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম রূপে সে অভিজ্ঞ, প্রত্যুৎপন্নমতী, সংযত ও সূক্ষ্ম কৌশলে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনতে সিদ্ধহস্ত। তাহের কাদেরের বাপ, আমেনা বিবি, আক্কাসের প্রতি আচরণের মাধ্যমে তার এই পরিচয়ই হয়েছে অভিব্যক্ত।

দ্বিতীয় রূপে সে ক্রুর, প্রায় বিকৃতমস্তিষ্ক, অনেক ক্ষেত্রে পাষণ্ড, স্থূল, এমনকি শক্তি প্রয়োগেও দ্বিধাহীন। আওয়ালপুরের পীর ও জমিলাকে আশ্রয় করেই তার এই বিশেষ ব্যক্তিস্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

তাহের-কাদেরের বাপ মজিদের পীরত্বে অবিশ্বাস করলে সে তাকে ক্ষমা করেনি। মজিদেরই কৌশলে এক ঝড় জলের রাতে তাকে চিরদিনের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তার চোখেও মজিদ খোদার ভয় দেখেছে। আমেনা বিবিকে মজিদ পরাভূত করেছে অনুত্তেজিত থেকে, খালেক ব্যাপারীর মধ্যেও জাগিয়েছে খোদার ভয়: 'পানি-পড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোন কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মত সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।'[১৪] বস্তুত, মজিদের পীরত্বে অবিশ্বাস করেই স্বামীর প্রতি দিগ্দর্শন যন্ত্রের মতো বিশ্বস্ত থেকেও অবিশ্বস্ততার অনপনেয় কলঙ্ক মাথায় নিয়ে আমেনাকে 'চিরদিনের জন্যে' বাপের বাড়ি যাত্রা করতে হয়েছে। আক্কাসকেও মজিদ পরাভূত করেছে কৌশলে, তার স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে অর্বাচীন বালকের কাজ প্রমাণ করে। কিন্তু আওয়ালপুরের পীরের ক্ষেত্রে তাকে আরো সচেতনতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়েছে। এই একবারই মজিদ তীব্র প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছে। কেননা, পার্শ্ববর্তী আওয়ালপুরে নতুন পীরের আগমন ঘটলে, তার রুহানি ও তাকতের কথা প্রচারিত হলে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে ভিড় কমে আসে। অনেকেই হয়ে পড়ে আওয়ালপুর-অভিমুখি। মজিদ বুঝেছে, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তার পীরত্ব লোপ পাবে, তাকে আবার 'ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা'-য় পরিণত হতে হবে। মহব্বতনগরের অধিবাসীদের আচরণে তাই সে হয় ক্ষুব্ধ, ব্যথিত। এক-সময় ভাবে: '…এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান' দেবে। 'একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা- হা করে গগন বিদীর্ণ করে।'[১৫]

অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই মজিদ উপস্থিত হয়ছে আওয়ালপুরে এবং 'ক্ষ্যাপা কুকুর'-এর মতো তীক্ষ্নতায় নামাজ-পড়া লোকগুলির উদ্দেশে বলেছে:

> যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা![১৬]

অর্থাৎ, নতুন পীরের নির্দেশে আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া যায় না। আর এভাবেই সে উপস্থিত জনতার মধ্যে খোদার ভয় জাগ্রত ও পরিস্থিতিকে তার অনুকূলে চালিত করেছে। সেই সঙ্গে পরাজিত করেছে আওয়ালপুরের পীরকে। লক্ষণীয়, যখনই

মজিদের অস্তিত্ব বিপন্ন, তার প্রতিষ্ঠা হুমকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা. সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই মজিদ হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর, নির্মম ও প্রতিশোধকামী আর সেই প্রবাহ যাদের মাধ্যমে এসে মজিদকে স্পর্শ করেছে, তাদের কাউকেই সে ক্ষমা করেনি।

জমিলার মধ্যেও মজিদ খোদার ভয় জাগ্রত করতে চায়: 'তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।'[১৭] আর এ-ক্ষেত্রে সার্থকতা অর্জিত হলেই মজিদ জমিলার ভালোবাসা ও নিঃশর্ত আনুগত্য লাভ করবে। অতঃপর শুরু হয় জমিলার শিক্ষা। প্রথমে রহীমাই জমিলাকে পাঠ দেয়, তার অন্তরে খোদা, মাজার ও মজিদ-ভীতি সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু রহীমার প্রচেষ্টা হয় ব্যর্থ। মজিদ কোনো বিরোধিতাকে সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। নিজের হাতেই সে তার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতেও তার বাধে না। এক ঝড়-জলের রাতে মজিদ তাই জমিলাকে চূড়ান্ত শিক্ষা দান, তার মধ্যে খোদা, মাজার ও স্বামী-ভীতি সৃষ্টির লক্ষ্যে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে নিয়ে যায় ও কোরবানির পশুর মতো তাকে খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। এ পর্বে জমিলার উদ্দেশে নিবেদিত মজিদের মনোকথন স্মরণীয় :

> ··· দেখবা তোমার দিলে ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে. মনে আর শয়তানি নাই।[১৮]

কিন্তু মজিদ সফল হয়নি। 'লালকাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে' জমিলা পড়ে থাকে। তার 'চোখ বোজা, ···আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে' থাকে। তাহের-কাদেরের বাপের মাধ্যমে যার সূচনা. আমেনা-আক্কাসের মাধ্যমে যার ঘনায়মান রূপের প্রতিষ্ঠা—জমিলার মাধ্যমে,' মোদাচ্ছের পীরের মাজারে তার মেহেদি রঞ্জিত পদপাতের ভেতর দিয়ে সেই প্রচেষ্টা লাভ করেছে চূড়ান্ত সাফল্য। জমিলার কাছেই ঘটেছে মজিদের সর্বাত্মক ও সামূহিক পরাজয়। এখন সে একা, মহব্বতনগরে 'স্বচ্ছলতায় শিকড়-গাড়া বৃক্ষ' হয়েও আত্মিকভাবে উন্মূলিত ও অনিকেত।

বস্তুত. মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদি রঞ্জিত পদপাত প্রতীকী তাৎপর্যে বিশিষ্ট। আর এর মাধ্যমে যে-বিশেষ ও মৌলিক বক্তব্যসহ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপস্থিত তা হচ্ছে: অসমভাবে বিকশিত সমাজ-ব্যবস্থায়, শঠতা–মিথ্যাচার ও সীমাহীন ফাঁকির মধ্য দিয়ে মজিদ-রূপ যে-বিষবৃক্ষ শিকড়ায়িত হয় ও পত্র-শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তাকে উৎপাটিত করতে হলে বনস্পতির নিচে অসহায়ভাবে বেড়ে-ওঠা লতাগুল্ম অর্থাৎ, সাধারণ. বিপন্ন অস্তিত্বের নির্জীত মানুষদের অবশ্যই সর্বভয় এবং পরিণামভীতি শূন্য হয়ে জাগরিত হতে হবে। বলা যায়, এই বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ, অনিবার্য প্রতিপাদ্যে উপনীত হওয়ার প্রয়োজনেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু*–র পরিকল্পনা, এর কাহিনী ও চরিত্রসমূহ নির্মাণ করেছেন। উপন্যাস হিসেবে *লালসালু* তাই স্তরবহুল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজ-অনুধ্যান ও তাঁর দার্শনিক চৈতন্যের শিল্পিত আলেখ্য, রূপকল্প ও অভিজ্ঞান।

লালসালু-র মধ্যবর্তী চরিত্র[১৯] (intermediate character) খলেক ব্যাপারী, আমেনা বিবি, তাহের-কাদেরের বাপ, রহীমা, জমিলা, হাসুনির মা প্রভৃতি—এ উপন্যাসের বহির্বাস্তবতা নির্মাণে ও তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য প্রমাণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারা উপন্যাসের গ্রামীণ বাস্তবতাকেই সংকেতায়িত, একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোকেই প্রতিষ্ঠা দান করেছে। সে-অর্থে মজিদকে সত্যস্বরূপে নির্মাণের জন্যই উপন্যাসে তাদের অবতারণা, পদপাত ও রূপায়ণ। লক্ষণীয়, মধ্যবর্তী চরিত্র-সৃষ্টিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অত্যন্ত সংযত ও গভীর পরিমিতিবোধ সম্পন্ন। এ জাতীয় চরিত্র-রূপায়ণে কোথাও তিনি ঘটনাকে অতিরঞ্জিত কিংবা দীর্ঘায়িত করেননি। রেখাভাসে কখনো প্রকৃতির বিশেষ পরিচর্যার সাহায্যে আবার কখনো ঘটনামধ্যে গীতময় আবহ সৃষ্টির মাধ্যমেই এ-সব চরিত্রের বাহির ও অন্তর্বাস্তবতাকে তিনি সংকেতায়িত করেছেন। *লালসালু*-র মধ্যবর্তী চরিত্রসমূহ তাদের অন্তস্তল-উৎসারিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্রোত-প্রতিস্রোতসহ উপন্যাসে উপস্থিত, বাস্তব ও প্রাণময়।

খালেক ব্যাপারী মহব্বতনগরের সবচেয়ে অবস্থাবান ব্যক্তি। গ্রামের লোকেরা তাকে ভয় পায়। কিন্তু সে-ভীতি মজিদকে ভয় পাওয়ার মতো নয়। খালেক ব্যাপারী-ভীতি একান্তই সমাজবাস্তবতা সৃষ্ট। সাধারণ, বিপন্ন অসহায় মানুষেরা যেভাবে বিত্তবানকে, দুর্বল যেভাবে সবলকে ভয় পায়, সেভাবেই মহব্বতনগরের অধিবাসীরা খালেক ব্যাপারী-প্রসঙ্গে এক নীরব ভয়কে লালন করে। মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর উদ্দেশ্য অভিন্ন, গ্রামবাসীদের শাসন ও শোষণ করা। কিন্তু তাদের পদ্ধতি ভিন্ন: 'এক জনের আছে মাজার আর একজনের আছে জোতজমি, প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না-হলেও তারা একট্টা, পথ তাদের এক।'

একজন সামন্ত প্রভুর মতোই মহব্বতনগরে খালেক ব্যাপারীর অবস্থান: গ্রামের বিচার, শিক্ষা-সংস্কার কিংবা সেবাকর্ম তাকে কেন্দ্র করেই হয় পরিচালিত। ব্যাপারীর মুখ দিয়েই তাহের-কাদেরের বাপের বিচারের রায় ঘোষিত হয়। যদিও মজিদই তার আসল বিচারক। মোদাচ্ছের পীরের মাজারে দামি চাদর সে-ই প্রতিবছর বদলিয়ে দেয়, প্রস্তাবিত মসজিদের নির্মাণ খরচের সিংহভাগ নিজেই বহন করে। আক্কাসকেও খালেক ব্যাপারী 'ধমক' দিয়েছে : 'হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।'[২০]

বাইরে স্বচ্ছল, সার্থক বলে মনে হলেও খালেক ব্যাপারীর অন্তরে সুখ নেই। স্ত্রী আমিনার ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়েই পরোক্ষে সে মজিদের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। আমেনার সন্তান-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই সে শ্যালক ধলা মিঞাকে আওয়ালপুরের পীরের পানি পড়া আনতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তা গোপন থাকেনি। মজিদ অতঃপর তার পীরত্বে অবিশ্বাসী আমেনাকে ক্ষমা করেনি। কিন্তু সে-শাস্তি শুধু আমেনাকে নয়, খালেক ব্যাপারীকেও স্পর্শ করেছে। 'তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে' ব্যাপারী সেই স্ত্রীর 'জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে,

ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না।'[২১] তৎসত্ত্বেও ব্যাপারী এই ভেবে 'মনস্থির' করে যে, 'খোদার কাছে কোন ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন।'

বস্তুত, খালেক ব্যাপারীর ব্যর্থতা অন্তরের সত্যকে ব্যক্তিত্বে জাগরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে না-পারারই ব্যর্থতা। তার হৃদয়ক্ষরণ, অন্তরঙ্গ রক্তপাত তারই ব্যক্তিত্ববর্জিত আচরণ ও ব্যক্তিস্বরূপের অনিবার্য পরিণতি। ব্যাপারীর আমেনাকে তালাক দেওয়ার ঘটনা আমাদের সমাজ-সত্য, সামান্য কারণে মুহূর্তের উত্তেজনা ও অন্যের কথায় স্ত্রী-ত্যাগ গ্রামীণ জীবনেরই বাস্তবনিষ্ঠ পরিচয়। খালেক ব্যাপারী-আমেনা বিবির উপকাহিনী তাই বিচ্ছিন্ন নয়, মহব্বতনগরের লোকজ জীবন, তাদের সংস্কার, কুসংস্কার ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গেই তা প্রসঙ্গবদ্ধ। তাদের ট্র্যাজেডি মজিদের পরিণামী নিঃসঙ্গতার পূর্বাহ্নিক সংকেত, পরোক্ষ ইংগিত।

তাহের-কাদেরের বাপ মহব্বতনগরের এক সাধারণ নিম্নবিত্তের কৃষক। কিন্তু তার স্বভাব স্বতন্ত্র, জীবনাদর্শ ব্যতিক্রম, অন্যান্য গ্রামবাসী থেকে পৃথক। প্রথম জীবনে কিছুটা সুখ ও স্বচ্ছলতার মুখ দেখলেও জীবনের উপান্তে পৌঁছে তার মনঃকষ্টের অন্ত নেই। বৃদ্ধা স্ত্রী তাকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এক পর্বে এমন এক কথা বলেছে যার সঙ্গে তার সন্তানদের জন্মপ্রসঙ্গ জড়িত। অন্যদিকে পিতামাতার এই নিত্য কলহ, কন্যা হাসুনির মা-র ভালো লাগেনি। রহীমার মাধ্যমে মজিদের কাছে তাই সে দোয়া চেয়েছে যে, তাড়াতাড়ি যাতে তার মৃত্যু হয় : 'ওনারে কন, খোদায় জানি আমার মওত দেয়।'

মহব্বতনগরের কোনকিছুই মজিদের কাছে গোপন থাকে না। রহীমার মারফত তাহের-কাদেরের বাপের কথা মজিদ জানতে পারে। অতঃপর একদিন সে তাকে বলে: 'তোমার বিবি কী কয়' ?[২২] কিন্তু তাহের-কাদেরের বাপের আত্মসম্মানবোধ প্রখর। সে তাই বলে : ' তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই।' তাহেরের বাপ বুঝেছে, মজিদ 'অন্তরের শক্তি দিয়ে ব্যাপারটি জানেনি'। কন্যা হাঁসুনির মা-ই তা মজিদকে বলেছে। যে-কথা গভীর লজ্জার, অপার আত্ম-অসম্মানের তা যে কাউকে বলতে নেই, নির্বোধ মেয়ে তা বোঝেনি। কাদেরের বাপ তাই হাসুনির মাকে প্রহার করেছে। কিন্তু গভীরতর বিবেচনায় এ প্রহার মজিদকেই করা হয়েছে। তাই তারই চক্রান্তে কোনো অপরাধ না-করেও কাদেরের বাপকে শাস্তি পেতে হয়েছে আর সেই মনোবেদনা, অন্তর্যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে সে হয়েছে আত্মঘাতী। এভাবেই শ্রেণীবিভক্ত, মজিদ-খালেক ব্যাপারীদের শাসনাধীন সমাজে সবলের সঙ্গে বিরোধে সর্বকালেই দুর্বল হয়েছে উৎপীড়িত।

বস্তুত, মজিদ-চরিত্রকে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা দান, সার্থকভাবে নির্মাণের প্রয়োজনে সৃষ্ট হলেও তাহের-কাদেরের বাপ সমাজের সেই বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে যেখানে সব লোককে শৃঙ্খলিত, অনুকূলে পরিচালিত করা যায় না। সব সমাজই নানামুখি বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন জীবনাদর্শে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত। মহব্বতনগরও এর ব্যতিক্রম নয়।

মজিদের পরই উপন্যাসে দীর্ঘ পরিসর জুড়ে রহীমার উপস্থিতি। স্বামী তার কাছে একটি আইডিয়া, মোদাচ্ছের পীরের মাজারেরই প্রতিনিধি। ফলে দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কখনোই সে স্বামীর সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হয়ে উঠতে পারেনি। মজিদের কাছে থেকে রহীমা সবসময়ই একটি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছে। তৎসত্ত্বেও মজিদের জীবনে 'রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মত অটল', তার 'আনুগত্য ধ্রুবতারার মত অনড়।' কিন্তু একবার তা মজিদের 'আড়ালে চলে যায়।' প্রাকৃতিক দুর্যোগময় রাতে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে মজিদ জমিলাকে বেঁধে রাখলে স্বামীর সে-আচরণ রহীমা সমর্থন করেনি। এতোকালের আনুগত্য দীর্ণ করে সে মজিদকে বলেছে: ' আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।'[২৩] রহীমার এ জাগরণের মূলে রয়েছে তার সুপ্ত মাতৃত্ব। মজিদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের যে-'যোগসূত্র' রহীমা, মজিদের স্ত্রী হিসেবে গ্রামের সবার কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী যে-রহীমা সেই রহীমার 'সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে।'[২৪] 'হাসুনিরে পুষ্যি' রাখার ইচ্ছার মাধ্যমেও তার এই মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ ঘটেছে। অতঃপর সতীন হলেও জমিলাকে আশ্রয় করে তার সেই অচরিতার্থ ইচ্ছেই হয়েছে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুত, মজিদের আত্মপ্রতিষ্ঠায়, মহব্বতনগরে তার শিকড়ায়িত হয়ে-ওঠার নেপথ্যে সবচেয়ে সহযোগী শক্তি রহীমা। একান্ত কাছ থেকে, স্বামীর সর্ব-আদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেই সে মজিদকে হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। রহীমাই মজিদের ঊষর ও নীরক্ত জীবনের পরম ও সর্বশেষ আশ্রয়, সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা। জমিলার কাছে পরাভূত, সব থেকে এবং মহব্বতনগরের অধিবাসীদের মধ্যে বাস করেও মজিদ যখন অন্তরে একা, নিঃসঙ্গ তখন তাকে ফিরে আসতে হয়েছে রহীমারই কাছে।

জমিলার আবির্ভাব উপন্যাসের মধ্যপর্বে। দ্বিতীয় বিয়ের আগে একদা মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বলেছিল: 'ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে।'[২৫] জমিলাকে বিয়ে করার অব্যবহিত পরও মজিদের সে-ধারণাই বর্তমান ছিল। তার মনে হয়েছে মেয়েটি 'যেন ঠিক বিড়াল ছানা' এবং 'খোদাকে কেন সবকিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।'[২৬] আর জমিলাকে পেয়ে রহীমার মধ্যে 'শাশুড়ির ভাব জাগে।' ফলে সে সারাক্ষণ জমিলাকে 'স্নেহকোমল চোখে' দেখেছে ও 'আদর যত্ন করে' তাকে খাইয়েছে। জমিলা-প্রসঙ্গে রহীমার প্রাথমিক ধারণা : 'এক রত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।'[২৭] প্রথম স্বামিগৃহে এসে জমিলাও রহীমাকে তার 'শাশুড়ি' ভেবেছিল আর মজিদকে তার মনে হয়েছিল ; 'তানি বুঝি দুলার বাপ।' কিন্তু অচিরেই জমিলা ভিন্ন স্বভাবে ও ব্যক্তিত্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। যখনই তার মনে হয়েছে 'সে যেন খাঁচায় ধরা পড়ছে' তখন থেকেই পিঞ্জর ছিন্ন করে মুক্ত, স্বাধীন দিগন্তে শ্বাস গ্রহণের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। শেষপর্যন্ত তারই জয় হয়েছে। তার সর্বভয় এমনকি পরিণামভয় শূন্য আচরণ মজিদের অন্তর্লোকে এমন এক ধসের সৃষ্টি করেছে যা কোনো বৃহৎ পর্বতের ফাটলের চেয়েও ভয়াবহ।

জমিলা বহুবিবাহ প্রথার বলি। কিন্তু সামজের নিষ্ঠুর নিয়মের প্রতি সে নিষ্ঠ নয়। নিজের অবস্থার জন্য বেদনাহত, অন্তর্যন্ত্রণায় অস্থির হয়েই জমিলা সবকিছুর বিরুদ্ধে হয়েছে প্রতিবাদী, পরাভূত করেছে মজিদকে, ব্যঙ্গ করেছে মজিদ-খালেক ব্যাপারীর সমাজকে।

হাসুনির মা এক অকাল বিধবা ও সন্তানসহ পিতৃগৃহে আশ্রিতা। কিন্তু তার পিতা অস্বচ্ছল, নিম্নবিত্তের বিপন্ন মানুষ। জীবনের প্রয়োজনেই মজিদের বাড়িতে তাকে কাজ করতে হয়। তার জীবনের কঠোরভাবে সংগ্রামশীল, উপেক্ষিত ও মানবিক অধিকার বঞ্চিত রূপের অন্তরালে জৈবিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত। ছোট ভাই রতন তাকে ' নিকা' করার কথা বললে তার অন্তর 'খুশিতে টলমল' করে উঠেছে। অন্যদিকে তারই অনুষঙ্গে জাগ্রত হয়েছে মজিদের অবচেতন মনের লিবিডো চেতনা। হাঁসুনির মা বিরলদৃষ্ট নয়, গ্রামীণ সমাজের সে এক অতিপরিচিত নারী, বেদনাভারনত জীবনেরই বাস্তব প্রতিনিধি। *লালসালু*-র তাহের-কাদের, তাদের ছোটভাই রতন, দুদু মিঞা, আওয়ালপুরের পীর, মুতলব মিঞা, ধলা মিঞা, মোদাব্বের মিঞা, আব্বাস, ভানু বিবি প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষিতের (background) চরিত্রের মাধ্যমেই নির্মিত হয়েছে এ উপন্যাসের অব্যর্থ বস্তুকাঠামো, আভ্যন্তর অবয়ব।

মজিদের নাটকীয় আগমনের প্রথম দ্রষ্টা তাহের-কাদের। নিরাকপড়া দুপুরে ধানক্ষেতে তাদের মাছ শিকার মহব্বতনগরের গ্রামীণ জীবনের গভীরতারই ইংগিতবহ। পিতা–মাতার দ্বন্দ্বে তাদের বাপের পক্ষ অবলম্বন গ্রাম্য স্বার্থবুদ্ধি জাত, তাদের পিতৃসম্পত্তি-লোভী চৈতন্যেরই প্রকাশ। রতন তাহের–কাদেরের সমগোত্র, সহোদর হলেও বোন হাসুনির মা-র সঙ্গে তার সম্পর্ক অগ্রজদের তুলনায় সহজ ও স্বচ্ছন্দ। হাসুনির মা-র প্রতি রতন সহানুভূতিশীল ও মমতাময়।

দুদু মিঞা সর্বাংশেই অপ্রতিবাদী, গ্রামীণ প্রকৃতির মতোই নিরুচ্চার। মধ্য বয়সে তার খতনা হওয়ার ঘটনা নির্মম ও অমানবিক বলে মনে হলেও তা মহব্বতনগরের বিচ্ছিন্নতা, গ্রামবাসীদের আদিম সারল্যেরই প্রতীক।

আওয়ালপুরের পীর মজিদের স্বগোত্রীয়। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা মজিদের মতো নয়। একটি বিশেষ মৌসুমে আবির্ভূত হয়েই তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা-অভিলাষী, মজিদের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ। কিন্তু আর্যসুলভ চেহারা থাকলেও তিনি মজিদ থেকে বৃদ্ধ, ক্ষীণকণ্ঠ। ফলে মজিদকে সাময়িক আলোড়িত, ভীত করার মাধ্যমেই তাঁর ভূমিকা নিঃশেষিত। তার পরাজয় যতো-না মজিদের কাছে, তার চেয়েও বেশি সময় ও বয়সের কাছে। বস্তুত, আওয়ালপুরের পীর এ দেশের লোকজ মানবচরিত্রের একটি বিশেষ দিককেই তুলে ধরেছে। আমাদের সাধারণ, নিরক্ষর মানুষেরা ধর্ম ও ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে গভীর সম্ভ্রম ও সম্মান-বোধ লালন করে আর এ-জন্য এ দেশে পীরবাদের এমন আধিক্য। কিন্তু সব পীরের প্রতিষ্ঠা জোটে না, স্বজাতীয় প্রতিহিংসা ও ষড়যন্ত্রে অনেককেই হতে হয় বিতাড়িত ও পরাভূত।

মুতলব মিঞা আওয়ালপুরের পীরের মুরিদ বলে ভক্তি-আপ্লুত। তার অপটু ও অশুদ্ধ উর্দু সংলাপ ও 'হুজরের বাতরসসিক্ত পদ চুম্বন' তাই বিচ্ছিন্ন কোনো প্রসঙ্গ নয়, ভক্তের শ্রদ্ধা-অতিরেক স্বরূপেরই প্রকাশ।

মোদাব্বের মিঞা সন্তান-বৎসল ও শান্তিপ্রিয় পিতা। সবকিছু থেকে আক্কাসকে আগলিয়ে রাখতেই তাই সে ব্যস্ত। আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠা সময়েরই দাবি। তারই মাধ্যমে মহব্বতনগরে প্রবেশ করেছে নবতর চেতনা, নাগরিক সুবাতাস।

খালেক ব্যাপারীর শ্যালক ধলা মিঞা নির্বোধ ও কৃতঘ্ন, জড়বুদ্ধির ও পরিণাম চিন্তাবর্জিত। তার ভূতের ভয় ও মজিদের কাছ থেকে পানিপড়া আনার ঘটনা মহব্বতনগরের কুসংস্কারবদ্ধ জীবনপ্রবাহেরই একটি ছিটকে আসা দৃষ্টান্ত।

খালেক ব্যাপারীর দ্বিতীয় স্ত্রী ভানু বিবি বছর-বছর সন্তানবতী হয়েই আমেনার বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণাকে করেছে তীব্র, গভীর ও সূচিমুখ।

বস্তুত, *লালসালু*-র পরিপ্রেক্ষিতচরিত্রগুলি[২৮] উপন্যাসে একবার কিংবা দু-বারের জন্য আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু তাদের মাধ্যমেই উপন্যাসের বহির্বাস্তবতা নিরবলম্ব ও বায়বীয় হওয়ার পরিবর্তে হয়েছে বিশ্বস্ত, নির্ধারিত ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশসহ প্রাত্যহিক।

লালসালু-র ঘটনাবিন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো প্রথাবিরুদ্ধ কাহিনী-সংস্থাপন রীতিকে প্রাধান্য দেননি। বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ও সাধারণভাবে অনুসৃত পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করেছেন। উনিশ শতকীয় এবং ভিক্টোরীয় উপন্যাসে গৃহীত ঘটনাবিন্যাস অর্থাৎ, ক্রমবিকাশগত পারম্পর্য, আদি, মধ্য ও অন্ত সম্বলিত অ্যারিস্টটলীয় ত্রিনীতি-অবলম্বী প্লটবিন্যাস কৌশলকে উপজীব্য করেই তিনি *লালসালু* রচনা করেছেন। ঘটনাবিন্যাস-প্রক্রিয়া ও প্রবাহ এবং মুখ্য চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-বিচারে *লালসালু*-র প্লটসংগঠনে তিনটি স্তর বিভাগ লক্ষ করা যায়।

প্রথম স্তর: উপন্যাসের সূচনা থেকে মজিদের মহব্বতনগরের প্রবেশ পর্যন্ত বহমান।[২৯]

দ্বিতীয় স্তর : মজিদের মহব্বতনগরে প্রবেশ থেকে জমিলাকে বিয়ে করা পর্যন্ত।[৩০]

তৃতীয় স্তর: মজিদের গৃহে জমিলার আগমন থেকে উপন্যাসের অন্তিম ঘটনা পর্যন্ত।[৩১]

প্রথম স্তর মজিদ–চরিত্রের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত। মজিদকে অখণ্ড, সমগ্র ও পূর্ণায়ত রূপে নির্মাণই ঔপন্যাসিকের মৌল অভিপ্রায়। তাই এ-স্তরে তিনি টুকরো ঘটনা, সংঘাত, গৃহগত মনোভাব, নিঃসঙ্গতা বোধ, বন্য জীবনের বিচ্ছিন্নতা, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মানুষের ছিটকে পড়া আচরণ, বিপন্নতা বোধ ও অসহায়ত্ব অর্থাৎ, শ্রেণী অবস্থান ও আর্থসামাজিক পরিচয়সহ মজিদকে উপস্থাপন করেছেন আর এই প্রথম স্তরের উপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় স্তরে মজিদের উপস্থিতি, পদচারণা ও আত্মপ্রকাশ।

দ্বিতীয় স্তর দুটি উপ-স্তরের সমবায়ে গঠিত। প্রথম উপ-স্তর নির্দেশ করা যায় আওয়ালপুরের পীরের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত। এ পর্বে মজিদ নিজেকে সংহত, মহব্বতনগরে তার প্রতিষ্ঠা শিকড়ায়িত করা ছাড়াও হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগতভাবে উপভৌগিক মানসিকতাসম্পন্ন। মজিদের রহীমাকে বিয়ে এ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও মজিদ-চরিত্রের স্তরবহুলতা, তার আত্মমগ্ন, আত্মবিচরণশীল ও অবচেতন মনের আসঙ্গ-লিপ্সার সঙ্গে আমাদের এই প্রথম পরিচয় হয়। অর্থাৎ, প্রথম স্তরের সাফল্য অর্জিত হওয়ার পরই ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় স্তরে মজিদ-চরিত্র সৃষ্টিতে হয়েছেন যত্নশীল, তাকে সজীব, সকর্মক ও গতিশীল করে নির্মাণে সচেষ্ট। দুদু মিঞা, তাহের-কাদেরের বাপ, রহীমা, হাঁসুনির মা সেই প্রয়োজনেই সৃষ্ট। তারা মজিদকে মেধাবী, কৌশলী, পরিস্থিতিকে পূর্ণদক্ষতায় নিজের অনুকূলে চালিত করার ক্ষমতা ও মানবিক চঞ্চলতাসহ হয়ে-উঠতেই সাহায্য করেছে।

কাহিনী-মধ্যে আওয়ালপুরের পীরের আবির্ভাবের সঙ্গে সূচিত হয়েছে দ্বিতীয় উপস্তরের। আমরা দেখেছি, মজিদ-চরিত্রের দুই রূপ। এক দিকে সে উত্তেজনাহীন এবং চূড়ান্ত উত্তেজনাকর মুহূর্তেও নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কার্যসিদ্ধিতে অসাধারণ কুশলী। অন্যদিকে সে ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্ষমাহীন। তাহের-কাদেরের বাপের প্রসঙ্গে তার এই নিষ্ঠুর, নির্মম ও জান্তব রূপের চকিত আভাস থাকলেও এ পর্বে মজিদের সেই ব্যক্তিস্বরূপ সযত্ন পরিচর্যার মাধ্যমে লাভ করেছে সফল প্রতিষ্ঠা। আওয়ালপুরের পীর ও আমেনা বিবি উপ-কাহিনী মজিদের বিপন্ন প্রতিষ্ঠার দুর্ভাবনা-চঞ্চল ও তার নিরস্তিত্ব চেতনাজাত প্রতিহিংসাপরায়ণ চৈতন্যর স্বরূপ নির্মাণের প্রয়োজনেই সৃষ্ট। ঘটনাদ্বয়ের মাধ্যমে কাহিনী-স্রোতের উপর মজিদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তৃতীয় স্তর আপাত সুদৃঢ় হলেও এ স্তরেই মজিদ-চরিত্র চূড়ান্ত পরিণতি এবং ঔপন্যাসিকের মৌল প্রতিপাদ্য হয়েছে রূপান্বিত। নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে ব্যবহার করলেও মজিদ তাকে চেনে না, রহীমাকে বিয়ে করেও মজিদের অন্তরের অতৃপ্তি দূর হয়নি, মহব্বতনগরে, ক্ষমতা ও বিত্তে মূলসঞ্চারী হলেও সেই সমাজকে মজিদ তার নিজের বলে ভাবতে পারেনি—তার এই সামূহিক বোধ, আত্ম-অনুভূতি ও আত্ম-উপলব্ধি তৃতীয় পর্যায়ে হয়েছে তীক্ষ্ণচূড়, তীব্র ও সূচিমুখ। জমিলাকে মজিদের বিয়ে করার মনস্তত্ত্বের মূলে আছে তার বিপন্ন অস্তিত্বের ভয়, বংশলতিকায় শিকড়ায়িত হওয়ার মানবিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু প্রত্যাশা ও বাস্তব, আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে সুসামঞ্জস্য, মেল বন্ধন খুব কমই হয়। 'মানুষ মূলত নিঃসঙ্গ' এবং 'নিঃসঙ্গতাই তার খাঁটি রূপ'। মজিদের ক্ষেত্রেও তাই ব্যতিক্রম ঘটেনি। এতো কাল মজিদ যে ঈশ্বর-ভীতি, মাজার-ভীতি ও সমাজ-ভয়কে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে এসেছে, জমিলা এই ত্রিবিধ ভয় এবং পরিণামভয় শূন্য। ফলে মজিদ হয়েছে আরো ভীত, দ্বিতীয় স্তরের নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার তুলনায় পাষণ্ড, স্থূল ও প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। কিন্তু সফলতা আসেনি। গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো নিজের

আচরণের গোপন সূক্ষ্ম পথ বেয়েই মজিদের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে। মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদি-রঞ্জিত পদাঘাতের মাধ্যমেই মজিদ নিক্ষিপ্ত হয়েছে নিঃসীম পরাজয় চেতনার গভীরে, অপার আত্মবিচ্ছিন্নতার নীরক্ত পৃথিবীতে। আর ঔপন্যাসিক জমিলার মাধ্যমে নিরন্ন, নিষ্পেষিত ও বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষদের শর্তবন্দি সমাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে ও সর্বভয় দূর করে মজিদ-রূপ বিষবৃক্ষ উৎপাটনের এবং সংগ্রামী হয়েই স্বাতিক্রমণের আহ্বান জানিয়েছেন।

সৃষ্টিমাত্রই স্তরবহুল, বহুমাত্রিক। *লালসালু*-র উপরি স্তরের প্রচলিত প্লট-বিন্যাসরীতির গভীরে তাই গুরুত্ব পেয়েছে একটি মেধাবী অন্তর্বুনন (texture), দৃষ্টিকোণের সুষম ব্যবহার ও শিল্পমার্জিত পরিচর্যা-কৌশল।[৩২] আমরা দেখি, *লালসালু* মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ (author's point of view) থেকে রচিত হলেও সেই অবস্থান সর্বত্র একইভাবে সুদৃঢ় ও সুসংহত নয়। উপন্যাসের ঘটনা ও জীবনকে শিল্পায়তনিক, দৃশ্যমান করতে পূর্বোক্ত দৃষ্টিকোণের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়েছে কখনো মজিদের, কখনো তাহের-কাদের, হাসুনির মা, জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু, বিচিত্র রীতি-পদ্ধতির আভ্যন্তরিক পরিচর্যা।

লালসালু-র প্রথম স্তরে মজিদ-চরিত্রের পটভূমি, অস্তিত্ব সংহারক সমাজ-কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দু এবং বর্ণনাত্মক পরিচর্যা। উপন্যাসের সূচনা অনুচ্ছেদ :

> শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে—প্রদেশেরও ; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হাঁ-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।[৩৩]

কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বর্ণনায় আর পূর্বোক্ত রীতির নির্ভুল ও অবিকল অনুসরণ নেই। পূর্বের বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাদানের সঙ্গে এ অনুচ্ছেদে গৃহীত হয়েছে বর্ণনামূলক (descriptive) ও চিত্রাত্মক (pictorial) রীতির যুগপৎ পরিচর্যা। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আরম্ভ :

> অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছায় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে।[৩৪]

এর পরের অংশের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছেন বর্ণনাত্মক রীতিতে। বস্তুত, মজিদ-চরিত্রের জীবন-প্যাটার্ন ও সমগ্রতাবোধের অন্তর্লীন সূত্রসমূহ *লালসালু*-র প্রথম স্তরের ঘটনা আর এ-জন্যই তা চিত্র ও বর্ণনাসংলগ্ন; আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ ও সেই অবস্থাসৃষ্ট জীবনের চলমান, ভাগ্যান্বেষী রূপের সমীকরণে উপস্থাপিত, তথ্যনিষ্ঠ ও বাস্তব।

উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তর প্রেক্ষণবিন্দুগত ব্যবহার ও অন্তর্গত পরিচর্যার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ এলাকা। এ স্তরে মজিদ মহব্বতনগরে প্রবেশ করে শিকড়ায়িত হয়েছে। কিন্তু তার আবির্ভাব-মুহূর্তটি ঔপন্যাসিকের চোখ দিয়ে আমাদের দেখানো হয়নি—তাহের-কাদেরের প্রেক্ষণবিন্দু, তাদের কর্মময় জীবন-প্রবাহের উল্লেখ ও দৃশ্যবদ্ধ পরিচর্যার সাহায্যেই তা মূর্ত করা হয়েছে :

> হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করছে।[৩৫]

মজিদ মহব্বতনগরে আগন্তুক, অধিবাসীদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত আর তার এই হঠাৎ ছিটকে-আসা, বহিরাগত রূপটি গ্রামের মানুষের পক্ষেই প্রথম উপলব্ধি ও আবিষ্কার সম্ভব। ঔপন্যাসিকও সে-প্রয়োজনে, মজিদকে প্রকৃতই গ্রামবাসীদের থেকে দূরবর্তী ও দূরন্বয়ী করে উপস্থাপন-মানসেই গ্রহণ করেছেন তাহের-কাদেরের প্রেক্ষণবিন্দু। এ ব্যবহার অনিবার্য, ঘটনাকে নানা আয়তনিক পরিচয়ে বদ্ধ করে পাঠককে পুনর্জাত করার অভিপ্রায়জাত। মহব্বতনগরে মজিদের প্রবেশের পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিকোণ স্থানান্তর করেছেন। অন্য কথায়, এ পর্যায়ে মুখ্যত মজিদের দৃষ্টিকোণ এবং তারই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে উপন্যাসের ঘটনাস্রোত হয়েছে ক্রমশ অগ্রসর, প্রগাঢ় ও পরিণামসঞ্চারী। যেমন, মহব্বতনগরের বহির্বাস্তবতা সেই জনপদের অধিবাসীদের জীবনার্থ উপস্থাপনা :

> গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠেছে। জোত জমি করেছে, বাড়িঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে ওঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লীদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বরে খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় স্বচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিলো, ভয়ও ছিলো। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।[৩৬]

মহব্বতনগর মজিদের স্বপ্নের জনপদ, তার আকাঙ্ক্ষিত এলাকা, তার দীর্ঘকাল লালিত প্রত্যাশারই বাস্তব, প্রকাশিত রূপ। স্বভাবতই গ্রামের বহির্বাস্তবতা ও গ্রামবাসীদের অন্তর্গত স্বরূপ—সবকিছুই মজিদানুগ, তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক শক্তি, অনুকূল উপাদান। তাহের-কাদেরের বাপ, আওয়ালপুরের পীর, আমিনা বিবির বিরোধিতাও মজিদের কাছে মূল্যহীন, নিরর্থক। এ সব ঘটনা-উপস্থাপনে তাই মজিদের প্রেক্ষণবিন্দুরই প্রাধান্য। তৎসত্ত্বেও এ অবস্থান এ স্তরের সর্বত্র সমান নিষ্ঠায় রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ, মজিদের প্রেক্ষণবিন্দুই দ্বিতীয় স্তরের সর্বত্র ব্যাপ্ত ও সঞ্চারিত নয়। উপন্যাসে জটিল আবর্ত সৃষ্টির সঙ্গে প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে, গুরুত্ব লাভ করেছে হাঁসুনির মা। স্মরণীয়, উপন্যাসে হাঁসুনির মা-র সৃষ্টি মজিদ চরিত্রকে সংহতি দান, তাকে মানবিক চাঞ্চল্যে রূপবান এবং মহব্বতনগরের সমাজ-বাস্তবতাকে রূপময় করে তোলার প্রয়োজনে। মধ্যবর্তী চরিত্র হলেও *লালসালু*-র কাহিনী স্রোতের অন্তর্বয়নে হাঁসুনির মা-র নিজস্ব স্থান ও ভূমিকা রয়েছে। উপন্যাসে তার প্রবেশের সঙ্গেই পূর্বানুসরিত প্রেক্ষণবিন্দুর স্থানচ্যুতি ঘটেছে, তা হয়ে উঠেছে হাঁসুনির মা-কেন্দ্রিক। একইভাবে উপন্যাসে জমিলার আবির্ভাবের সঙ্গে দৃঢ়রেখ হয়েছে তারই প্রেক্ষণবিন্দু। জমিলা মজিদের জীবনে এক পরম দুর্যোগ, মূর্তিমতি ঝড়। মজিদ ক্রমাগত অন্ধকার সরিয়ে আলোর সন্ধান করেছে, বাহ্যিক ও আত্মিক বিপন্ন অবস্থা অতিক্রম করে হয়ে উঠতে চেয়েছে প্রতিষ্ঠিত ও পরিতৃপ্ত; অথচ এক নীরন্ধ্র অন্ধকার, এক অপার আত্মিক অনিকেত চেতনাই তার পরিণামী পুরস্কার, একমাত্র সার হয়েছে। তার এ বিপর্যয়, পরাভবকে ত্বরান্বিত করেছে জমিলাই। তাই মজিদের সঙ্গে সমান্তরাল যাত্রায় উপন্যাসের তৃতীয় স্তরে জমিলাই কেন্দ্রীয় স্রোত, যদিও ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরায় চিত্রায়িত হয়েছে মজিদের বিপন্ন অবস্থা, তার এতোকালের স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণ, প্রায়-অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব। যেমন,

> জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে-আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারের সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।[৩৭]

এখানে জমিলাকে মজিদ মোদেচ্ছের পীরের মাজারে নিয়ে গিয়েছে, তার চিত্তে খোদা ও মাজার ভীতির সৃষ্টি করাই মজিদের লক্ষ্য। মজিদের আচরণ শক্তিমন্ত দানবের, নির্মম ও স্থূল। জমিলার সঙ্গে অবস্থান করতে গিয়ে তার শক্তি ও সামর্থ্য হয়েছে নিঃশেষিত। মজিদের তাই নিজেকে মনে হয়েছে জমিলা থেকে বহু দূরবর্তী, অচেনা কোনো গ্রহের জীব, অন্ধকারের সরীসৃপ। ঔপন্যাসিকের বিবরণধর্মী ও চিত্রাত্মক

প্রেক্ষণবিন্দুর সামবায়িক ব্যবহারের ফলেই এ ব্যবধান এমন স্পষ্ট ও প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে এবং তা কেবলই মজিদকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করেছে, জমিলাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ কিংবা কোনো বিশেষ চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঘটনা উপস্থাপনের মধ্যে *লালসালু*-র অন্তর্বয়ন-গৌরব আভাসিত হলেও এ প্রসঙ্গে আরো একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখি, ঘটনা-উপস্থাপনে কোনো বিশেষ চরিত্র গুরুত্ব পেলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটনা-বহির্ভূত থাকেননি। ঘটনা ও চরিত্রকে অভিন্ন, জৈবিক ঐক্যে সমগ্র করার জন্য তিনি নিজেই অনেক সময় ঘটনা-মধ্যে প্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ, একই সঙ্গে চরিত্রের প্রান্তবর্তী প্রেক্ষণবিন্দু ও সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন,

১ ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে।—আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে—যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তাঁর কবলে গিয়ে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্য তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরূহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ ক্বাজা করেননি—তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ্ করেছেন।[৩৮]

২ বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে ওঠে বসেছিলো, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়েই আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকালো। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখলো। তাতে হাত বুলালো না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেলো না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকাটান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললো বাইরের দিকে।[৩৯]

প্রথম উদ্ধৃতিতে মজিদ আওয়ালপুরের পীর-প্রসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়াজাত বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। কিন্তু মজিদের সংলাপ এখানে প্রত্যক্ষভাবে, তারই উক্তিতে উঠে আসেনি। লেখক সরাসরি আবির্ভূত হয়ে মজিদের কথামালা পরোক্ষ উক্তি (indirect narration)-তে বর্ণনা করেছেন।

নামাজ পড়তে গিয়ে জমিলা ঘুমিয়ে পড়লে তার সেই অবাধ্যতায় মজিদ হয়েছে আহত ও উত্তেজিত। অতঃপর সে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে, শক্তি প্রয়োগ করে হলেও স্ত্রীকে শাসন করতে চেয়েছে। কিন্তু জগতে এমন অনেক কিছু আছে, যার উপর শারীরিক বল প্রয়োগ চলে না। ফুলকে তার নিজের নিয়মেই ফুটতে দিতে হয়। দ্বিতীয়

উদ্ধৃতিটিতে মজিদের আঘাতে উত্তেজিত জমিলার অন্তরের প্রক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু তা জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে নয়, ঔপন্যাসিকের সংবেদনাময় চৈতন্যের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে।

দৃষ্টিকোণ, প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহারের মতো *লালসালু*-র অভ্যন্তর পরিচর্যায়ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক প্রতিভার সুবিস্তৃত ও আন্তর্দেশীয় ব্যাপ্তি; তাঁর আধুনিক উপন্যাসের প্রকরণ ও সাংগঠনিক সূত্র-সচেতন মেধার স্তরগভীরতার দীপ্র প্রকাশ লক্ষণীয়। বর্ণনামূলক, চিত্রাত্মক রীতির পাশাপাশি সংকেতময় পরিপার্শ্ব ও ভূদৃশ্যচিত্র নির্মাণ, কখনো প্রতীকী ও নাট্যিক পরিচর্যা, প্রকৃতির সঙ্গে মানবিক সংবেদনাকে পরস্পরিত করে আবার কখনো বিভাবের সাহায্যে *লালসালু*-র ঘটনাক্রম ও চেতনাপ্রবাহ, জীবন ও সমাজের রূপ-রূপান্তর ঔপন্যাসিক নির্দেশ করেছেন।

লালসালু-র দ্বিতীয় স্তরে মজিদ তাহের-কাদেরের বাপের বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে উপন্যাসে একটি দারুণ নাট্যিক মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সকলে 'নিশ্বাসরুদ্ধ।' 'লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা।'[৪০] সবার ধারণা, কোনো কঠিন শাস্তি নেমে আসবে 'ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোক'-টির জন্য। অকস্মাৎ সবাইকে স্তম্ভিত করে মজিদ ঘোষণা করেছে :

> তুমি কিংবা তোমার বিবি গুণাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাফ চাইবা, তারে ঘরে নিয়ে যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।[৪১]

অবস্থা যখন উত্তেজনায় এমন সু-উত্তুঙ্গ, পরিবেশ যখন অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠাময় তখন মজিদের এ আকস্মিক ঘোষণা শুধু নাটকীয়তা-উজ্জ্বল নয়, কাহিনীর অন্তর্নাটকীয়তায়ও তা বিশিষ্ট, গুণময় ও প্রদীপ্ত। আক্কাসের বিচারের ঘটনাও তীব্রভাবে নাটকীয় এবং অন্তর্নাটকীয়তায় ক্ষিপ্র ও গতিশীল।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবীয় সংবেদনা পরস্পরিত হয়েছে তাহের-কাদেরের বাপ ও তার কন্যা হাসুনির মাকে আশ্রয় করে। প্রকাশ্য সভায় তাহের-কাদেরের বাপ হয়েছে অপমানিত। এ বেদনা তার কাছে মৃত্যু–অধিক যন্ত্রণায় বিধুর। ফলে তা সে সহ্য করতে পারেনি। এ লাঞ্ছনা ও অন্তর্দাহ থেকে মুক্তি লাভের একটি নিজস্ব, আত্মবিনাশী পথও সে নির্বাচন করেছে। তাহের-কাদেরের বাপের জীবনের সেই মহাদুর্যোগময় মুহূর্তটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেননি। প্রকৃতির অনুষঙ্গে ও অনুকল্পে তিনি তা কেবলই আভাসিত করেছেন :

> দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে ; ··· হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শোঁ করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মত ঠেলে এগিয়ে যায়।[৪২]

উপন্যাসের এ ঝড় কেবলই সময়ের অতিপাত (passage of time) হিসেবে আসেনি, তা ভিন্নতর, অভিধামুক্ত তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনায় গুরুত্ববহ। এ ঝড় প্রাকৃতিক

হয়েও তাহের কাদেরের বাপের মনোজগতের প্রলয়, তারই বেদনামথিত চৈতন্য, সংক্ষোভ ও হৃদয়ার্তির আলম্বন বিভাব (objective co-relative)।

তাহের-কাদেরের বাপ ঝড়-জলের মধ্যেই তার দু-দিনের উপোস ভাঙে, হাসুনির মার কাছে চিড়ে, পানি চায়। হাসুনির মা'ও নীরবে বাপের আদেশ পালন করে, 'বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।' অতঃপর বৃদ্ধ বাপ মেয়েকে উদ্দেশ করে বলে :

> —মাইয়া, তোর কাছে মাফ চাই। বুড়া মানুষ মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।
>
> মেয়ে কী বলবে। বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হু হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।[৪৩]

এখানেও মানবিক সংবেদনা ও প্রকৃতি হয়েছে অভিন্ন। চোখের পানি ও বৃষ্টির জল-মিশে সৃষ্টি হয়েছে এমন একটি বাস্তবতার যা হৃদয়সংবেদী, অতিমাত্রায় সংবেদনশীল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অনেক সময় ব্যক্তিক বেদনাকে বর্ণ ও বর্ণনান্তরে, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমান চিত্রের সাহায্যেও প্রতীকায়িত করেছেন যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খালেক ব্যাপারী-আমেনা বিবির বিচ্ছেদ মুহূর্তটি :

> বৈঠকখানা, হুকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই ; আরেকবার মনে হয়, সে-শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।[৪৪]

ব্যাপারীর জীবনে এমন গভীরমূল–প্রোথিত সংকট আর কখনো আসেনি। 'তার শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন' জ্বলে উঠলেও ব্যাপারীর অন্তরাত্মা বেদনায় এমন অবসিত হয়ে উঠতো না। এই ধোঁয়া তাই খালেক ব্যাপারীর অন্তরে ঘনীভূত সেই প্রগাঢ় বেদনারই প্রতীকী প্রকাশ। স্মরণীয়, নীল রং সর্বকালেই বেদনার উপমা, মানুষের অন্তরের জমাট দুঃখ, তার স্তরীভূত কারুণ্যেরই বর্ণময় প্রকাশ।

লালসালু-য় ব্যক্তির অন্তর্সংবেদনা প্রকাশের জন্য কখনো-কখনো শ্রাব্যকল্প সহায়ক উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। দূরাগত ধ্বনির অনুবর্তন, অনুসরণে মজিদ বর্তমান থেকে অতীতে আবার একান্তই বর্তমানের মৃত্তিকাতে হয়েছে সংস্থাপিত ও পুনর্বাসিত; ঢোলের ধ্বনি-অনুষঙ্গ ও জমিলার নীরব প্রতিবাদ পরস্পরিত হয়ে রচনা করেছে একটি বেদনাময় মুহূর্ত যা প্রগাঢ় এবং মজিদের সমগ্র জীবনকাল ব্যাপ্ত হয়েও স্বতন্ত্র অনুভবে ভাস্বর ; পৃথকভাবে স্মরণীয় :

> সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারহীন অর্থই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। ··· ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। ··· তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকিধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে।[৪৫]

কালের এ ভগ্নক্রমিক ব্যবহার ও এর মাধ্যমে ব্যক্তিচৈতন্যের রূপান্তর চেতনাপ্রবাহরীতিরই অনুগামী; প্লটের উপর চরিত্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিস্থাপনের ঔপন্যাসিক-অভীপ্সারই পরিচয়।

এ-ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু*-র আভ্যন্তর পরিচর্যায় এমন বহু ভাবব্যঞ্জনাময় ও ইংগিতধর্মী চিত্র নির্মাণ করেছেন, যেগুলির সাহায্যে পাঠক পৌঁছে যায় খণ্ডপরিধি অতিক্রান্ত এক সংবেদনাময় অনুভূতি ও প্রতীতিতে। যেমন :

১ খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে-ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।[৪৬]

২ বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দুরক্ত-টাট্‌কা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা।'[৪৭]

দুটি দৃষ্টান্তেই গুরুত্ব পেয়েছে দর্শন–ইন্দ্রিয়ের উপর আপতিত আলোর তরঙ্গ ও বাতাসের ঘনত্ব। মজিদ, কুয়াশাচ্ছাদিত জ্যোৎস্না ও রক্ত বিন্দুর মতো কুপির শিখাকে ঔপন্যাসিক 'বিন্যস্ত করেছেন বিপরীত ভাবানুষঙ্গের গতিময় পরম্পরিত ও উপর্যুপরি সংস্থাপনায়।'[৪৮]

বস্তুত, *লালসালু*-র ঘটনাগ্রন্থন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, আভ্যন্তরিক পরিচর্যা— কোথাও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাংবাদিক সারল্যকে প্রশ্রয় দেননি। ঘটনাভুক পাঠকের জন্য উপন্যাস-রচনাও তাঁর অন্বিষ্ট ছিল না। জীবন-অনুধ্যান ও শিল্পপ্রকরণে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাফল্যের অভিযাত্রী। তাঁর *লালসালু* সমকালের সমাজমর্মমূলকে স্পর্শ করেও হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের বিশ্বাতিগ জীবনদর্শনের শব্দরূপ; আর এ-জন্যই আপাত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের অন্তরালে *লালসালু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন চরিত্রের সংবেদনা পরিস্রুত ও চেতনাময় অনেকান্ত নির্বাচিত দৃষ্টিকোণ (multiple selective omniscens point of view), পরিচর্যায় বিশ্বস্ত ও অনুগত থেকেছেন আন্তর্দেশীয় শিল্পপ্রকরণ-সূত্রের প্রতি।

উপন্যাসের ঘটনা কিংবা চরিত্র পাঠকচিত্তে অতিদ্রুত সঞ্চারিত হয়ে তাকে আবেগপ্রবণ, উত্তেজিত আবার কখনো উদ্বেজিত করে তোলার মূলে রয়েছে ভাষার অনিবার্য ভূমিকা। কিন্তু উপন্যাসের জন্য কোনো বিশেষ ভাষা, এই শিল্পকৃতির জন্য পৃথক শব্দসম্ভার নির্দেশিত হয়নি। যে-কোনো শব্দই উপন্যাসের ভাষা. লেখকের ব্যবহার গুণেই তা পাঠক-হৃদয়ে অভিযাচিত ভাব ও প্রতীতির সৃষ্টি করে।[৪৯] বস্তুত, উপন্যাস একটি কলা-পরিণতি।[৫০] ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রনির্ভর কিংবা সংবাদপত্রের মতো সরল, তথ্যভারনত গদ্য উপন্যাসের ভাষা নয় ; ঔপন্যাসিকের জগৎ, জীবন-অভিজ্ঞতার গুণধর্মী, সংকেতাশ্রয়ী ও চেতনা সঞ্চারক্ষম শব্দশরীরই উপন্যাসের স্তরবহুল ভাষারীতির মৌল ভিত্তি। 'উপন্যাসের পক্ষে যা–কিছু প্রয়োজনীয়—সর্ববিধ বিষয়, এবং সর্বস্তরের মানুষ, তথা এর বিস্তৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্য ভাষাই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা।' [৫১]

লালসালু-র শিল্পগৌরবের একটি প্রান্তবিন্দু এর ভাষা যা আরবি-ফারসি শব্দ, আঞ্চলিক বুলির ব্যবহার কিংবা ক্রিয়াপদ[৫২], নাম-প্রতিনাম পদের ব্যবহার-নৈপুণ্যের মধ্যেই কেবল সীমায়িত নয়। *লালসালু*-র ভাষার ঐশ্বর্য ও উত্তাপ ছড়িয়ে আছে এর উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, উপমানচিত্র-চিত্রকল্পে, রূপক ও প্রতীকের গভীরে; উপন্যাসধৃত পাত্র-পাত্রীদের জীবনার্থ, তাদের রূপায়ণে ঔপন্যাসিকের সাফল্য ও শিল্পকৃতির মধ্যে।

লালসালু-র উপরিস্তর, অধিকাঠামোতে সমাজবাস্তবতার ঘনসংবদ্ধ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি। এক-অর্থে *লালসালু* মহব্বতনগরের উপাখ্যান; শর্তবন্দি সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে গড়ে-ওঠা গ্রামবাসীদের নিরুপায় ও বিপন্ন সত্তার ইতিকাহিনী। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই একটি আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, গ্রামীণ জীবন বাস্তবতাকে *লালসালু*-তে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে প্রযুক্ত বেশকিছু উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যেও সেই সমাজ-পরিমণ্ডল, গ্রাম-জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, অসহায়তা ও স্বার্থবুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে :

১ কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝান্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মত ভাগ করে ফেলে।[৫৩]

২ বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মত হয়ে উঠেছে।[৫৪]

৩ সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মত খুঁটিবন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি।[৫৫]

৪ বকের মত গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়।[৫৬]

গ্রামের জমি-মালিক মাত্রেই দক্ষ দাবাখেলোয়াড়। একটু অসাবধান হলেই, স্বার্থ-চেতনায় সামান্য আঘাত লাগলেই তারা অন্যের জমি গ্রাস করে। গ্রামের জমি সে-অর্থে দাবারই ছক। দ্বিতীয় উপমায় উল্লিখিত সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞা সত্যিই

ভারবাহী পশু, সংসারচক্রে আবদ্ধ এক বন্ধনপীড়িত সত্তা। গাধার সঙ্গে তার তুলনা করে ঔপন্যাসিক দুদু মিঞার সঠিক সমাজ-অবস্থানই নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় উপমায় দাড়ি-গোঁফ বিশিষ্ট ছেলেকে খতনার জন্য রজ্জুবদ্ধ করলে তার অবস্থা কেমন হতে পারে তা চিত্রিত হয়েছে। এ অবস্থায় পড়লে মানুষ সত্যিই হয় কোরবানির পশু। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে বেদনাহত হাঁসুনির নানার ছুটে যাওয়ার দৃশ্য আমরা লক্ষ করি। তার চরিত্রস্বরূপে সে বাস্তবই শিকারী বক, তেমনি একাগ্র ও শাণিত। চারটি উপমাই তাই বহিরারোপিত নয় ; গ্রামীণ জীবনধারা, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই এগুলির উৎস।

লালসালু-র ভাষা উপমা-উৎপ্রেক্ষায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল, জীবনের মূলগভীর থেকে উঠে আসা হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন প্রতীক অনুসন্ধানে ও রূপক নির্মাণে। চরিত্রের অবচেতন মনের বক্র ভাবনা, তার আসঙ্গচেতনা, অন্তর্গত ভীতিবোধ ও অসহায়ত্ব প্রকাশে ব্যবহার করেছেন সাপ, বিড়াল ছানা আবার কখনো ঝড়ে আন্দোলিত বৃক্ষের প্রতীক। যেমন ; আমেনা বিবির প্রতি মজিদের প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা, মজিদের আদিম, জান্তব স্বরূপ বর্ণনায় গৃহীত হয়েছে সাপের পৌনঃপুনিক প্রতীক ও রূপক :

১ এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন **আদিম সাপের গতির মত** জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি **সাপের গতি** থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত **সাপ** ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য।[৫৭]

২ কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে: একবার ডান পা, আকেরবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে **সাপের গলাটা** সামান্য চম্‌কে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।[৫৮]

৩ আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয় বার দেখলো না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে **সাপ** জাগে যেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে।[৫৯]

স্বামিগৃহে জমিলার অবস্থা, তার চেতনা ও মজিদ-বিমুখ সত্তা বর্ণনার প্রতীক ভয়তাড়িত হরিণ ও ইঁদুর :

১ ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া **হরিণের** চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।[৬০]

২ জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা **সশঙ্কিত হরিণের** মত। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে **ইঁদুর** যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে।[৬১]

আবার তাহের-কাদেরের বাপের অন্তর্ধান ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে ঝড় ও প্রবল বাত্যাহত তালগাছের প্রতীকে:

'মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ **তালগাছটি** বন্দি পাখির মত আছড়াতে থাকে।'[৬২]

তাহের-কাদেরের বাপ মহব্বতনগরের সবচেয়ে বয়সী, শিখরস্পর্শী ও অনমনীয় অস্তিত্বময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার অন্তর্ধান আকস্মিক এবং সেই সঙ্গে মহব্বতনগরের একটি যুগেরও আবসান। 'সর্বোচ্চ তালগাছ', ঝড়ে আন্দোলিত তার রূপ তাই তাহের-কাদেরের বাপের সমাজসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও পরিণতির অনিবার্য ভাষ্য, উপমান চিত্র।

লালসালু-তে মজিদ-কথিত মোদাচ্ছের পীরের কবর 'মাছের পিঠ'-এর উপমান চিত্রে বারংবার নির্দেশিত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসে উপমাটি প্রযুক্ত হয়েছে মোট আট বার। উপমা পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হলে তা ভিন্ন মাত্রা, অভিধা-অতিরিক্ত তাৎপর্য পায়, রূপান্তরিত হয় প্রতীকে।

জলজ জীব মাছ নিঃশব্দ, অপ্রতিবাদী ও সকল সাক্ষ্য প্রমাণের উর্ধ্বে। মোদাচ্ছের পীরও চিরনীরব, সালুকাপড়ের চাকচিক্যের মধ্যেই বন্দি। মানুষের আহ্বান ও আর্তিতে সাড়া দান কিংবা কোনো আত্মঘোষণার মাধ্যমে জাগরিত হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। মাছের পিঠ তাই মোদাচ্ছের পীরের মাজার, কবরের আয়তাকৃতির সাদৃশ্যকে আভাসিত করা ছাড়াও তা নির্দেশ করেছে মোদাচ্ছের, সেই সঙ্গে সমুদয় পীর-ফকিরের নির্ভুল ও যুক্তি-বিবাচিত অবস্থান, তাদের বাস্তবতা।

লালসালু-তে মজিদের অস্তিত্ববোধের উন্মোচনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ভয় ও ভীতি-অনুষঙ্গবাহী শব্দও পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করেছেন। হিসেব করলে দেখা যায়, *লালসালু*-তে এ-জাতীয় শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে মোট সত্তর বার। মজিদের 'অস্তিত্ব-অভীপ্সার স্বরূপ উন্মোচন' ছাড়াও নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল ঔপন্যাসিকের সমাজ-ভাবনা। ঔপনিবেশিক বেনিয়া পুঁজি কিংবা ধনবাদী সমাজের অসম বিকাশ থেকে যে-জীবনবোধ গড়ে ওঠে তাতে শিল্পী, স্রষ্টা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীর ভীতিকেই লালন করেন।[৬৩] মজিদের সংকট একান্তভাবেই ধনবাদী ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই সমস্যা। অবচেতন মন থেকে তাই সে কখনো ভয়কে মুছে ফেলতে পারেনি; আর এই অনিশ্চয়তা বোধে বিপন্ন মজিদের পুরুষকার নির্মাণের জন্য ঔপন্যাসিক ভীতিময় অনুষঙ্গের ব্যবহারে হয়েছেন যত্নশীল ও আন্তরিক।

বস্তুত, *লালসালু*-য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রের কেবলই নিষ্প্রাণ বর্ণনা দেননি, নির্ধারিত চরিত্রের জন্য তিনি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতও সৃষ্টি করেছেন এবং সেই বিশেষ পারিপার্শ্বিকতায় চরিত্রগুলিকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন। *লালসালু*-র চরিত্রসমূহ তাদের আচরণ কিংবা বিবৃতিতেই স্পষ্ট ও প্রকাশিত নয় নিজেদের অন্তর্লোকে শিলীভূত আবেগ, বেদনা ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অন্তর্জগৎ ও সমাজ-পটভূমিসহই তারা প্রাণময়, বিশেষ সত্তা। *লালসালু*-র ভাষা এ উপন্যাসের চরিত্রাবলির অভিজ্ঞতারই ভাষা; ঔপন্যাসিকের দেশকাল, সমাজ ও সময়-সচেতনতার শব্দরূপ আর পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে এই ভাষাকৃতিই হয়েছে আরো পরিশীলিত, মেধাবী ও ভাব-ব্যঞ্জনাময়।

চাঁদের অমাবস্যা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রথম উপন্যাস *লালসালু* (১৯৪৮) প্রকাশের চৌদ্দ বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)। কাহিনী-গ্রন্থন, বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যা ও অন্তর্বয়ন—সব দিক থেকেই *চাঁদের অমাবস্যা লালসালু* থেকে প্রাগ্রসর ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র পরীক্ষাপ্রিয়তা ও তাঁর ক্রমসাফল্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল। *লালসালু*-তে তিনি অ্যারিস্টটলীয় ত্রিনীতি আশ্রিত কাহিনীকে উপজীব্য করেই তাঁর অন্বিষ্ট বক্তব্য, সংগঠন এবং প্রতিপাদ্য নিষ্পন্ন করেছেন। *চাঁদের অমাবস্যা* সে-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যতিক্রম ও নিঃসঙ্গ। এ-উপন্যাসের স্টোরি খুবই সামান্য, নিতান্তই বর্ণরিক্ত ও যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় উপন্যাসের সদৃশ। শীতের এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতে 'শারীরিক প্রয়োজনে' যুবক শিক্ষক আরেফ আলী ঘরের বাইরে গিয়ে কাদেরকে দেখে। কিন্তু অচিরেই সে তাকে হারিয়ে ফেলে। অতঃপর বাঁশঝাড়ে নারীকণ্ঠের কান্না এবং এক যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ দেখে। প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও পরে আরেফ বোঝে যে, কাদেরই হত্যাকারী এবং এই জিঘাংসার জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। মৃত তরুণীর প্রতি কাদেরের কোনো হার্দ্য কিংবা প্রেমজ আকর্ষণের পরিচয়ও সে পায়নি। একটি নিপ্প্রেম মৃত্যু, অকারণে একটি প্রাণের পতন আরেফকে তাই স্পন্দিত ও প্রহত করে। হত্যাকারীর শাস্তি বিধানের জন্য সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর জীবনের সর্বনির্ভরতা মুছে যাবে জেনেও সে থানায় গিয়ে স্বীকারোক্তি করে বলে, কাদেরই মাঝির মৃত স্ত্রীর হত্যাকারী।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কাছে বহির্জাগতিক ঘটনা সূক্ষ্ম মন-মনন ও চেতনা সাপেক্ষ; জীবন-সম্পর্কে কোনো গভীরতর সত্য উচ্চারণের অনুকূল আশ্রয়মাত্র। উপরিস্তরের ঘটনাংশকে সংহরণ, ব্যক্তিকে ঘটনা-অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে তার মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ানির্মাণেই তিনি স্বচ্ছন্দ। *চাঁদের অমাবস্যা*-তেও বাইরের ঘটনা গৌণ, আরেফ আলীর অন্তর্লোকে সৃষ্ট ঘটনাস্রোতই মুখ্য; তারই আত্মখনন, একটি পর্যায় থেকে আর-একটি প্রান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী পর্বের যন্ত্রণা, মানসদ্বন্দ্ব, পরিণামী চিন্তায় ব্যাকুল অন্তঃকরণ, জাগরিত সত্তার বর্ণবহুল, ইংগিতধর্মী ও পারম্পর্য-আশ্রয়ী বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের মৌল বক্তব্য, স্পষ্ট হয়েছে তাঁর অভীপ্সিত প্রতিপাদ্য।

পিতৃহীন আরেফ আলী জেলা শহর থেকে 'টেনে-হিঁচড়ে' আই এ পাস করেছে। কিন্তু 'দরিদ্রের সংসার, হাতের তালুর মত এক টুকরো জমিতে' জীবন ধারণ চলে না। ফলে 'উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটা' অর্থহীন ভেবে সে তিন-মাইল দূরবর্তী গ্রামের নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের চাকরিতে বহাল হয়েছে। একই গ্রামের বড়ো বাড়ির পারিবারিক আনুকূল্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। চাকরির

সঙ্গে আরেফ আলী বড়ো বাড়িতে আশ্রয়ও পেয়েছে। ফলে মাসশেষে হাতে যে-সামান্য টাকা আসে মায়নাবাবদ তা প্রায় না-ছুঁয়ে সে বৃদ্ধা মায়ের হাতে তুলে দিতে পারে। বর্তমান চাকরিতে তাই তার ক্ষোভ নেই, সন্তুষ্টি রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, 'ভাগ্য দয়াবান না হলে এমন চাকুরি সহজে মিলত না।'[৬৪]

আরেফ আলীর শিক্ষক-জীবন বৈচিত্র্যহীন হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে, আয়াসে ও তৃপ্তিতে বহমান। অকস্মাৎ এই পুনরাবৃত্ত প্রবাহে সংযুক্ত হয় ভিন্ন তরঙ্গ। শীতের এক উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাতে শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে সে বাইরে যায়। ঘরের পেছনে জামগাছের 'তলে' প্রয়োজন মিটিয়ে তার ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু 'জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি অদমনীয় আকর্ষণ' বশত তার ঘরে ফিরতে বিলম্ব হয়। এ-ছাড়া আরো একটি মানসিক কারণ বিদ্যমান। "তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে-অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের মর্মার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয়: কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়।'[৬৫] ফলে 'চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক ... বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো।'[৬৬] অতঃপর সে দাদাসাহেবের ছোটভাই কাদেরকে দেখে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদের তার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। আরেফ আলী তখন গ্রামের অপর প্রান্তের বাঁশঝাড়ে নারীকণ্ঠের অনুচ্চ 'আওয়াজ' শোনে : 'একটি মেয়েমানুষ যেন সভয়ে চীৎকার করে ওঠে।'[৬৭] তারপর আরো অগ্রসর হলে সে বাঁশঝাড়ের আলো-আঁধারি পরিবেশে এক যুবতী নারীর স্বল্পবাস মৃতদেহ দেখতে পায়। ফলে যুবক শিক্ষক, আরেফ আলী দারুণভাবে অভিভূত ও আলোড়িত হয় এবং ভয়তাড়িত হয়েই গৃহে ফেরে। রাতের ঘটনার অভিঘাতে তার অন্তর্সত্তার পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতা হয় পরিবর্তিত। বিদ্যালয়ে পাঠ দানকালে তার কোনো মনোবল থাকে না। ছাত্ররা তাকে ভাবে অসুস্থ। পরবর্তী রাতে আবার কাদেরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং কাদেরের আহ্বানে তারই সঙ্গী হয়ে যুবক শিক্ষক মৃতদেহটি বহন ও নদীতে তা নিক্ষেপ করে। 'যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী-হাহাকার দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই।'[৬৯] তাই আরেফ আলী তার নিজের মধ্যে সত্য প্রকাশের একটি অনিবারণীয় দায়িত্ব, সত্য-অনুসন্ধান ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের গভীর দায় (responsbility) অনুভব করে। স্মরণীয়, স্বাধীনভাবে কর্ম-নির্বাচন এবং স্বাধীনতার উপলব্ধিসহ কৃতকর্মের ভালো-মন্দ বিচারক্ষমতা, সেই সঙ্গে অন্তরে দায়বদ্ধতা অনুভবের মাধ্যমেই হওয়া যায় অস্তিত্ববান।[৬৯]

'বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে আসার পর কাদেরকেই তার নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকারী' বলে মনে হয়। কিন্তু সে-সত্য প্রকাশের সাহস আরেফের নেই। কারণ সে 'ভীতিতাড়িত অসহায় মানুষ' এবং 'তার মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা বিভাজ্য নয়, কারো

সাথে তার ভাগাভাগি সম্ভব নয়।'[৭০] অচিরেই আরেফের 'ভয়' দূর হয় এবং সে-স্থান অধিকার করে অন্ধকার এবং 'এমন অন্ধকার জীবনে কখনো সে দেখে নাই, অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এমন তীব্র ব্যাকুলতাও কখনো বোধ করে নাই।'[৭১] তার মনে হয়েছে, 'যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অর্থ সে জানে না, সে-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জড়িত বোধ হলেও আসলে সে জড়িত নয়। শুধু সে নয়, কাদেরও তার সঙ্গে জড়িত নয়।'[৭২] কিন্তু জড়িত কে? একমাত্র কাদেরই পারে অন্ধকার থেকে তাকে আলোকময় পৃথিবীতে পুনঃস্থাপিত করতে। অতঃপর আরেফ আলীর মনের আদালতে[৭৩] শুরু হয় হত্যাকারীর অন্বেষণ ও তার বিচার।

বস্তুত, প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ শর্তবন্দি, বিবিধ জৈবিক ও সামাজিক অভ্যাসে শৃঙ্খলিত। ঈশ্বর-মনস্কতাও মানুষের এক ধরনের বন্ধনপীড়িত রূপ ; অথচ মানুষেরই রয়েছে স্বাধীন সত্তা, স্বকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ। অন্তরে স্বাধীনতার অনুভবই তাকে দায়বদ্ধ করে, সে তখন নিক্ষিপ্ত হয় গভীর যন্ত্রণার কেন্দ্রভূমে, পরিকেন্দ্রে ও নীরন্ধ্র অন্ধকারে।[৭৪] 'ক্ষুধার্ত শামুকের মত পরিণাম ভয়শূন্য' হয়ে আরেফ আলীর 'খোলস ছেড়ে' বেরিয়ে আসা তাই ঘটনাতাড়িত, আপতিক হলেও অনিবার্য, স্বাধীন, মুক্ত ও দায়িত্ববান সত্তায় তার পুনর্জাগরিত হওয়ারই অভিযাত্রা।[৭৫] বস্তুত, মানুষমাত্রই সর্বদা প্রতিবন্ধকাতর সম্মুখীন হয়, আর স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমেই এই সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে সে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে পারে।

আরেফ আলীর মনো-আদালতে কাদেরকে তার প্রথমে হত্যাকারী বলে মনে হয়নি; বরং কাদেরের প্রতি তার একটি 'বন্ধুত্বের-ভাব বোধ' হয়েছে। কেননা, তারা উভয়ই 'নিঃসঙ্গ মানুষ'। কিন্তু সে-বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়নি। পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে যুবতী নারীর হত্যাকারী হচ্ছে 'নিদারুণ ভয়'। কাদেরের সঙ্গে মাঝির বউয়ের হয়ত প্রণয়, ভালোবাসা ছিল। 'বাঁশঝাড়ের বাইরে যুবক শিক্ষকের পদধ্বনি এবং পরে তার গলার শব্দ শুনতে পেলে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে যুবতী নারীর গলা টিপে ধরেছিলো'।[৭৬] তাই এ মৃত্যু নয়, দুর্ঘটনা। আর গভীরভাবে দেখতে গেলে এ ভয়ের উৎস সে নিজে। বাঁশঝাড়ের বাইরে তার 'পদধ্বনি' এবং 'পরে তার গলার শব্দ' না-শুনলে এমন দুর্ঘটনা ঘটতো না। অর্থাৎ , আরেফ আলীই খুনী, সেই 'আসল অপরাধী'। কিন্তু আরো একটি প্রশ্নের উত্তর তার কাছে 'কুজ্‌ঝটিকাবৃত মনে হয়। কী কারণে কাদের দেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে?'[৭৭] এ-প্রশ্নের একটি উত্তরও আরেফ আলী তার মনের মধ্যে খুঁজে পায়।' তার মতে, 'কাদের তার দুষ্কীর্তির চিহ্ন ধ্বংস করবার জন্যে যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ফেলে নাই। একটি কারণেই মানুষ মানুষের অন্তিম ব্যবস্থা না করে পারে না। সে কারণ, প্রেম-ভালোবাসা। যুবতী নারীর দেহটি পরিত্যক্ত জঞ্জালের মত বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকবে সে-কথা তার অসহ্য বোধ হয়েছে।'[৭৮] 'এবার যুবক শিক্ষক শুধু যে দেহটি নদীতে ফেলার সিদ্ধান্তের কারণ বোঝে তা নয়, কাদের কেন তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলো সে-কথাও সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে'।[৭৯] কিন্তু যুবতী নারীর প্রতি কাদেরের ভালোবাসার পরিচয় সে

পায়নি। অতঃপর যুবক শিক্ষক কাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং একটি প্রশ্নই তার সামনে মেলে ধরেছে :

> 'একটা কথা জানা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।—আপনি সব কথাই বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলেন নাই।'[৮০] 'যুবতী নারীর প্রতি আপনার মায়ামমতার কথা··· বলেন নাই।'[৮১]

কিন্তু এ জিজ্ঞাসার জবাব সে পায়নি। কাদের নিরুত্তর থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার 'পক্ষে দরিদ্রমাঝির বউ-এর প্রতি কোন ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়'।[৮২]

যুবক শিক্ষক বিশ্বাস করে, 'মানুষের কর্তব্য মানুষকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে স্নেহের নীড় বাঁধা, তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা। সে-বিষয়ে কে সফল হয়েছে কে হয় নাই, সে-কথা মানুষই বিচার করবে, কারণ মানুষের ভালোমন্দে মানুষেরই লাভ-লোকশান। ··· সে শুধু মানুষের ভালোমন্দ বিচারের অধিকার চায়'।[৮৩] তাই আরেফ আলীর আর কোনো উপায় থাকেনি। সে হত্যাকারীকে খুঁজে পেয়েছে, বুঝেছে : 'একটি যুবতী নারী নিতান্ত অর্থহীনভাবেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে কাদেরের মনে একটু দুঃখ-বেদনা জাগে নাই। শূন্য হৃদয়ে দুঃখ-বেদনা জাগে না। কাদেরের হৃদয়ের শূন্যতার জন্যেই যুবতী নারীর মৃত্যুটা একটি নির্মম হত্যা ছাড়া কিছু নয়'।[৮৪] অতঃপর আরেফ আলী তার কর্তব্যও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছে। তাকে অবশ্যই দাদাসাহেব ও আইন কর্তৃপক্ষের কাছে সত্য প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু সে-কর্তব্য পালনের পথেও ত্রিবিধ বাধা। প্রথমত, দাদাসাহেবকে কথাটি বললে তিনি 'নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পাবেন, যে-আঘাত বৃদ্ধবয়সে তার পক্ষে সামলে ওঠা হয়তো দুষ্কর হবে। হয়তো হঠাৎ তিনি দেখতে পাবেন, যে আশা-ভরসা আশ্বাস-বিশ্বাসের জোরে এতদিন বেঁচেছিলেন, তা সারশূন্য হয়ে উঠেছে: সমস্ত জীবনটাই এক পলকের মধ্যে নিষ্ফল হয়ে পড়েছে।'[৮৫]

দ্বিতীয়ত, হত্যাকাণ্ডটি সে নিজের চোখে দেখেনি। তা ছাড়া হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ তার নেই। আবার বিলম্বে ঘটনাটি প্রকাশের কারণও সে দেখাতে পারবে না। তখন তার অভিযোগ বিভ্রান্তিকর বলে মনে হবে।

তৃতীয় বাধা একান্তভাবেই আরেফের ব্যক্তিগত। কেননা কথাটি প্রকাশের পর তাকে 'বড়বাড়ির আশ্রয় এবং ইস্কুলের শিক্ষকতার চাকুরিটি ছাড়তে হবে।'[৮৬] তখন সে হবে পূর্বের মতোই নিঃস্ব, অনিকেত ও অনিশ্চিত পৃথিবীর মুখোমুখি।

সত্য প্রকাশের দায়িত্বভার এমনই প্রবল যে, কোনো ভয় কিংবা পরিণামভীতি আরেফ আলীকে তার কর্তব্য থেকে বিরত করতে পারেনি। দাদাসাহেবকে কাদেরের অপরাধের কথা বলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে। সকালে নামাজ পড়তে গেলে কাদেরের সঙ্গে তার দেখা হয়। আরেফের শীতল ব্যবহার, তার প্রস্তুতি কাদেরকেও সচেতন করেছে। যুবক শিক্ষকের অভিপ্রায় বুঝতে কাদের ভুল করেনি। তাই সে প্রথমে তাকে ভয় দেখিয়েছে, শেষে অসহায়ের মতো বলেছে :

কিন্তু দুর্ঘটনাটির কথা কাউকে বললে আমার কি হবে জানেন?
... "ফাঁসি।" ... "তাতে আপনার লাভ কি হবে?"[৮৭]

কাদেরের এ আকুতি, আত্মসমর্পিত ব্যক্তির দীন প্রার্থনা যুবক শিক্ষককে স্বল্প সময়ের জন্যই তার কর্তব্য থেকে বিরত করেছে। ঘটনাটি সে দাদাসাহেবকে সকালের পরিবর্তে সন্ধ্যেয় বলা স্থির করেছে; আর এই সুযোগে বিষয়টি সে আরো ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেছে। কেননা কোনো বিচ্যুতি ঘটলে সে-ভুল সংশোধনের সুযোগ আর সে পাবে না।

যুবক শিক্ষক এত কাল দাদাসাহেবকে যা বলতে পারেনি সেই নির্মম, অপ্রিয় অথচ অনিবার্য সত্যই দ্বিধাহীনভাবে ও প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে পনেরো পরিচ্ছেদে: 'কাদের মিঞা একটি মেয়েলোককে খুন করেছে।'[৮৮]

অতঃপর বড় বাড়ির দু-বছরের নিরুপদ্রব জীবনের সব আকর্ষণ, সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে যুবক শিক্ষক 'দু ক্রোশ দূরে আদালতের সামনে ...যে-থানা সে-থানায়' উপস্থিত হয়ে পুলিশ কর্মচারীর নিকট নির্ভীক, নির্দ্বিধ ও মীমাংসিত চিত্তে কাদেরকেই মাঝির বউয়ের হত্যাকারী বলে ঘোষণা করেছে।

বস্তুত, সংকট থেকেই মানুষের পুনর্জন্ম ঘটে, সে হয় অস্তিত্ববান। কিন্তু তার এই সংকট-সরণি খুবই বন্ধুর, বিসর্পিল ও তরঙ্গসংক্ষুব্ধ এবং তা অতিক্রমও সহজ নয়। এ-জন্য তাকে প্রতিমুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয় এক দুঃসহ, যন্ত্রণাকাতর, জটিল ও স্তরবহুল অভিজ্ঞতার, মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতির (border line situation)।[৮৯] *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলীও তার চেতন-অবচেতনায় সংরক্ত, বৈরি পরিবেশে ক্রমসংকুচিত হয়েই তার নপুংসক, কীটপতঙ্গ সদৃশ্য, নিমজ্জিত, বিমিশ্র সত্তা (inauthentic bieng) থেকে জ্ঞানময়, দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ইচ্ছা-জাগরিত এক শুদ্ধ সত্তা (authentic bieng)-য়[৯০] হয়েছে রূপান্তরিত, পুনর্জাত ও প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাস হিসেবে *চাঁদের অমাবস্যা* তাই যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অস্তিত্ব-অন্বেষার শব্দরূপ; তারই হয়ে-ওঠার, স্বাতিক্রমণের আলেখ্য।

চাঁদের অমাবস্যা-র বিষয়বস্তুতে লেখকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভিব্যঞ্জনা, ভিন্নতর একটি প্রতিরূপকী (allegorical) সত্যের প্রতিফলন লক্ষ করি। স্মরণীয়, ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিভক্তির অনতিকালের মধ্যেই পূর্ববাংলার বিকাশশীল ধনিক-সম্প্রদায় এবং তাদের আশ্রয় ও আশীর্বাদ-লালিত মধ্যবিত্তসমাজ সংকট অনুভব করে। পাকিস্তানি শাসকদের অনুগ্রহে গড়ে-ওঠা বেনিয়া পুঁজি অতিদ্রুত পূর্ববাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা ও উৎপাদন ব্যবস্থা দখল করে। ধর্মীয় ঐক্যের নামে ও শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এ-দেশীয় সামন্ত শ্রেণী ও সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ফলে পূর্ববাংলার সমাজ-বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত এবং পুনর্জাগরিত হয় সামন্ত সমাজ-মূল্যবোধ।[৯১] ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাবর্তন উৎসবে পাকিস্তানের কথিত 'জনক' উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলে[৯২] এ-দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রকৃতই মোহভঙ্গ হয়। অতঃপর অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৫২-র রক্তদানের মাধ্যমে সূচিত বিজয় মূলত বাঙালি মধ্যবিত্তেরই সাফল্য। কিন্তু অচিরেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রক্ষমতার একটি, নড়বড়ে, ক্ষণভঙ্গুর রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; আর এই পরিকল্পিত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, জয়ী হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সমর্থিত যুক্তফ্রন্ট।[৯৩] কিন্তু 'যুক্তফ্রন্ট সরকার' তাঁদের স্বাভাবিক কার্যকাল পূরণ করতে পারেনি। ১৯৫৮ সালেই পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তিনি ছিলেন পাকিস্তানের 'অধীশ্বর'। আইয়ুবি সামরিক শাসনাধীন কাল পূর্ববাংলার সমাজ-ইতিহাসে 'কাল দশক'-রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ পর্বে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃদ্ধি পেলেও[৯৪] এ-দেশের স্বাধিকার আন্দোলন হয় বাধাগ্রস্ত। বি এন আর., প্রেস ট্রাস্ট, রেডিও-টিভি, লেখক সংঘ প্রভৃতির মাধ্যমে আইয়ুবি শাসনামলে পূর্ববাংলার প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবীসমাজ অর্থাৎ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক সম্প্রদায়কে পরিকল্পিতভাবে পরিণত করা হয় 'বেতন দাসে' এবং এ-দেশীয় সমাজ-কাঠামোকে করা হয় মৌলিক গণতন্ত্রের খোলসে বদ্ধ।[৯৫] কিন্তু আপাতভাবে যা সত্য, প্রগাঢ়ভাবে তা সত্য নয়। বাঙালি জাতির অন্তর আদালতে ইতোমধ্যে ভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। ব্যক্তিগত ভোগবাদ কিংবা উপভৌগিক মানসিকতায় নিমজ্জিত এবং সত্য বলার ভয় থেকে আইয়ুবি অন্ধকারে নির্বাসিত জাতির সচেতন সম্প্রদায়ের মেধা, বিবেক ও শুভবুদ্ধি তাই মুছে যায়নি। অপার আত্মগ্লানি, অনিঃশেষ অপরাধ-চেতনা থেকে তাঁদের মধ্যে জন্ম হয়েছে দায়বদ্ধতার, সত্য ভাষণের অনিবার্য প্রেরণার। শেষপর্যন্ত তারাই পরিণাম ভয়শূন্য হয়ে ও দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে হয়েছেন জাগরিত, অস্তিত্ববান। ১৯৬২ সালের ছাত্র-আন্দোলন তাই আমাদের মানবিক জাতি সত্তার আত্মবিকাশের কাল হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে; আর এই জাগরণই, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সূচিত করেছে বৃহৎ মুক্তি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙালির রাজনৈতিক জাতিসত্তা।

চাঁদের অমাবস্যা রচিত হয় ১৯৬৩ সালে আর প্রকাশ পায় ১৯৬৪ সাল। *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলী পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিনিধি। অভ্যস্ত জীবনে, ঘুণ পোকার মতো বেঁচে থেকে সে নিঃশ্বেষিত হয়নি। পরিণাম ভয়শূন্য ও অন্ধকারময় প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে আরেফ আলী শেষপর্যন্ত সত্য উচ্চারণ করেছে, বরণ করেছে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। কেননা অমাবস্যা সত্য নয়, অমাবস্যা ক্ষণস্থায়ী, আলোই একমাত্র সত্য ও স্থায়ী। তার কারাবরণও তাই প্রতিরূপকী মূল্য পায়, ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচার, দাদাসাহেব-কাদেরদের ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে বৃহত্তর মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রামী ও সংঘবদ্ধ হওয়ার ডাক দেয়।

আমরা বলেছি, একটি মহৎ, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সবসময়ই বহুস্তর বিশিষ্ট, যুগপৎভাবে অন্তর ও বহিরাঙ্গিক বাস্তবতায় মহৎ ও ঐশ্বর্যবান। *চাঁদের অমাবস্যা* তাই আরেফ আলী-কাদের-দাদাসাহেবের কাহিনী হয়েও বাঙালি জাতির প্রতিবাদী সত্তার প্রতিরূপকী অভিব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল ও তাৎপর্যময়।

ভিক্টোরীয় উপন্যাসের মতো দৃঢ়-ব্যক্তিত্ব, সম্পদশালী সমগ্র কোনো নায়ক যুদ্ধোত্তর আধুনিক উপন্যাসে প্রত্যাশিত নয়। উপন্যাসের নায়কেরা অধুনা একটি বিশেষ সময়ের কণ্ঠস্বর (vocation), স্বতন্ত্র কোনো জীবনবোধের প্রতিভূ, অনেক সময় তারা পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েই পাঠকের সামনে হাজির হয়, নিজেদের মনোময়, অবিভাজ্য যন্ত্রণায় আমাদের জারিত করে।[৯৬] *লালসালু* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক প্রতিভার প্রস্তুতিপর্ব, গঠোন্মুখ কাল। ফলে এ উপন্যাসে বহিরাঙ্গিক দিক থেকে তিনি উনিশ শতকীয় উপন্যাসের চরিত্রনির্মাণ সূত্রই মূলত অবলম্বন করেছেন। মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিত চরিত্রের সাহায্যেই তিনি মজিদকে রূপায়িত ও *লালসালু*-কে বহির্বাস্তবতার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর করেছেন প্রতিষ্ঠিত। *চাঁদের অমাবস্যা*-য় তিনি ভিন্ন পথের অভিযাত্রী ও পূর্বাপেক্ষা মেধাবী। আধুনিক উপন্যাস-অভিজ্ঞান ও প্রকরণ-অনুসন্ধানী হয়ে আরেফ আলীকে ইয়োরোপীয় আধুনিক উপন্যাসের নায়কদের সহযোগী ও সহযাত্রী করে নির্মাণ করেও তিনি পূর্বের মতোই একটি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাত্যহিক বাস্তবতায় তাঁর উপন্যাসধৃত জীবনকে দাঁড় করিয়েছেন। দেশ-কালসংলগ্ন মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র বিশেষত, কাদের-দাদাসাহেব ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী প্রভৃতির মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রামীণ সমাজ-কাঠামো নির্মাণ করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের সমাজ-অবস্থান ও জীবনার্থ, গ্রামীণ শিক্ষা-ব্যবস্থা, আর্থিক কারণে সৃষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের পরিচয়ই *চাঁদের অমাবস্যা*-র বহির্বাস্তবতাকে করে তুলেছে জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। সে-অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* মানবিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তার রূপালেখ্য, সাহিত্যকৃতি হয়েও মূলত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ কোনো অঞ্চলের ইতিকাহিনী। উল্লিখিত চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিই বিস্তৃত কলেবরে চিত্রিত হওয়ার অবকাশ ছিল। একজন সাধারণ ও স্বভাব প্রতিভা-পরিচালিত ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ অবস্থায় প্রায়শই প্রলোভন সংবরণ সম্ভব হয় না। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নান্দনিক সংযম ছিল অসাধারণ, তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল প্রগাঢ়। ফলে তাঁর হাতে এ-সব চরিত্রের একটিও অকারণ দীর্ঘ, অপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হয়নি। একজন মেধাবী ও রূপদক্ষ স্রষ্টার মতোই তিনি প্রাগুক্ত চরিত্রগুলি ও তাদের পরিবেশকে রেখাভাসে, কোলাজের মতো নির্মাণ করেছেন। স্বল্পকালের জন্য উপস্থিত হয়েও তারা তাই পাঠকের সংবেদনা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

আরেফ আলীর পরেই উপন্যাসে যার উপস্থিতি সবচেয়ে দীর্ঘ সে কাদের। দাদাসাহেবের অন্তরঙ্গ ও স্মৃতিময় ভাবনা এবং আরেফ আলীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই কাদের হয়েছে প্রকাশিত ও চিত্রিত।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাদাসাহেবের সঙ্গে কাদেরের বয়সগত ব্যবধান প্রায় ত্রিশ বৎসরের। কাদেরের জন্মকালে দাদাসাহেবের 'ওয়ালেদ বয়োবৃদ্ধ'। শেষ-বয়সের সন্তান কাদেরের প্রতি তাই তার পিতার মাত্রারিক্ত স্নেহ ও প্রশ্রয় ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে

সমান্তরালভাবে কাদেরের স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বিকাশ ঘটেনি। সে তার 'অদম্য খেয়ালি ভাব, উগ্র মেজাজ এবং সৃষ্টিছাড়া দুরন্তপনা'–সহই বেড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে কাদেরের এই অন্তর্গত স্বভাব প্রশমিত ও সংযত হয়নি; বরং হয়েছে 'আরো তেজী'। বিদ্যালয়ে গেলেও স্কুলের শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতির প্রতি অনিষ্ঠ ও বীতশ্রদ্ধ কাদের কেবলই পরিজনদের কাছে 'বিদ্রোহী ছেলে' বলে পরিচিত হয়েছে, বিদ্যালাভ করতে পারেনি। কাদেরের আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে দাদাসাহেব তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে কাদেরকে 'ধর্মের ব্যাপারে শিক্ষা দানের চেষ্টা' করেন। অতঃপর কাদেরের কিছু 'আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে' বলে তিনি মনে করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কাদেরের চরিত্র ও চেতনাগত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বিবাহ-বিরোধী কাদের একদা বিয়ে করেছে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তার সদ্ভাব হয়নি। নিষ্কর্ম, অসামাজিক ও স্বল্পভাষী কাদেরের 'দরবেশ' খ্যাতিও দাদাসাহেবেরেই দান। তাঁর এ-রূপ বিশ্বাসের মূলে আছে কাদেরের নৈশবিহার, এক 'রাতে দরজার খিল খুলে' বহির্গত হয়ে 'পরদিন সকালে' রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে তার গৃহপ্রত্যাবর্তন। কিন্তু বাস্তবে কাদের দরবেশ নয়, ইন্দ্রিয়-শাসিত, ব্যক্তিগত ভোগবাদ-পরিচালিত, মাঝির বউয়ের হত্যাকারী। অন্যকে খুন করেও সে থাকে নিরুত্তাপ, আত্মকৃত অপরাধের জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। সে সর্বাবস্থায় অনুতাপশূন্য, সবকিছু ভোগ করেও নির্বিকার, মমতাহীন ও নিষ্ঠুর। কাদের ব্যক্তি নয় সমাজ-প্রতিনিধি, আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন সামন্ত শ্রেণীর উপভৌগিক মানসিকতারই দীপ্র প্রতিভূ, যাদের প্রভাব ও সামাজিক অবস্থানের কারণে সত্য প্রকাশ হয় বাধাগ্রস্ত, আর নিমজ্জিত অস্তিত্বের মানুষ হয় আরো নিমজ্জিত ও বিপন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ইচ্ছা, রিরংসার যূপে নিহত ও নিরুদ্দিষ্ট। বস্তুত, যুবক শিক্ষক আরেফ আলীকে অস্তিত্ববান করে তুলতে, তাকে শুদ্ধ সত্তায় জাগরিত করার প্রয়োজনেই উপন্যাসে কাদেরের আবির্ভাব। আরেফের প্রতিবাদও কাদের এবং কাদেররূপ সমাজ-শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে।

দাদাসাহেব আলফাজ উদ্দিন চৌধুরী 'বড়বাড়ির মুরব্বি'। পাঁচ বছর আগে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করছেন। পূর্বে গ্রামের সঙ্গে তার সংযোগ থাকলেও তা ছিল অনিয়মিত, তিনি কেবল 'ছুটি-ছাটাতেই দেশে আসতেন'। জীবনভর চাকরি করলেও কর্মক্ষেত্রে কোনো পদোন্নতি তাঁর হয়নি। কেননা 'মাজহাব-শরিয়ত ব্যাপারে সর্বদা' তিনি মশগুল থাকতেন। মনিবের বিধর্মিতায় কষ্ট বোধ করা ছাড়া নিজের চাকরি জীবন-সম্পর্কে তাঁর কোনো অভিযোগ কিংবা ক্ষোভ নেই। চাকরিজীবনের শেষে তিনি এই ভেবে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত যে, এখন তিনি 'নিজের সময়ের ষোল আনা মালিক হলেন।' অবসরপ্রাপ্ত দাদাসাহেব যত্নশীল হয়েছেন পারিবারিক শিক্ষায়। তাঁর বাড়ি ফেরার এক মাসের মধ্যেই পরিবারের সর্বত্র প্রবাহিত হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার বাতাস এবং ক্রমান্বয়ে তা আরো ঘনীভূত হয়ে তাঁর গার্হস্থ্য পরিবেশকে করেছে আমূল প্রভাবিত :

> প্রথম সপ্তাহে তিনি নির্দেশ দিলেন, বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে। শীঘ্র আর এক হুকুম হলো, কারো একটি নামাজ যেন কাজা না হয়। … তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তসবি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন ঘটলো যে ঝানু মোল্লামৌলবীদেরও তাক লেগে গেলো। মাথা নেড়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, দাদাসাহেব অসাধ্য সাধন করেছেন।[৯৭]

দাদাসাহেবের ধর্মবোধ তাঁরই নিজস্ব আদর্শ-লালিত। তিনি 'পরম সত্যে বিশ্বাসী' কিন্তু পারিবারিক অভিজাত্য বোধে বেশ গর্বিত ও অন্তর্লোকে স্ফীত। ওয়াজ-নসিয়ত করলেও দাদাসাহেব কাউকে কখনো ভর্ৎসনা করেন না। যদিও ধর্ম-প্রসঙ্গে কখনো-কখনো তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্যের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু সে-দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। দূর আমেরিকার কোনো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে অদেখা সেই ব্যক্তির স্মরণে ও সম্মানে তিনি তাঁর গৃহে নৈশভোজের আয়োজন করেন। ইসলামের বিজয় ইতিহাস বর্ণনা করলেও দাদাসাহেব কখনে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করেন না। কেননা, 'দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্রে মহৎ খলিফা উমর বা রশীদ-মামুনের কথা তুললে ইয়াজিদ-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-মুতাওয়াক্কিলের নৃশংসতা হীনতা বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না।'[৯৮]

লালসালু-তে এক সরকারি কর্মচারীর আমরা দেখা পেয়েছি। 'পায়ে বুট এঁটে' এবং 'বিদেশী পোশাক পরে' তিনি শিকারের সন্ধানে গিয়েছিলেন গারো পাহাড়ের নির্জন এলাকায়। কিন্তু তিনি ছিলেন 'ভেতরে মুসলমান'। 'দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান' শুনে এই 'খোলস পরা শিক্ষিত মুসলমান' কর্মচারীই 'চমকে' ওঠেন। অনুমিত হয়, এই উৎসমূল থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *চাঁদের অমাবস্যা*-র দাদাসাহেবকে নির্মাণ করেছেন। অবসর জীবনে দাদাসাহেবের অতিমাত্রায় ধর্মসংলগ্নতা তাই বিচ্ছিন্ন কিংবা বহিরারোপিত নয়, তাঁর জীবনবোধের গভীরেই তা ছিল প্রোথিত ও সংগুপ্ত।

দাদাসাহেবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনোয়ারা ও তার পুত্র ফজলু অন্যতম। দাদাসাহেবের কন্যা আনোয়ারা বিধবা, সপুত্র পিতৃগৃহে আশ্রিতা; আর এই জীবন বাস্তবতার কারণেই তার মধ্যে অনিকেত চেতনা প্রবল, অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণাবোধ প্রখর। 'রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে এসে উপস্থিত' হলেই তাই আমরা আনোয়ারার মনোবেদনা ও অসহায়ত্ব বোধের পরিচয় পাই। একই কারণে পুত্র ফজলু কখনো উচ্চকণ্ঠ হলে, এমন কি তা যদি তার বালক সুলভ কৌতূহল পূরণের জন্যও হয়, আনোয়ারা তখনই ছেলেকে চুপ করিয়ে দেয়; 'তুই চুপ কর ফজলু কথা বলিস্ না'।[৯৯]

দাদাসাহেব প্রতিষ্ঠিত স্কুলের পরিবেশ এবং শিক্ষকদের আচরণও *চাঁদের অমাবস্যা*-র বহির্বাস্তবতাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্কুলের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> প্রধান শিক্ষকের কামরার পাশে শিক্ষকদের বিশ্রামঘর। অসমতল মেঝের মধ্যখানে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল। তার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা কুর্সি। তবে একটি কুর্সির ওপর সর্বদা সকলের নজর। বুনটের ফাঁকে ফাঁকে সংখ্যাতীত পুষ্টাঙ্গ ছারপোকা, তবু সেটি বেতের তৈরি বলে আরামদায়ক। পিঠটা একটু হেলানো, দু-পাশে হাতলও আছে। আরামের বিনিময়ে রক্ত দিতেও কেউ দ্বিধা করে না।[১০০]

স্কুল-শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র যুবক শিক্ষকই বড়োবাড়িতে থাকে। তার প্রতি অন্য সব শিক্ষকের রয়েছে তাই গোপন ঈর্ষা। সুযোগ পেলেই তারা যুবক শিক্ষককে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে। এমনকি আরেফ আলী শারীরিক অসুস্থতা, বদ হজমের কথা বললেও তারা বলে : 'বড়বাড়ির উত্তম আহার হজম হয় নাই? তাজ্জব কথা'।[১০১]

মাঝির বউয়ের প্রতি কাদেরের 'স্নেহমমতা' আবিষ্কার করে আরেফ আলী যখন তার প্রতি 'ভক্তিশ্রদ্ধা'-আপ্লুত তখন তার মনে পড়েছে পূর্বস্মৃতি, সে হয়েছে অতীতে সমর্পিত। চাঁদপারা গ্রামে যুবক শিক্ষক-একদা একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু নিজের নমনীয় স্বভাব, চিত্ত-দৌর্বল্য ও তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা ভীতিবোধের কারণে তা সফল হয়নি। সর্বকালেই হৃদয়বৃত্তি ও বাস্তবের মধ্যে রয়েছে আযোজন পার্থক্য। যুবক শিক্ষক তাই কোনো বিশেষ চরিত্র নয়, তার মতো সমাজ-কাঠামোর মধ্যে বেড়ে-ওঠা নির্বিশেষ গ্রামীণ যুবকেরই সে বাস্তব প্রতিনিধি যারা ভালোবাসে অথচ আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল, সমাজে বিপন্ন-অস্তিত্ব।

টিফিনের সময় শিক্ষকদের 'গাম্ভীর্যের মুখোশ' খুলে যায় এবং ছাত্রদের মতোই 'হট্টগোল' করে, 'ব্যক্তিগত মতামতের ঢোল বাজায়'। মাঝির মৃত বউ তাই হয়েছে তাদের রঙ্গ-রসাত্মক আলোচনার বিষয় বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজ-নিরীক্ষণ প্রতিভা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় হিসেবেও স্মরণীয় :

> গ্রামের করিম মাঝির বউ। স্বামীর নাম কি ? ... নাম যা-ই হোক, সে লম্বা পাড়িতে ঘরছাড়া। ঘরে বিধবা মা, চোখে কম দেখে, বাতের ব্যথায় সব সময় গোঙায়। তার অবিবাহিত মেয়েও ঘরে। কানা, বিয়ে হবে না। বাড়ির পেছনে পুকুর, নদীটাও কাছে। দুটি গরু, একটি ছাগল, উঠোনের কোণে মোরগ-মুরগির খাঁচা। মাঝি বড় গতর খেটে কাজ করে।[১০২]

অর্থাৎ, মাঝির বউ ও মাঝির পরিবারের সদস্যরা জীবনকে অধৈর্যের মধ্যেই গ্রহণ করেছিল। কাদের ও মাঝির বউয়ের সম্পর্ক তাই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাজাত, তাদের মতো অবস্থার সব নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে তা সত্য।

বস্তুত, *চাঁদের অমাবস্যা*-র বহির্বাস্তবতা উপন্যাসটির মধ্যবর্তী কিংবা পরিপ্রেক্ষিত চরিত্র, তাদের জীবনাচরণকে আশ্রয় করেই কেবল রূপময় হয়নি, প্রধান চরিত্রের সমাজ-অবস্থানের মাধ্যমে তা সমান প্রকাশিত। আরেফ, কাদের, দাদাসাহেব, আনোয়ারা, ফজলু, মাঝির বউ ও তার মা, বোন—সবাই এক-একটি সমাজসত্তা,

আর্থ-সামাজিক পরিবেশেরই সৃষ্টি আর এই বিশেষ সমাজ-চৈতন্যই *চাঁদের অমাবস্যা*-র তাত্ত্বিকতা–ও দেশকাল-সংলগ্ন বস্তুভূমি, উপরি কাঠামোর অনিবার্য পরিচয়।

চাঁদের অমাবস্যা-র কাহিনী-সংগঠন ও আভ্যন্তর পরিচর্যা প্রথাবদ্ধ নয়। ঘটনার ক্রম-আরোহণ ও তার শীর্ষবিন্দুতে উর্ধ্বায়ণ অতঃপর অবরোহণ (fall) সৃষ্টির উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসের কাহিনী-গ্রন্থন রীতি, এমন কি *লালসালু*-র সুশৃঙ্খল ও পারম্পর্যময় ঘটনাবৃত্ত এ উপন্যাসে অনুসৃত হয়নি। অপার অতৃপ্তি বোধ, ঐতিহ্যানুরক্ত হয়েও নবতর ঐতিহ্য সৃষ্টি এবং সদ্য-স্বাতিক্রমণ প্রবণতা আধুনিকতার প্রাণবীজ হলে এ উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যথার্থই সেই যুগন্ধর বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। বস্তুত, আপাতত বিচ্ছিন্ন অনুকাহিনী (defused episodes), সময়ের ক্রম-পরিবর্তনশীলতা (varriation), বিকল্প কথা-আরম্ভ (alternative beginnings) রীতি,[১০৩] দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর সুচিন্তিত ও শিল্পিত ব্যবহারই *চাঁদের অমাবস্যা*-র সাংগঠনিক গৌরব, এর অন্তর্বয়নের আধুনিকতা তথা শৈল্পিক পরিচর্যা ও প্রাকরণিক অন্তর্বয়নের মৌল বৈশিষ্ট্য।

চাঁদের অমাবস্যা-র শিল্পসাফল্য কোনো একক প্রান্তসংলগ্ন নয়, তা আধুনিক উপন্যাস-সংগঠনের সামবায়িক ও সামূহিক রীতিপদ্ধতি পরিচর্চিত হলেও, ঘটনাবৃত্তের আবর্তন ও প্রধান চরিত্রের ঘটনাতাড়িত ব্যক্তিস্বরূপের তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিভাজন করা যায় :

প্রথম পর্যায় : পরিচ্ছেদ এক থেকে পরিচ্ছেদ চার।

দ্বিতীয় পর্যায় : পরিচ্ছেদ পাঁচ থেকে পরিচ্ছেদ এগার।

তৃতীয় পর্যায় : পরিচ্ছেদ বার থেকে পরিচ্ছেদ ষোল।

প্রথম পর্যায় উপন্যাসের মৌল সংকটের পুরোভূমি এবং সেই সমস্যা কীভাবে জটিল আবর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে ঘনীভূত ও প্রধান চরিত্রকে স্পর্শ, সংক্ষুব্ধ ও চেতনালোকে অস্থির করে তুলেছে তার ভিত্তিভূমি। এ-পর্যায়ে ঔপন্যাসিক আরেফ আলীর আর্থ-সামাজিক পরিচয়, তার শ্রেণীগত অবস্থান, মেধা ও জীবনদৃষ্টির স্বভাব ও স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। সামান্য, অনভিজ্ঞ, পরাপেক্ষী ও আশ্রিত আরেফ আলীর 'যুবক শিক্ষক আরেফ আলী'-তে পুনর্জাত হওয়ার ইতিকথাই এ-পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে দাদাসাহেবের সামাজিক অবস্থান, তাঁর জীবনাদর্শের স্বরূপ ও অন্তর্গত সত্তার বৈশিষ্ট্য, তাঁর চাকরি-জীবনের ইতিবৃত্ত এবং কাদেরের ব্যক্তিস্বরূপ, তার জন্ম-বাল্য-কৈশোর ও 'দরবেশ' হওয়ার পাঁচালি।

প্রথম পর্যায়ের ঘটনার উপরই দ্বিতীয় পর্যায় প্রতিষ্ঠিত এবং এ-পর্যায় পরিমাণের দিক থেকে প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বৃহৎ ও বর্ধিত কলেবর। এ-পর্বে নিজস্ব জীবনবৃত্তে আবর্তিত হলেও দাদাসাহেব যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর জীবনচর্যা, উপলব্ধি ও সংরাগ উপন্যাসে সূচিত করেছে গূঢ় ও দূরপ্রসারী মাত্রা। আরেফ আলীর মানস-চাঞ্চল্য, তার অন্তর্মূল চেতনার আবর্তন ও আলোড়নের যে-ধারাভাষ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বর্ণনা ঔপন্যাসিক এ-পর্যায়ে দান করেছেন তা স্বতন্ত্র অভিনিবেশ ও সবিশেষ আকর্ষণ দাবি করে। এ-পর্যায়কে তাই যুবক শিক্ষকের আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব-অন্বেষার সূচনা-পর্বরূপে চিহ্নিত করা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের তুলনায় তৃতীয় পর্ব কৃশ, মাত্র পাঁচটি পরিচ্ছেদের সমবায়ে গঠিত। কিন্তু উপন্যাসের চূড়ান্ত গ্রন্থিমোচন, ঘটনাবর্তের ক্লাইম্যাকস সৃষ্টিতে এ-পর্ব অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যময়। এক-অর্থে তৃতীয় পর্যায় যুবক শিক্ষকের যুগপৎ জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল; তারই পুনর্জাত ও মীমাংসিত চেতনার অধ্যায়। দাদাসাহেব ও তাঁর পরিবারের জন্যও এ-পর্যায় অপ্রত্যাশিত আঘাত, চরম অপমানের কালরূপে স্মরণীয়।

চাঁদের অমাবস্যা মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। কিন্তু প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা বৈচিত্র্যময়, ব্যাপকভাবে আরেফ আলী-নির্ভর হয়েও কাদের, কখনো দাদাসাহেবের প্রেক্ষণবিন্দু-আশ্রিত। উপন্যাসের সূচনাতেই গৃহীত হয়েছে আরেফ আলীর প্রেক্ষণবিন্দু ; তারই চেতনানুসারে ঘটনার বর্ণনা-কৌশল :

> 'শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-আঁধারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়।' [১০৪]

কিন্তু মাত্র বারোটি পরিচ্ছেদ পেরিয়েই ঔপন্যাসিক আরেফ আলীর আকস্মিক আচরণের মনস্তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন সহজ ভঙ্গিতে, তাঁরই দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর আলোকে:

> 'তখন বেশ রাত হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে যুবক শিক্ষক আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। শীতের গভীর রাত, কেউ কোথাও নাই। ঘরের পেছনে জামগাছ। তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে। কিন্তু আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। তখন চোখের ঘুমটা কেটে গেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে ছায়া, কিন্তু চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলাখেলা।' [১০৫]

এ-পর্বের কাহিনী উপস্থাপনায় কালের ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি। পাঠকের উৎকণ্ঠা ও অভিনিবেশ আকর্ষণের জন্য ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই উল্লম্ফনধর্মী পদ্ধতিতে পরের ঘটনা পূর্বে এবং পূর্বের ঘটনা পরে বিন্যাস করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদ-অন্তর্গত ঘটনার অন্তর্বয়নে পুনরায় আরেফই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিদিনের মতো যুবক শিক্ষক হাজির হয়েছে তার কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে। বিদ্যালয়টি গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনের মতোই বৈচিত্র্যহীন ও অনাকর্ষণীয় হওয়ায় ঔপন্যাসিক অনাসক্তভাবে, ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা সৃষ্টির মতোই বস্তুর অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশকে মূর্ত করেছেন। কিন্তু যুবক শিক্ষকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ামাত্রই দৃষ্টিকোণগত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। আরেফ আলীর অন্তর্লোকে কল্লোলিত ঘটনাকে তারই মগ্নচৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন :

> চুনবালিতে লেপা বাঁশের দেয়াল, কাঠের ঠাট, ওপরে তরঙ্গায়িত টিনের ছাদ। ছাত্রদের সামনে বার্ণিশশূন্য বেঞ্চিতে কালির দাগ, অনেক গ্রীষ্মের ঘামের ছাপ, এখানে–সেখানে ছুরির নির্দয় আঁচড়। [১০৬]

কিন্তু স্কুলঘরে উপবিষ্ট যুবক শিক্ষকের প্রতি তার চোখ পড়লেই বিন্যাস-কৌশলে এসেছে বৈচিত্র্য—

> অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার টেবিলের পেছনে বসে যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। গায়ে নিত্যকার মত সামান্য ছাতাপড়া, জীর্ণ সবুজ আলোয়ান, পরনে আধ-ময়লা সাদা পায়জামা, পায়ে ধুলায়-আবৃত অপেক্ষাকৃত নোতুন পাম্প-সু। [১০৭]

উদ্ধৃতাংশে মোট চারটি বাক্য আছে। প্রথম দুটি বাক্য উপরের বর্ণনার সঙ্গে অন্তঃসংগতিময়। কিন্তু শেষ দুটি বাক্যের লক্ষ্য ভিন্ন। ঘটনার আকস্মিকতায় নিথর ও নিরুচ্চার, ভীরু আরেফ আলীকে তার সেই মনস্তত্ত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেষ দুটি বাক্যের সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক হয়েছেন অধিক সচেতন। আরেফের মুদ্রাদোষ তাই তাঁর উপজীব্য হয়েছে। সে-অর্থে আগের ঘটনায় অনুসৃত কৌশল হয়ে পড়েছে পূর্বের রীতির সঙ্গে সমাত্ম যুবক শিক্ষকেরই চেতনালোকস্পর্শী।

'চার' পরিচ্ছেদে যুবক শিক্ষক প্রথম কাদের সম্পর্কে হয়ে উঠেছে জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী। ফলে কাদেরের 'দরবেশ'–রূপ তাকে করেছে আকৃষ্ট। কাদেরের শারীরিক গঠন থেকে শুরু করে তার সব গতিবিধিই আরেফ আলী মূল্যায়ন করেছে। এ-সব অংশের বর্ণনায় রয়েছে তাই যুবক শিক্ষকের প্রাধান্য; তারই অভিজ্ঞতা–স্পন্দিত প্রেক্ষণবিন্দুর মেধাবেগী ব্যবহার। কিন্তু আরেফ আলীর ঘরে কাদের উপস্থিত হলে প্রেক্ষণবিন্দু হয়েছে স্থানান্তরিত। এর পর এসেছে সেই মুহূর্ত। যুবক শিক্ষককে 'চলেন' বলেই তাকে কাদের তারই সঙ্গী হয়ে বাঁশঝাড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তখন আরেফের ব্যক্তিত্বও অনড় থাকেনি। তার পূর্বের আড়ষ্টতা হয়েছে অপসারিত এবং আত্মবিশ্বাসে ধরেছে ফাটল। সে-ক্ষেত্রে কাদেরই পেয়েছে শীর্ষস্থান, হয়ে উঠেছে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিত্ব। ফলে কাহিনী-কথনেও আশ্রিত হয়েছে কাদেরেরই প্রেক্ষণবিন্দু। কিন্তু বাঁশঝাড়ে প্রবেশের পর কাহিনী বর্ণনায় কাদেরের প্রেক্ষণবিন্দু অনুপস্থিত, তার প্রাধান্যও অন্তর্হিত এবং ঔপন্যাসিকই সার্বভৌম। সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত এ-পর্যায়ের একটি অনুচ্ছেদের বর্ণনা :

> তারপর বাঁশঝাড়ে সে কাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু কিছু না দেখে কিছু না অনুভব করে। সময় দীর্ঘ ঢেউ-এর মত ধীরে-ধীরে বয়ে যায়, চোখের অন্ধকার আরো নিবিড় কালো হয়, তার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় শিল-পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাবধানতাসত্ত্বেও বাঁশঝাড়ে নানাবিধ শব্দ হয়, প্রভূত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। যুবক শিক্ষক সে-সব শব্দের বা বাধাবিপত্তির কারণ বোঝে না,...। [১০৮]

লক্ষণীয়, কাদেরের সঙ্গে মাঝির বউয়ের মৃতদেহ বহনের সঙ্গী হওয়ার পর থেকে যুবক শিক্ষকের মধ্যে গভীর ও গূঢ় পরিবর্তন এসেছে। উপন্যাসের ঘটনাধারা উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও অতঃপর এসেছে বৈচিত্র্য। প্রায়শই দুটি দৃষ্টিকোণ

সমান্তরালভাবে হয়েছে গৃহীত। আরেফের পুনরাবৃত্ত জীবন-উপাখ্যান যে-সব অংশে বর্ণিত হয়েছে সে-সব অংশের বর্ণনায় আশ্রিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ। যেমন,

> সে-রাতে পড়ানোর অধিবেশন শেষ হলে যুবক শিক্ষক কুদ্দুসকে বলে, "কাদের মিএগকে ডেকে দেবে ?"[১০৯]

দশম পরিচ্ছেদে দাদাসাহেব শহরে গিয়েছেন তাঁর পীরের সঙ্গে দেখা করতে। দাদাসাহেবের কঠিন ও ঋজু ব্যক্তিত্বকে যুবক শিক্ষক ভয় পায়। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা ছাড়াও আরেফ পুরো ঘটনা নিরাসক্তভাবে মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছে। কাদেরের উপস্থিতি এ-পরিচ্ছেদে পরোক্ষ হওয়ার ফলে ঘটনা-উপস্থাপনায় উল্লিখিত ত্রয়ী চরিত্রের কোনোটিই প্রাধান্য পায়নি। সমগ্র দশম পরিচ্ছেদ ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। এ-পরিচ্ছেদের কথা আরম্ভ এভাবে :

> অপরাহ্নে সামনের উঠানে ছেলেমেয়েরা শোরগোল করে খেলা করে। দাদাসাহেব বাড়িতে নেই। সম্ভবত তাঁর পীরের সঙ্গে দেখা করতে শহরে গেছেন।[১১০]

এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তিও সেই একইভাবে, দূরবর্তী কোনো অবস্থান থেকে কাহিনীর বিবরণ দিয়ে, দর্শক-পাঠককে সত্যানুসন্ধানে আরো কিছুকাল জিজ্ঞাসু ও উৎকর্ণ থাকার আহ্বান জানিয়ে :

> তাছাড়া, কে দরবেশ কে দরবেশ নয়, সে-কথা কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বলতে পারে ?[১১১]

'বারো' পরিচ্ছেদে যুবক শিক্ষক 'বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি' নিরপেক্ষ দর্শকের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে। এ-পরিচ্ছেদে তাই দৃষ্টিকোণের বিষম ব্যবহার নেই। সমগ্র পরিচ্ছেদই লেখকের দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রচিত হয়েছে। কিন্তু 'তেরো' পরিচ্ছেদের পরিচয় একেবারেই স্বতন্ত্র। এর সূচনা ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দিবা-আরম্ভের গীতল ও মনোময় বর্ণনার মাধ্যমে :

> দীর্ঘ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নানা রকম মৃদু সঙ্কুচিত আওয়াজ শুরু হয়েছে : দিনাগমনের বেশি দেরি নেই।[১১২]

কিন্তু অনতিকাল পরেই যুবক শিক্ষক ও কাদেরের দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আরেফের ঘরে কাদের উপস্থিত। যুবক শিক্ষককে সে ভীতি প্রদর্শন করতেও সচেষ্ট। কিন্তু আরেফ মীমাংসিত ও প্রতিজ্ঞাদীপ্ত বলে কাদেরের কথায় তার অন্তর্গত ভাবনা সামান্য চোট পেলেও কোনোভাবেই তা বিচূর্ণিত হয়নি। সবকিছু সে তার নিজের মতো করেই গ্রহণ ও নিরীক্ষণ করেছে। আরেফের এই আত্মমগ্ন রূপের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক তারই অনুগামী ; আরেফেরই মগ্ন-চৈতন্যের সঙ্গী :

> সামনের দেয়ালে রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে। সে-রক্তিমাভার অর্থ যুবক শিক্ষক যেমন বোঝে না, তেমনি কাদেরের কথারও অর্থ সে বোঝে না। নিঃস্পন্দভাবে সে বসে থাকে ; সে যেন স্তূপাকার হাড়মাত্র।[১১৩]

এরপর এসেছে সেই 'পনের' পরিচ্ছেদ যেখানে যুবক শিক্ষক যথার্থই অস্তিত্ববান, দাদাসাহেবকে সব কথা বলে ও বড়োবাড়ির আশ্রয় ছিন্ন করে সত্যপ্রকাশার্থে থানার

উদ্দেশে যাত্রা করতে উদ্যত। এ-পরিচ্ছেদ যেমন যুবক শিক্ষকের দীপ্র প্রভায় আলোকিত তেমনি তা দাদাসাহেবকে অন্ধকার থেকে আলোয়, কাদের-সম্পর্কে তাঁর এতো দিনের লালিত বিশ্বাস বিচূর্ণ করে নব জিজ্ঞাসা ও পুরোনো মূল্যবোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এ-অবস্থায় ঔপন্যাসিকের কঠিন সংযম শিথিল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সব ধরনের চাঞ্চল্য ও আবেগকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে কখনো মেধাশাসিত আবেগ অসংগিত বিস্তার লাভ করেনি। পনেরো পরিচ্ছেদের সূচনাও তাই নির্ভার, স্রষ্টার নিরাবেগ প্রযত্নে উজ্জ্বলিত :

> দাদাসাহেব ফজরের নামাজ শেষ করে কারুকার্যময় রেহালে কোরান শরীফ রাখবেন এমন সময় একটি চাকর দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। এ-সময়ে তাঁর ধর্মীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি বিরক্ত বোধ করেন বলে চশমার ওপর দিয়ে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।।[১১৪]

কিন্তু চাকরটি 'মাস্টার দেখা করতে চায়' বলামাত্রই, দাদাসাহেবের চিন্তাপ্রবাহ হয়েছে বিপ্রতীপ গতিসম্পন্ন। তিনি হয়ে পড়েন স্মৃতিময়, অতীতচারী, কাদের-যুবক শিক্ষকের পূর্বসম্পর্ক স্মরণ করে এই 'দেখা করার' কারণ অন্বেষণে সচেষ্ট। ফলে বিন্যাসরীতি হয়েছে পরিবর্তিত, দাদাসাহেবের স্মৃতি ও অনুষঙ্গে পরস্পরিত :

> কাদের এবং যুবক শিক্ষকের মধ্যে হঠাৎ দেখাশুনা হলে তিনি কৌতূহলী হয়ে সেদিন শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাদের দেখাশুনার কারণ যুবক শিক্ষকের নিকট হতেই জানা সহজ হবে। কিন্তু সে কিছু বলতে রাজি হয় নাই। তার আচরণ এবং না–বলতে চাওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নাই। কি এমন কথা হতে পারে যা বলতে তার এত দ্বিধা ? অকারণে কাদেরের সেদিনের বিচিত্র দৃষ্টিও তার স্মরণ হয়। সে-দৃষ্টির অর্থও তিনি এখনো বুঝতে পারেন নাই।[১১৫]

আরেফ আলীকে দাদাসাহেবের সামনে উপস্থিত করতে গিয়ে আবারও অনাসক্ত ভঙ্গি, লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণই হয়েছে ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট :

> শূন্য বারান্দায় নিশ্চল হয়ে বসে যুবক শিক্ষক দাদাসাহেবের জন্যে অপেক্ষা করে। একটু দুর্বল দেখালেও মুখ শান্ত। নিদ্রাহীনতার জন্যে চোখে শুষ্কতা কিন্তু তাতেও অস্থিরতা–বিহ্বলতার স্পর্শ নাই। মেঝের সাদা-কালো ছকের দিকে তাকিয়ে ধীর-স্থিরভাবেই সে-ভাবে, অবশেষে দাদাসাহেবকে দুঃসংবাদটি দিতে এসেছে।[১১৬]

কিন্তু যুবক শিক্ষকের মনের গভীরে বিস্তার লাভ করেছে নানা ভাবনা, বিবিধ অনকূল ও প্রতিকূল চেতনাস্রোত। আর সেই আত্মবিচারণা, ইতি ও নেতিবাচক চেতনাপুঞ্জ উপস্থাপন করতে গিয়ে পুনরায় দৃষ্টিকোণ হয়েছে পরিবর্তিত, সর্বজ্ঞ লেখকের স্থলে আরেফ আলীর :

> বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি আসলে বড় অস্পষ্ট বলে মনে হয়। শুধু তা-ই নয়। যা সে বলতে এসেছে এবং যা দাদাসাহেবকে নিঃসন্দেহে ক্রূরভাবে আঘাত দেবে তা যেন ঘটনাটির সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে জড়িত।[১১৭]

'ষোল' পরিচ্ছেদে এ-রীতিই চূড়ান্ত সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। উত্তম পুরুষের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণনা শুরু হলেও এ-পরিচ্ছেদে সমীকৃত হয়েছে আরেফ আলীর

স্মৃতিময় অনুষঙ্গ। ফলে তা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের সম্প্রসারণ, ঘটনাগত ধারাবাহিকতা রক্ষা করেও লাভ করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। স্মরণীয়, 'ষোল' পরিচ্ছেদে যুবক শিক্ষক থানায় উপস্থিত, পুলিশ কর্মচারীদের প্রশ্নের মুখোমুখি, তাদের প্রদর্শিত ভয় ও প্রলোভন সত্ত্বেও অশংসয়িত, মীমাংসিত। কেননা বাইরের ঘটনা তখন তার কাছে মূল্যহীন; তারই মনোজগতে সংঘটিত নাটকেরই পুনরাভিনয়, অনুবর্তন বলে গৃহীত:

> সে বুঝতে পারে যে, পুলিশ কর্মচারী তাকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মত আচরণ করতে বলে যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করছে, সে-সব যুক্তিতর্ক সে যে শুধু জানে না তা নয়, সে-সব নিজেই সে ভেবে দেখেছে। পুলিশ-কর্মচারী নতুন কিছুই বলছে না; যা সে বলছে যুবক শিক্ষক তার মহড়া দিয়েছে অনেকবার।[১১৮]

বস্তুত, *চাঁদের অমাবস্যা*-য় সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের সার্বিক প্রাধান্য থাকলেও আরেফ আলীর আতঙ্কশিহরিত, অতিসংবেদনশীল ও অন্তর্গত প্রেক্ষণবিন্দুর উপস্থিতিতে এ উপন্যাস পরীক্ষাশীলিত ও প্রাগ্রসর।

জীবনবোধের প্রাগ্রসরতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *চাঁদের অমাবস্যা*-য় বিশ্বমনস্ক ও অস্তিত্ববাদী তত্ত্বসংলগ্ন হওয়ায় এ উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যা এবং ভাষাশৈলী নির্মাণে ঔপন্যাসিকের সেই আন্তর্জাতিক শিল্প-অভিজ্ঞতা হয়েছে উৎকীর্ণ। বস্তুত, ব্যক্তির অন্তস্থ আবেগ, আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তিমনের দুঃসহ আত্মনিরীক্ষার বহুভুজ প্রান্ত উন্মোচনের অনিবার্য প্রয়োজনেই *চাঁদের অমাবস্যা*-র পরিচর্যা ও ভাষারীতি হয়েছে প্রতীকী, অন্তর্নাটকীয়, বর্ণনাত্মক, উপমান চিত্রসংবলিত, চিত্রাত্মক ও চিত্রকল্পময়।

চাঁদের অমাবস্যা এক-অর্থে আরেফ আলীর স্বগতসংলাপ ; তারই সত্যানুসন্ধান, আত্ম-আবিষ্কার ও সত্য ঘোষণার রূপকল্প। আরেফ আলীর মনোজাগতিক অনুভূতিপুঞ্জের শব্দরূপ নির্মাণেই তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ হয়েছেন অধিক যত্নশীল ও আন্তরিক। এ-ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যত বিশ্লেষণাত্মক, চিত্রকল্পময়, কখনো প্রতীকী এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশবাদী পরিচর্যারীতিই অবলম্বন করেছেন। যুবক শিক্ষকের সামাজিক অবস্থান, অন্তর্গত সংকট, তার ভয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকালীন দোলাচল মানসিকতা উপস্থাপিত হয়েছে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে, সংবাদবহ গদ্যে :

১ দরিদ্র যুবক শিক্ষক, কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম। কষ্টে-সৃষ্টে নিকটে জেলা-শহরে গিয়ে আই এ পাশ করেছে, সুপরিচিত নদী-খাল-বিল-ডোবা-মাঠ-ঘাট সুদূরপ্রসারী ধান-ফসলের ক্ষেত্রের বাইরে কখনো যায় নাই। সমতল বাংলাদেশের অধিবাসী, পর্বতমালা কখনো দেখে নাই। বই-পুস্তকে, সাময়িক পত্রিকা সংবাদপত্রে কোন কোন পর্বতের ছবি দেখেছে, কিন্তু অনেক পর্বতের শুধু নামই শুনেছে। এন্ডিজ, উরাল, ককেসিয়ান, আলতাই পর্বতমালা। কত নাম।[১১৯]

২ দু'বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ-গ্রামে আসে। থাকার আশ্রয় পায় বড়বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়াও সেখানেই হয়। তার বদলে বড়বাড়িব ছেলেদের দুই-বেলা ঘরে পড়ায়। তার বিশ্বাস এই যে, যত নেয় তত সে দেয় না, কিন্তু সেটা দয়াশীল দাদাসাহেবেরই ব্যবস্থা।[১২০]

৩ তারপর বাঁশঝাড়ে সে কাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু কিছু না দেখে কিছু না অনুভব করে। সময় দীর্ঘ ঢেউ-এর মত ধীরে-ধীরে বয়ে যায়, চোখের অন্ধকার আরো নিবিড় কালো হয়, তার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় শিল-পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাবধানতা সত্ত্বেও বাঁশঝাড়ে নানাবিধ শব্দ হয়, প্রভূত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। যুবক শিক্ষক সে-সব শব্দের বা বাধাবিপত্তির কারণ বোঝে না, বোঝার তাগিতও বোধ করে না।[১২১]

আরেফ আলীর জীবনবিন্যাসের মধ্যে ভয় অন্যতম চালিকাশক্তি। মনোজগতে ঘনীভূত অন্ধকারের প্রতিচ্ছায়াই সে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছে। আতঙ্ক-শিহরিত আরেফ আলীর মনোবাস্তবতা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে তাই ভীতি-অনুষঙ্গবাহী শব্দপুঞ্জ। সমগ্র *চাঁদের অমাবস্যা*-য় ভীতি-বিসর্পিল অস্তিত্বদীক্ষার উপমান হিসেবে এ জাতীয় শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে মোট একশ পঞ্চাশ বার।[১২২] মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতিতে বিপন্ন আরেফ আলীর অস্তিত্বস্বরূপের পরিচর্যা আবার ভিন্ন। এ জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন মূলত দুটি চিত্রকল্প, নপুংশক কীট-পতঙ্গ এবং অন্ধকার গুহা :

১ তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে সে নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। শীঘ্র তার পিঠ শিরশির করে ওঠে। পিঠে সাপ চড়েছে যেন।[১২৩]

২ সে তার দিকে তাকিয়ে আছে বলে তার মুখটা **অন্ধকারে** ঢাকা। তারপর অস্পষ্টভাবে তার চোখ সে দেখতে পায়। সে-চোখে যেন পরম ঘৃণার ভাব। কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু, **শিড়দাঁড়াহীন নপুংশক কীটপতঙ্গ** কিছু।[১২৪]

৩ শ্রান্তভাবে যুবক শিক্ষক আপন মনে স্বীকার করে, তার চারধারে ঘোর **অন্ধকার**, যে-**অন্ধকারের** মধ্যে অন্ধের মতই সে প্রশ্নগুলি তৈরি করেছে। তবে তার সন্দেহ থাকে না যে, একবার কাদেরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ পেলে সব **অন্ধকার** দূর হবে।[১২৫]

সত্যানুসন্ধানে আত্মখননকারী ও বিপন্ন অভিজ্ঞতায় ক্রমসংকুচিত আরেফ আলী সবসময়ই ঔপন্যাসিকের মনঃসংযোগ ও মেধা আকর্ষণ করেছে। ফলে আরেফ আলীর চেতনাস্বরূপ বর্ণনায় অনেক সময় তিনি হয়েছেন এক্সপ্রেশনিস্টিক :

১ ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরী দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ-ধাঁধাঁনো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে।[১২৬]

২ ওপরে চাঁদ হেলে–দোলে, হয়তো হাসেও। নির্দয় চাঁদের চোখ মস্ত। যুবক শিক্ষক প্রাণভয়ে ছোটে।[১২৭]

৩ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত ধবধবে মাঠে কেউ নাই। দূরে একটা কুকুর বেদনার্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে। তাছাড়া চারধার নিঃশব্দ। এক চোখা চাঁদ সহস্র চোখে জনশূন্য পথপ্রান্তর পর্যবেক্ষণ করে। চাঁদ নয়, যেন সূর্য।[১২৮]

অন্তর্লোক ও অনুভূতি অকস্মাৎ পরিচিত এলাকা অতিক্রম করলে ব্যক্তির পরম সূক্ষ্ম চৈতন্যও হয় অনিবার্যভাবে রূপান্তরিত। আরেফ আলীর কাছে তাই পরিচিত প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, তার রূপ ও রং হারিয়ে লাভ করেছে এক অদ্ভুত, বিসদৃশ

আকার। তার দৃষ্টিসীমায় কুয়াশা রূপান্তরিত হয়েছে 'শিরদাঁড়াহীন সাদা বকরী'-তে আর জ্যোৎস্নাকে তার মনে হয়েছে সূর্যের আলোর চেয়েও তীব্র।

ঝড় এবং ঝড়ের অনুষঙ্গ *চাঁদের অমাবস্যা*-র আভ্যন্তর পরিচর্যায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং তা ব্যক্তির অন্তর্গত সংবেদনার সঙ্গে পরস্পরিত, আবার কখনো তা ব্যক্তির পরিণামী অস্তিত্বহীনতারই ইংগিতবহ উপাদান। যেমন, দাদাসাহেব কর্তৃক কাদেরের দরবেশ মাহাত্ম্য বর্ণনা :

> কিচ্ছা কাহিনীর আশা কিছুটা ছেড়ে দিয়ে তারা শোনে বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি। থেকে থেকে পশলা বৃষ্টি নাবে কিন্তু দুরন্ত হাওয়ায় সে-বৃষ্টি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। থেকে থেকে সে-হাওয়া ভীতিবিহ্বল অন্ধ পশুর মত জানালা-দরজায় ঝাপটা দিয়ে যায়।[১২৯]

চাঁদের অমাবস্যা-র শব্দ-ব্যবহার, নাম, প্রতিনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় পদের ব্যবহারেও ঔপন্যাসিকের সচেতনতার ছাপ স্পষ্ট মুদ্রিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে স্বল্প। কাদের কিংবা দাদাসাহেবের সংলাপ, তাদের জীবনচিত্র ও জীবনবোধ নির্মাণের ক্ষেত্রেই কেবল আরবি-ফারসি শব্দের সুনির্বাচিত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যত্র তৎসম শব্দেরই আধিক্য। শব্দ-ব্যবহারের এই সচেতনতার কারণে *চাঁদের অমাবস্যা*-র গদ্য হয়ে উঠেছে সুসংহত ও ঘনসংবদ্ধ :

> গত রাতেই সে বুঝতে পারে, দেখার চেষ্টা না করলে হয়তো কাদেরের সঙ্গে বহুদিন দেখা হবে না। এমনিতে দেখা হওয়ার সুযোগ-সুবিধা কম। যুবক শিক্ষক নিজে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত থাকে। দীর্ঘ দিনব্যাপী ইস্কুল আছে, দু-বেলা ছেলেমেয়েদের পড়াতেও হয়। অতএব সে স্ব-ইচ্ছায় দর্শন না দিলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা দৈবাৎ ঘটনার মতই অনিশ্চিত। এ ক'দিন সে অপেক্ষায় থেকেছে, কিন্তু তার দেখা পায় নাই। স্পষ্ট বোঝা যায়, কাদেরের মনে তার সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছা নাই। থাকলে সে আসতো। কাদেরের এ-নিস্পৃহতার অর্থ সে বোঝে না। তার রহস্যময় ব্যবহারের ফলে যুবক শিক্ষকের মনে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে যে-তীব্র ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সযত্নে সাজানো নানা প্রশ্ন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। প্রশ্নগুলি আর দরকারিও মনে হয় না। তার সঙ্গে একবার দেখা হলেই সে যেন তার উত্তর পাবে, মনেরও নিদারুণ বিহ্বলতা কাটবে।[১৩০]

এ উদাহরণে একটি ইংরেজি ও একটি ফারসি শব্দ ছাড়া আর কোনো বিদেশি শব্দ নেই। এ গদ্য তাই সংস্কৃতানুগ, তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ অন্বয়ে শৃঙ্খলিত হয়েই গতিশীল।

একটি শব্দবন্ধ, অনুবাক্যের পৌণঃপুনিক ব্যবহার *চাঁদের অমাবস্যা*-য় প্রতিরূপকী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ঔপন্যাসিক বারবার আরেফ আলীকে 'যুবক শিক্ষক' বলে উল্লেখ করেছেন। স্মরণীয়, *চাঁদের অমাবস্যা*-র স্তর গভীরে ঔপন্যাসিকের সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-মানসের অভিব্যঞ্জনা রয়েছে। ১৯৬২ সালের ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে

জাগ্রত পূর্ববাংলার অধিবাসীদের চেতনাকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আরেফ আলীর অস্তিত্ববাদী জাগরণের সঙ্গে করেছেন সমীকৃত। সে-ক্ষেত্রে 'যুবক শিক্ষক' শব্দদ্বয় অভিধামুক্ত, আমাদের তারুণ্য, বিবেক ও প্রতিবাদী চেতনারই প্রতিরূপক।

চাঁদের অমাবস্যা-য় অনেক সময় পূর্ববর্তী বাক্যের অন্তর্গত নামপদের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে। ফলে ভাষায় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা হয়েছে কখনো সাংগীতিক আবার কখনো মাধুর্যমণ্ডিত :

> শিক্ষকের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে, তার সংযমের লাগাম ছেড়ে **শোরগোল** শুরু করেছে এবং সে-**শোরগোল** এমন এক উচ্চ খাদে উঠেছে যে সেখানে ব্যক্তিগত কণ্ঠের কোন চিহ্ন নাই।[১৩১]

প্রতিনাম পদ 'সে'-এর আধিক্যই *চাঁদের অমাবস্যা*-য় প্রবল এবং তা কেবলই বিশেষ্যের স্থলে প্রযুক্ত হয়নি, বাক্যের বিধেয়ের বিকল্প হিসেবেও গৃহীত হয়েছে :

> হঠাৎ সে বুঝতে পারে, তার ভয়ের কারণ নাই। যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অর্থ সে জানে না, সে-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জড়িত বোধ হলেও আসলে সে জড়িত নয়। শুধু সে নয়, কাদেরও তার সঙ্গে জড়িত নয়। ··· সারাদিন যে-মন স্তব্ধ হয়েছিলো, সে-মনের প্রশ্নের এ-বিস্ফোরণে সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তবে নৈর্ব্যক্তিক দর্শকের যে পরম স্বস্তিভাব সে বোধকরে সে-স্বস্তিভাব আরো গাঢ় হতে থাকে।[১৩২]

একই প্রতিনাম পদের ব্যবহার-আধিক্যে ভাষারীতি আড়ষ্ট, শ্লথগতি মনে হলেও তা অবশ্যই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *চাঁদের অমাবস্যা*-র গদ্যরীতির একটি লক্ষণীয় প্রবণতা।

চাঁদের অমাবস্যা-র বাক্যগঠনও সর্বত্র সরল নয়, তা কখনো যৌগিক, পদান্বয়ী ও সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহারে দীর্ঘ ও প্রলম্বিত, কখনো আবার তৎসম ক্রিয়ার সঙ্গে দেশজ ক্রিয়াপদের ব্যবহার-সংকরে সবল ও বেগবান :

১ সে নদীরই মত এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে কেমন উদ্দেশ্যহীন-ভাবে, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্তে গন্তব্যস্থলে পৌছুবে।[১৩৩]
২ একবারও যুবক শিক্ষকের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটে না কিন্তু উত্তরের তীব্র প্রত্যাশায় তার সমস্ত দেহ পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে।[১৩৪]
৩ সে-কৃতজ্ঞতা এই জন্যে যে, মানুষের ভাগ্য খামখেয়ালী এবং নির্মম হলেও মানুষ মায়া-মমতাশূন্য নয়, অতি নিস্পৃহের নিকটও অন্যের জীবন মূল্যহীন নয়।[১৩৫]
৪ দ্রুতগামী কাদেরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি ঝোঁক চাপে তার মাথায়।[১৩৬]
৫ একটা কথায় যুবক শিক্ষকের মনে শীঘ্র খটকা লাগে।[১৩৭]
৬ একটা উত্তর ঝট্-করে মাথায় আসে।[১৩৮]

সংলাপ বিরলতাও *চাঁদের অমাবস্যা*-র পরিচর্যা রীতি ও ভাষা-সংগঠনের একটি বিশেষ প্রান্ত যা সমালোচকদেরও[১৩৯] মেধাবী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্মরণীয়, মহৎ উপন্যাসমাত্রই একটি জৈবিক সমগ্র সৃষ্টি। কোনো বিশেষ এলাকার উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষের উপর এর শিল্প-সাফল্য নির্ভর করে না। স্রষ্টার অখণ্ড মানস-প্রেরণার

আলোকেই উপন্যাসকে বিচার করতে হয়। *চাঁদের অমাবস্যা*–য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌল শৈল্পিক প্রেরণা আরেফ আলীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও রহস্যময় মনোজগৎ: তার অস্তিত্ব-অভীপ্সার রূপকল্প নির্মাণ ; আর এ জন্যই ব্যক্তির কথোপকথনের উপর নয়, সমগ্র আরেফ আলীর প্রতিই স্রষ্টার মনোযোগ থেকেছে সর্বদা নিবদ্ধ।

বস্তুত, *চাঁদের অমাবস্যা* আরেফ আলীর 'রক্তাক্ত পথ অতিক্রমণের এক নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ[১৪০] হওয়ায় এর উপস্থাপনা রীতিও সাংগঠনিক অন্তর্বয়ন প্রথাসিদ্ধ নয়, ঔপন্যাসিকের ব্যাপ্ত মেধা ও প্রসারিত শিল্প-অভিজ্ঞতা পরিস্রুত এবং ঐতিহ্যলগ্ন হয়েও তা ক্রম-অগ্রসর।

কাঁদো নদী কাঁদো

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৪৮) ঘটনাগত বিন্যাস, আভ্যন্তর অন্তর্বয়ন কিংবা ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি—কোনো দিক থেকেই *লালসালু* (১৯৪৮) অথবা *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪)-র অনুসৃতি, অনুবর্তন নয়। *কাঁদো নদী কাঁদো* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয় থেকে স্বতন্ত্র, ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষাপ্রিয় এবং বিশ্বপ্রসারী জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ।

কাঁদো নদী কাঁদো-র ঘটনা দুটি স্রোতধারা অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তর্মুখি চেতনা ও কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহকে আশ্রয় করে হয়েছে উৎসারিত ও প্রবাহিত। সে-অর্থে উপন্যাসটি মুহাম্মদ মুস্তফার কথামালা হয়েও তা কুমুরডাঙ্গার উপাখ্যান।

'অতিশয় দুর্বৃত্ত' পিতা খেদমতুল্লার সন্তান মুহাম্মদ মুস্তফা দুঃসহ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষানবিশি শেষে কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। ইতোমধ্যে 'তসলিম নামক একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বন্ধুর ঘটকালিতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক' হয়। যথাসময়ে মুহাম্মদ মুস্তফাকে বিয়ের নির্ধারিত তারিখটি জানিয়ে সে–মতো উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হয়। মুহাম্মদ মুস্তফাও বাড়িতে চিঠি লেখে, মা আমেনা খাতুনকে বিয়ের কথা জানায়। কিন্তু মায়ের সম্মতির পরিবর্তে সে একটি দুঃসংবাদ পায়। 'চৌধুরীদের ছেলে' লিখেছে: 'মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে খোদেজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।'[১৪১] অর্থাৎ, ফুপাত বোন খোদেজার এ পরিণতির জন্য মুহাম্মদ মুস্তফাই দায়ী।

খোদেজার আত্মহত্যার জন্য মুহাম্মদ মুস্তফাকে দায়ী করার মূলে আছে একটি পারিবারিক 'প্রতিশ্রুতি'। 'বিধবা হয়ে ছয়-সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুপু যখন উত্তর-ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ খেদমতুল্লা বোনের দুঃখে দুঃখপরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে।'[১৪২]

মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণও এই প্রতিশ্রুতিকে পরোক্ষে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। 'প্রতিবার দেশের বাড়িতে আসবার সময় খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসতো।'[১৪৩] কিন্তু দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার্থে দূরে চলে-আসা মুহাম্মদ মুস্তফা কখনোই খোদেজাকে তার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী ভাবেনি। তার শ্রেণী-অবস্থানও তা অনুমোদন করে না। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তরে খোদেজার স্থান না-থাকলেও এর বিপরীত অবস্থান সম্ভব। খোদেজার পক্ষে সেই অতীত প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভাবা বিচিত্র নয়। বস্তুত, মুহাম্মদ মুস্তফার 'চিঠি আসার কিছুক্ষণ পরেই [খোদেজার] মৃত্যু ঘটেছিলো' বলে পরিবারের সবার ধারণা জন্মে যে. মুহাম্মদ মুস্তফার 'চিঠিই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।' মানুষের অন্তর্লোক সবচেয়ে দুর্গম, বুদ্ধি-বিবেচনার অনধিগম্য এক এলাকা। মানুষ নিজেই অনেক সময় তার মনের খবর জানে না। তাই সজ্ঞানে, নিজের চেতন সত্তায় নির্দোষ বলে মনে হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার অবচেতন মনে অপরাধবোধ জাগে। অতঃপর সে বিয়ের নির্ধারিত তারিখটি পিছিয়ে দেয়। কিন্তু কুমুরডাঙ্গা থেকে ঢাকা রওনা হওয়ার রাতেই মুহাম্মদ মুস্তফার প্রচণ্ড জ্বর হওয়ায় সে আবারও বিবাহ-মজলিসে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়।

খোদেজার মৃত্যু, প্রচণ্ড জ্বর, যাত্রায় বিঘ্ন ইত্যাদি ঘটনা ক্রমান্বয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তর্লোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এক পর্বে তার নিজেকে খোদেজার হত্যাকারী বলে প্রত্যয় জন্মে: 'তার মনে হয়, বাড়ির লোকদের কথাটি অস্বীকার করার সত্যি আর কোন উপায় নাই।'[১৪৪] কেননা, 'এক জোট হয়ে সকলে একটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছে তা সম্ভব নয়।'[১৪৫] দ্বিতীয়ত, মুহাম্মদ মুস্তফা ' কিছু লক্ষ্য না করলেও তারা সব লক্ষ্য করেছিলো, সব জানতে পেরেছিলো। ... পিতৃহীনা, আশ্রিতা মেয়েটির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব স্বপ্ন স্নেহমমতা পরজীবী উদ্ভিদের মত মুহাম্মদ মুস্তফাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছিলো, তাকে জড়িয়েই বেঁচেছিলো, সে মুহাম্মদ মুস্তফার যোগ্য কিনা বা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে তার প্রতি কোন স্নেহমমতা ছিলো কিনা— সে-সব প্রশ্ন একবারও তার মনে জাগেনি।'[১৪৬]

অতঃপর তসলিমের আবারও চিঠি এসেছে। আশরাফ হোসেন চৌধুরী তাঁর মেয়ের বিয়ের দিনটি এবার 'পীরের উপদেশ নিয়েই স্থির করবেন।' কেননা, 'মেয়ের বিয়ের ধার্য-দিন দু-বার ভাঙতে হয়েছে বলে লোকেরা নানা কথা বলতে পারে।' কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা তসলিমের সে-চিঠির কোন জবাব দেয়নি। পরিবর্তে সে 'একটি ভয়ানক সিদ্ধান্ত' গ্রহণ করেছে, ঢাকা না-গিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা উপস্থিত হয়েছে 'সোজা দেশের বাড়িতে' আর মাত্র একদিন পরই শোনা গেছে মুহাম্মদ মুস্তফার মার স্নায়ুছেঁড়া সেই আর্তনাদ, দেখা গেছে সেই অভাবিত, অত্যন্ত করুণ দৃশ্য : 'তেঁতুলগাছের তলে বাল্যবয়সের একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিল সে গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা।'[১৪৭]

মুহাম্মদ মুস্তফা ভীতু, বাল্যকাল থেকেই 'কারণে-অকারণে' তার 'মনে ভয়' জাগে; আবার ' জীবন-মৃত্যু দুটিকেই সে অতিসহজে' গ্রহণ করতে পারে। তার মতে, 'আলো-অন্ধকারের মত জীবন এবং মৃত্যু পাশাপাশি বাস করে একই নদীতে মিলিত দুটি ধারার মত গলাগলি হয়ে প্রবাহিত হয়'। অতিসাবধানতাও মুহাম্মদ মুস্তফা-চরিত্রের অন্যতম অন্তর্লক্ষণ এবং সে 'জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকে অসাবধান হয়ে কখনো কিছু করেনি, অসতর্কভাবে কখনো এক পাও নেয়নি।'[১৪৮] মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে আবাল্য যে-'উচ্চাশা' সে-বিষয়ে ' কখনো আপন মনেও স্পষ্টভাবে ভাবতে সাহস করেনি এই ভয়ে যে তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলে কোথাও কোন হিংসাত্মক শক্তি তাকে ধ্বংস করার জন্যে খড়্গহস্ত হবে'। সে-দিক থেকে *চাঁদের অমাবস্যা*-র যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য, স্বভাব-ধর্মের প্রাথমিক ঐক্য রয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা আরেফ আলী নয় বরং ঔপন্যাসিকের স্বতন্ত্র বক্তব্যের ধারক, তাঁরই একটি ভিন্ন মানস-প্রেরণাসৃষ্ট জৈবিক সত্তা। কেননা, বড়োবাড়িতে আশ্রিত যুবক শিক্ষক ভীতু, পৌণঃপুনিক অন্ধকার ও গভীর মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েও দুশ্চিন্তা, আনিশ্চয়তাবোধ, আত্যন্তিক মানস-যন্ত্রণা (agony), সুতীব্রভাবে ভীতিপ্রদ অবস্থা (dread)-র মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে জাগরিত, প্রতিবাদী ও অস্তিত্ববান। স্মরণীয়, ব্যক্তি চৈতন্যে যখন অন্ধকার ঘনীভূত, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অন্তর্লোকে সে যখন সংরক্ত হয় তখন স্বাধীন নির্বাচন (free choice)-ই তাকে করে অঙ্গীকারবদ্ধ (responsible), মুক্ত ও শুদ্ধ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।[১৪৯] সে-ক্ষেত্রে মুহাম্মদ মুস্তফা দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রমণের যন্ত্রণা ও মনোবিপর্যয় সহ্য করতে ব্যর্থ, আর এই অপারগতার যন্ত্রণা, অবচেতন মনের দায়ভারের বেদনাই তাকে করেছে বিষাদময়, আত্মসমাহিত, মনোবিবরে সমর্পিত এবং শেষপর্যন্ত আত্মবিনাশী।

বস্তুত, মানুষ একা অস্তিত্ববান হয়ে উঠলে তার সেই সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় সামগ্রিক মুক্তি মেলে না। আরেফ আলীর সত্য ঘোষণা, স্বেচ্ছা-কারাবরণও কেবল তার ব্যক্তিগত মানবিক অস্তিত্বকেই সুদৃঢ় করেছে, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নির্বিশেষ মানব-অস্তিত্বে তাকে সংহত হতে দেয়নি; আর তা তখনই সম্ভব হয় যখন সমাজের সকল স্তরের মানুষের মানবিক অস্তিত্ববোধের জাগরণ ঘটে, তারা সামগ্রিকভাবে কোনো অভিন্ন শর্তে হয় সংগঠিত। মুহাম্মদ মুস্তফার মৃত্যু তাই অনিবার্য। অন্যথায় সে হতো আরেফ আলীরই প্রতিচ্ছায়া, ঔপন্যাসিকের আত্ম-অনুকরণেরই সপ্রাণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো ঔপন্যাসিকের তা অন্বিষ্ট ছিল না। নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার ধর্ম। *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে তিনি সে-প্রতিশ্রুতিসহই উপস্থিত আর তা সন্ধান করতে হয় কুমুরডাঙ্গার কাহিনীতে, এই জনপদের মানুষদের মধ্যে।

মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী সংক্ষিপ্ত, তার ও তার পরিবারের মধ্যেই বিসর্পিত। কিন্তু কুমুরডাঙ্গার উপাখ্যান সুদীর্ঘ কলেবরে বিস্তৃত, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সামবায়িক উপস্থিতি অগ্রসরমান। ফলে কোনো একক চরিত্র কিংবা পরিবার এ-পর্যায়ে ঔপন্যাসিকের সবিশেষ অভিনিবেশ আকর্ষণ করেনি। সমগ্র জনপদের প্রতিই রয়েছে তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

কুমুরডাঙ্গার নিস্তরঙ্গ ও পুনরাবৃত্ত জীবনের জাগরণ আকস্মিক। বাকাল নদীতে চর পড়ে স্টীমার চলাচল বন্ধ অর্থাৎ, বহির্বিশ্ব থেকে এই ক্ষুদ্র মফস্বল শহরটি বিচ্ছিন্ন হলেই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের তাই দ্বিবিধ পরিচয়। প্রথমত, তারা চলমান জীবন-স্রোতের সঙ্গে সমীকৃত। দ্বিতীয়ত, স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট তাদের দুর্ভাবনা ও পরিণামী অনিশ্চয়তাবোধে বিপন্ন অন্তঃকরণ-জাত প্রতিক্রিয়াসহ তারা উপস্থিত।

কুমুরডাঙ্গার বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজ-অবস্থান থেকে ঔপন্যাসিক যে-সব চরিত্র নির্বাচন ও নির্মাণ করেছেন তাদের মধ্যে খতিব মিঞা, কফিলউদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, হাবু মিঞা, রহমত মিঞা, তাহের, সুলতান, রোকনউদ্দিন, মোহনচাঁদ, ছলিম মিঞা, করিমন নেসা বানু, মিহির মণ্ডল, ইমাম মিঞা, কনু মিঞা ও সুরত মিঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খতিব মিঞা ঘাটের স্টেশন মাস্টার। স্টীমার না-আসার সংবাদ প্রথম কোম্পানির সদর দফতর থেকে প্রেরিত 'তার' মারফত জেনেছে। খতিব মিঞার দীর্ঘ কর্মজীবনে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। ফলে সংবাদের আকস্মিকতায় সে হয়ে পড়েছে 'বিচলিত'। অতঃপর সে, টিকিট-কেরানিকে নোটিশ টাঙিয়ে দিতে বলেছে'। খতিব মিঞা জানে যাত্রীরা অধিকাংশই নিরক্ষর, কাগজে লেখা সংবাদ তাদের কাছে পৌছবে না। তৎসত্ত্বেও 'লিখিত নোটিশ জারি করা অলংঘনীয় আইন' বলে সে মনে করে। 'কুমুরডাঙ্গা থেকে রাশি-রাশি কলা চালান যায়।' স্টীমার না-চললে কলাচাষীদের দুর্ভোগ বাড়বে, আর্থিকভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসী বলে খতিব মিঞার তাই কলাচাষীদের কথাই মনে পড়েছে। নিজের অজান্তেই সে বলেছে: 'কলাগুলো পচবে'।

দীর্ঘদিন একই কর্মে নিয়োজিত থাকায় খতিব মিঞা যাত্রীদের সম্পর্কে একটি বিরল প্রতীতি লাভ করেছে। স্টীমারঘাটে যাত্রীদের শ্রেণী-পরিচয় জানতে তাকে তাদের 'চেহারাপোশাক-পরিচ্ছদ আচরণ-ব্যবহার লক্ষ্য করে দেখতে হয় না।... পায়ের শব্দে বা গলার আওয়াজেই সে বুঝে নেয় কোন যাত্রী উচ্চ-শ্রেণীর, মধ্যম-শ্রেণীর বা নিম্ন-শ্রেণীর'।[১৫০]

খতিব মিঞার মতে, স্টীমার বন্ধের ঘোষণা দেওয়ায় তার 'মান-ইজ্জত নয় কোম্পানির মান-ইজ্জতই সঙ্কটাপন্ন' হয়ে পড়েছে : 'কোম্পানির নামে সে যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলে তাহলে কোম্পানির মান-ইজ্জত যাবে।'[১৫১] বস্তুত খতিব মিঞা সেই কর্মচারী যে নিজের থেকেও কোম্পানির প্রতি বিশ্বস্ত, নিয়োগ-কর্তৃপক্ষের প্রতি অতি মাত্রায় নিষ্ঠ থেকে কর্তব্য পালনের মধ্যেই খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা, কর্মসম্পাদনের সন্তুষ্টি ও আত্মিক আনন্দ।

কফিলউদ্দিন কুমুরডাঙ্গার সবচেয়ে ব্যবসা-সফল আইনজীবী। শহরের 'নদীমুখো' এবং অন্যান্য বাড়ির তুলনায় 'মস্ত বড় বাড়ি'-র সে মালিক। কফিলউদ্দিনের এ সৌভাগ্য পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত নয়, নিজের কর্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তা অর্জিত। উকিল কফিলউদ্দিনের একটি নিজস্ব দর্শনও রয়েছে। তার মতে, 'স্নেহকাতর

-উকিলের ওপর মক্কেলদের বিশ্বাস কম হয়: উকিলের মধ্যে হৃদয়হীন চরিত্রেরই সন্ধান করে তারা।'[১৫২] তৎসত্ত্বেও তার মধ্যে স্নেহাধিক্যই প্রবল। 'শহরবাসিনী অতি আদুরে মেয়ে' হোসনাকে অধিক দিন না-দেখে কফিলউদ্দিন থাকতে পারে না। নদীপথে তাই প্রায়শই তাকে শহরে যেতে হয়। একদা সে-উদ্দেশে নদীর ঘাটে পৌঁছেই কফিলউদ্দিন শোনে : ' স্টীমার আসবে না, নদীতে চড়া পড়েছে'। কিন্তু এই সহজ সত্যি কথাটি সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে, স্টীমার বন্ধ হওয়া ষড়যন্ত্রমূলক। কফিলউদ্দিন অতঃপর ' কয়েকজন উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়'-এর একটি সভা ডেকেছে এবং বলেছে : ' স্টীমারের লোকদের প্রবঞ্চনা যদি কার্যকরী হয় তবে কুমুরডাঙ্গা শহরের–ভীষণ অবস্থা হবে'। কিন্তু তার উৎকণ্ঠা সবাইকে সমভাবে স্পর্শ করেনি। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, 'এ বিষয়ে জোর কলমে সরকারের কাছে পত্র' লেখার।

কফিলউদ্দিনের আশঙ্কা ক্রমান্বয়ে সত্যে পরিণত হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা বুঝেছে যে, চড়া নদীতে নয়, শহরবাসীদের বুকেও তা 'ভার হয়ে জেগে' উঠেছে। 'ঝোঁকের মানুষ' কফিলউদ্দিন অতঃপর স্থির করেছে যে, 'তার পক্ষে কুমুরডাঙ্গা বাস সম্ভব নয়'। অতঃপর সবার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে কফিলউদ্দিন বজরায় ওঠে। কিন্তু কফিলউদ্দিনের আর কুমুরডাঙ্গা ছাড়া হয়নি, নদীর ঘাটেই তার মৃত্যু হয়েছে।

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন ' অকাল বৃদ্ধ', চল্লিশে পৌঁছনোর পূর্বেই শিরদাঁড়া-বক্র, ন্যুব্জ। তার মাথার অর্ধেক চুল সাদা এবং নিজের পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কেও তার তেমন সচেতনতা নেই। বোরহানউদ্দিনের মুখে সর্বদা একটি 'নিরানন্দ ভাব' মুদ্রিত থাকলেও তাকে কেউ 'আফসোস-অনুশোচনা' করতে শোনেনি। রোগীদের কাছে একজন 'নিতান্ত ভালোমানুষ' বলে পরিচিত বোরহানউদ্দিন পেশাগত জীবনে অসুখী ও অতৃপ্ত। কারণ সে জানে, ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে 'চিকিৎসার অর্থ আজরাইলের সঙ্গে এক পক্ষীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া'। তা ছাড়া অধিকাংশ রোগীই তার কাছে সময় মতো আসে না, অনেকেরই ওষুধপথ্য কেনার সামর্থ্য নেই। কুমুরডাঙ্গার স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ার ঘটনা তাই উকিল কফিলউদ্দিনকে যেভাবে স্পর্শ ও বিচলিত করেছে বোরহানউদ্দিনকে তা সেভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করেনি। কুমুরডাঙ্গায় চিকিৎসার জন্য আসা অধিকাংশ রোগীরই বাহন হচ্ছে নৌকা। বস্তুত, মানুষ সবকিছু নিজেকে দিয়েই বিচার করে, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা না-থাকলে তার অনুভূতির তেমন রূপান্তর ঘটে না, অভ্যস্ত জীবনপ্রবাহেই সে নিমজ্জিত থাকতে চায়। ডাক্তার বোরহানউদ্দিনও এ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, চলমান ও পরিচিত জীবনপ্রবাহে সমর্পিত হয়ে মুক্তি-অন্বেষী, লোকজীবনেরই সে প্রতিনিধি, প্রতিভূ।

হাবু মিঞা স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট সঙ্কটের অন্যতম শিকার। তার বার বছরের মৃত-প্রায় ছেলের চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু স্টীমারের অভাবে সে তা পারছে না। রতনলাল মুহুরির ছেলের মুখে হাবু মিঞা শুনেছে : 'স্টীমার আজই আসবে'। হাবু মিঞার বিশ্বাস ছিল স্টীমার আসবে। কিন্তু সে-আগমন যে এতো আসন্ন

সে তা ভাবেনি। দুপুরে বংশি-ধ্বনি শোনামাত্রই হাবু মিঞা তাই 'দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে স্টীমার-ঘাটে পৌঁছেছে।' কিন্তু স্টীমার আসেনি। আশাহত হাবু মিঞা অতঃপর সন্তানকে বুকে করে বাড়ি ফিরে এসেছে। বস্তুত, স্টীমার চলাচল বন্ধ হলে কুমুরডাঙ্গার জন-জীবনকে যে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করবে, অধিবাসীরা যে অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হবে হাবু মিঞার মাধ্যমে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সে-সত্যই তুলে ধরেছেন।

মোক্তার মোসলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা। মেয়েদের মাইনর স্কুলের শিক্ষিকা। তার হাঁটার ভঙ্গিতে ঈষৎ মাজা-ভাঙা ভাব এবং সকিনার হাড়-গোড় না-বাড়লেও তার মধ্যে 'দ্বিতীয়ার চাঁদের মত অতিসঙ্গোপনে ক্রমে যৌবনও দেখা' দিয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ক সচেতনতা সকিনার নেই। রুগ্ন মায়ের সাংসারিক দায়িত্বভার নিজের অজান্তেই তার উপর এসে পড়েছে। স্কুলের চাকরি করেও সকিনা মোসলেহ্উদ্দিনের সংসারের সমুদয় দায়িত্ব পালন করে।

সকিনার সম্পর্কে কুমুডাঙ্গার অধিবাসীদের অশেষ কৌতূহল। সে যখন ছাতা মাথায় এবং প্রতিদিন প্রায় একই পোশাকে স্কুলে যায় এবং যখন স্কুল থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন 'দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট থেকে অনেক লোক তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে'।

উকিল কফিলউদ্দিনের মৃত্যু, শহরে যেতে গিয়ে ব্যর্থ হাবু মিঞার রুগ্ন ছেলেসহ প্রত্যাবর্তন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের জাগরিত, তাদের মধ্যে একটি সচেতনতার জন্ম দিয়েছে। তারা বুঝেছে, সত্যিই নদী মরে গেছে, তাদের বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ জীবন হয়ে পড়েছে আরো সংকীর্ণ ও নিস্তরঙ্গ। সকিনা অতঃপর এই যন্ত্রণাবোধ, বিবিক্ত চেতনাকেই করেছে আরো ঘনীভূত ও সূচিমুখ। অকস্মাৎ সে একটি কান্না শুনেছে : 'কোথায় একটি নারী কাঁদছে। ... যে-কান্না কখনো আচমকা ঝড়ের মত কখনো ধীরে-ধীরে বিলম্বিত বিলাপের মত শুরু হয়।'[১৫৩]

মানুষ যখন সংকটের গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়, বিপর্যয় যখন সমগ্র জীবনপ্রবাহকে গ্রাস করতে চায় তখন মানুষের মধ্যে অধিক সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীলতার জন্ম হয়। ব্যক্তিক পরিধি অতিক্রম করে মানুষ এ-অবস্থায় হয় সর্বজনীন চিন্তাজাগরিত, একে অন্যের দুঃখের দায়ভাগী। সকিনার শ্রুত কান্নার কথা তাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হলে সকিনা-সম্পর্কিত তাদের মূল্যবোধও পূর্ব-অবস্থানে নিশ্চল থাকেনি, এবং তা হয়েছে পরিবর্তিত ও নবতর ধারণা-পরিস্রুত, আর এ-রূপান্তর খয়রাত মৌলবীর মধ্যে প্রথম লক্ষণীয়।

উকিল আফতাব খানের বাড়িতে আশ্রিত খয়রাত মৌলবী মেয়েদের-বিশেষ করে, 'যুবতী নারীর বেপর্দায় বিচরণ' সমর্থন করে না। কিন্তু তার সেই 'নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর' ভেঙে পড়েছে। ভীতু খয়রাত মৌলবী 'উন্মুক্ত দৃষ্টিতে' সকিনার প্রতি তাকাতে সক্ষম হয়েছে ; 'তার [খয়রাত মৌলবী] মুখটা খুলে থাকলেও তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে যায় ; সে নিষ্পলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।'[১৫৪]

কাছারির নাজির রহমত মিঞার পুত্রবধূ তাহেরা। তার স্বামী 'শিক্ষার্থে অন্যত্র বাস করে এবং কেবল ছুটিছাটাতে বাড়ি আসে।' সকিনার প্রতি তাহেরার কোনো দিনই

আকর্ষণ ছিল না। 'স্বাধীনভাবে যে-মেয়ে চলাফেরা করে তার প্রতি একটি ঈর্ষা' সবসময়ই সে লালন করত। কিন্তু তারও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে, সকিনার মধ্যে তাহেরা অন্য আকর্ষণ খুঁজে পেয়েছে। ক্ষীণতনু সকিনা এখন তার কাছে এক রহস্যময় নারী আর সে-রহস্য তাকে 'যুগপৎ আকর্ষণ করে এবং মনে একটা ভয় জাগায়।'

সুলতান স্কুল শিক্ষক এবং বয়সে তরুণ। সকিনার প্রতি কোনো দিনই তার অনুরাগ ছিল না। কেননা 'সে জানে সকিনা খাতুনের চেহারায় বা দৈহিক গঠনে দেখবার তেমন কিছু নেই, বস্তুত কল্পনার আদর্শ রূপবতী নারীর তুলনায় তার দোষঘাট অজস্র'।[১৫৫] তৎসত্ত্বেও সুলতান বুঝেছে যে, সকিনার ভিন্ন আকর্ষণ ও মূল্য রয়েছে। সে অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, 'মেয়েটিকে সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে একদিন ঘরে নিয়ে আসবে'।

ফনু মিঞা মুদিদোকানদার। সকিনাকে 'নিত্য তাকিয়ে দেখা' তার স্বভাব। চাল-ডালের ব্যবসায় করে বলে কুমুরডাঙ্গার সবার 'হাঁড়ির খবর'-ও তার নখদর্পণে। ফনু মিঞা জানে, অস্বচ্ছল পিতার অনটন কিছুটা লাঘব করতেই সকিনা চাকরি করে। তার মতে, সকিনার 'মাজা ভাঙ্গা ধরনের হাঁটা'-র কারণ তার 'শারীরিক দুর্বলতা'। সেই ফনু মিঞাও এখন সকিনা খাতুনকে দেখে তার স্বাস্থ্যের কথা ভাবেনি, বরং 'তার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হয়ে থাকে।'

কুমুরডাঙ্গার একমাত্র অবাঙালি ব্যবসাদার মোহনচাঁদ। অনেক দিন আগে পশ্চিমের কোনো শহর থেকে তার পূর্বপুরুষ এ মফস্বল শহরে এসে 'গুড়ের ব্যবসা খুলেছিলো, যা পরে কী করে থানকাপড়ের ব্যবসায় পরিণত হয়'। মোহনচাঁদও কাপড় ব্যবসায়ী। কুমুরডাঙ্গার একমাত্র সেই স্নেহমমতার সঙ্গে সকিনার দিকে তাকায়। দেড় বছর আগে সকিনাকে প্রথম দেখে মোহনচাঁদের মনে হয়েছিল 'সে যেন ইঁদুরের ছা, এবং পরদিন মোহনচাঁদ যখন জানতে পারে সে স্কুলে পড়তে না গিয়ে পড়াতে যায় তখন তার বিস্ময়ের অবধি থাকেনি।'[১৫৬] মোহনচাঁদ একদা স্থির করেছিল সকিনাকে একটি শাড়ি উপহার দেওয়ার। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। সে-দিন সকিনাকে দেখে তাই সে লজ্জা পেয়েছে এবং স্থির করেছে 'হরি খোদা বলে আজই পাঠিয়ে দেবে শাড়িটা।'

ছলিম মিঞা সাইকেল দোকানদার। কিন্তু কুমুরডাঙ্গায় সাইকেল ক্রেতা বিরল বলে তার দোকানের সাইকেলগুলি দীর্ঘদিন ক্রেতার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে হয়ে পড়েছে রংচটা। 'মোটাসোটা ধরনের মানুষ' ছলিম মিঞার মেজাজ রুক্ষ এবং তার কপাল জুড়ে থাকে একটি বিরক্তির ভাব আর চোখে থাকে 'অবিশ্বাস-বিদ্রূপ। পরিচিত কেউ কথালাপের জন্য ছলিম মিঞার দোকানে হাজির হলে কটূক্তি, মুখবিকৃতি ও 'তিক্তরসসঞ্চিত মতামত'-ই তার পুরস্কার হয়। সকিনার দিকে প্রতিদিন 'একবার তাকানো' ছলিম মিঞার অভ্যেস হলেও 'অভ্যাসটি তার নিজেরই মনঃপুত নয়, মেয়েটির প্রতি তার কোন কৌতূহলও নেই'।[১৫৭] কিন্তু অজ্ঞাত কান্নাটি শোনার পর সকিনাকে যখন ছলিম মিঞা দেখেছে তখন 'সে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভ্রূকুটিটাও তেমন সুস্পষ্ট মনে হয় না।'

স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা করিমুন্নেসা বানু 'বহু সমস্যা-জর্জরিত' এক বিধবা। শিক্ষিকা কিংবা ছাত্রীদের উপর তার প্রসন্ন দৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে। স্কুলে সকিনাকে প্রবেশ

করতে দেখে তাই সে বলেছে : 'এই যে তুমি এসে গিয়েছো ?'[১৫৮] পূর্বাভ্যাস বশত কথাটি বলেই করিমুন্নেসা অপ্রস্তুত বোধ করে। ফলে 'কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা'-র মধ্যে কাটানোর পর করিমুন্নেসা পুনরায় সকিনাকে বলেছে: 'তুমি নাকি কী একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাও?'[১৫৯] অর্থাৎ, কান্না শোনার পর সকিনা খাতুনের প্রতি করিমুন্নেসা আর আগের মতো ব্যবহার করতে পারেনি। সকিনার প্রতি তারও জেগেছে সম্ভ্রম, ভয়।

সকিনা খাতুনের শোনা কান্না আর তার নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি; অন্যেরাও তা শুনেছে। তবারক আলী মুন্সীর ঘোর পর্দানুশীন স্ত্রী জয়নাব খাতুনও 'বিচিত্র কান্নার আওয়াজ' শুনতে পেয়েছে। বৃদ্ধ দর্জি করিম বক্‌সও রাতে যখন সীবনকর্মে নিয়োজিত ছিল তখন তার মনে হয় 'কোথাও যেন' একটি বাণবিদ্ধ পাখি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করছে।' কিন্তু কুমুরডাঙ্গার মোল্লা-মৌলবিদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন। তাদের মতে, 'খোদার দুনিয়ায় নানাপ্রকারের শব্দ হয়।' কান্নার শব্দটি অনুরূপ কোনো আওয়াজ। থানার প্রধান দারোগার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু অলি-গলি অনুসন্ধান করেও কান্নার রহস্য উদ্ঘাটন করা যায়নি।

সকিনা খাতুনের শোনা কান্না প্রথমে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মধ্যে ভয়ের, নিদারুণ অমঙ্গল বোধের সৃষ্টি করলেও এক-সময় তা 'অপরূপ ভাবাবেগে আবির্ভূত হয়ে পড়ে।' কান্নাশোনা রীতিমতো 'সৌভাগ্যে পরিণত' হয়। এরই মধ্যে আবার দর্জি-পাড়ার রহমত শেখ একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে। একটি নবজাতক বাছুরকে সে নদীতে কোরবানি দেয়। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা এ আচরণকে-বিবেচনাহীন অর্বাচীনের কাজ ভেবেও 'দলে-দলে তারা নদীর তীরে উপস্থিত হতে শুরু করে, হাতে এটা-সেটা। যে যা পারে, যা যার কাছে মূল্যবান মনে হয়, তাই নিয়ে আসে; হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, চাল-ডাল, টাকা-পয়সা, এমনকি সোনা-রূপার গহনাও। এ-সব তারা নদীর পানিতে ছুঁড়তে শুরু করে।'[১৬০]

বাকাল নদীতে নানা প্রকার মূল্যবান ও মূল্যহীন জিনিসপত্র নিক্ষেপের পর ধীরে-ধীরে কুমুরডাঙ্গার মানুষদের ভয় কাটে, তাদের অন্তরে বেদনার যে-দীর্ঘ কালো ছায়া পড়েছিল তা হয় অপসারিত। অতঃপর 'বন্ধ হয়ে যাওয়া' স্টীমার ঘাটের স্টেশন মাস্টার খতিব মিঞা নতুনভাবে কুমুরডাঙ্গার 'অধিবাসীদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে।' একদিন সে খবর পায়, কোম্পানির চাকরি থেকে তাকে অবসর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে বিচলিত বোধ করলেও পরে খতিব মিঞা বুঝেছে যে, কোম্পানির এ আচরণ তেমন দুঃখের নয়। কেননা তার এ অবসর বেশ লাভজনক। কোম্পানি তাকে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও একটি বিষয় তাকে গভীরভাবে চিন্তান্বিত করে তোলে। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটানোর তার জায়গা নেই। দেশের বাড়িতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা পৈতৃক জায়গা-জমি অন্য ভাইদের দখলে। তাছাড়া পাঁচটি বছর কুমুরডাঙ্গায় অতিবাহিত করার পর এই শহরের প্রতি খতিব মিঞার অন্তর এক ধরনের আকর্ষণও বোধ করেছে। শেষপর্যন্ত সব দ্বিধা বিসর্জন দিয়ে সে হয়ে উঠেছে মীমাংসিত-চিত্ত : 'ঠিক করেছি কুমুরডাঙ্গায় থেকে যাবো।' খতিব মিঞার সিদ্ধান্তের অনুকূলে সে বেশকিছু যুক্তিও উপস্থাপন করেছে।

প্রথমত, কুমুরডাঙ্গায় তার 'মন পড়ে গিয়েছে' এবং সেই মমতা ছিন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, কুমুরডাঙ্গার জমি ভালো. 'সোনার জমি' এবং 'এ জমিতে যা লাগানো যাবে তাই ফলবে।'

তৃতীয়ত, কুমুরডাঙ্গা তার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে না। মৃত্যুর পর এমন মাটির বুকেই সে আশ্রয় চায়।

খতিব মিঞার জীবননিষিক্ত প্রত্যয়, কুমুরডাঙ্গা ও তার মাটি সম্পর্কে সে যা বলেছে 'এমন সব কথা' শহরবাসীরা পূর্বে কখনো শোনেনি। ফলে তা দ্রুত প্রচার লাভ করে আর তখন থেকেই ' সকলের মধ্যে নূতনভাবে জীবনসঞ্চার হয়, নৈরাশ্য নিরানন্দভাব দূর হয়।'[১৬১]

উকিল কফিলউদ্দীন ছিলেন মাটি ও মানুষের সাথে সম্পর্কহীন। তাই বাকাল নদীতে স্টীমার চলাচল বন্ধ হলে সে হয়ে পড়ে ভীত। এ–অবস্থায় কফিলউদ্দীন পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এভাবে, একা বাঁচতে চাইলে বাঁচা যায় না। মৃত্তিকামূল থেকে রসসঞ্চাব করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। খতিব মিঞা-ই তাই ঠিক, মৃত্তিকাপ্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসায় সুস্থির। কোনো ভয় তাকে স্পর্শ করেনি, তার মধ্যে জন্ম হয়নি কোনো পলাতক মনোভাবের। বহমান জীবনস্রোতের সঙ্গে শিকড়ায়িত হয়েই খতিব মিঞা খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের পরমার্থ, বেঁচে থাকার অনিবার্য প্রেরণা।

বস্তুত, *লালসালু*-র মজিদ ছিল সর্ববিচ্ছিন্ন, এক অনিকেত সত্তা। ফলে ক্ষমতা-বিত্তে মহব্বতনগরের চৌম্বক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েও সেই জীবনপ্রবাহ ও জনপদে মজিদ মূলসঞ্চার করতে পারেনি। জমিলার মেহেদি-রঞ্জিত পদপাত তাকে করেছে আরো উৎকেন্দ্রিক, চরম আত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের গভীরে নিক্ষিপ্ত। অন্যদিকে জমিলা নিমজ্জিত ও বিপন্ন অস্তিত্বের মানুষদের সামনে উপস্থিত করেছে তাদেরই আত্ম-উত্তরণের তত্ত্ব, মাজার-মজিদ-ব্যাপারী ও পরিণামভীতিশূন্য হয়ে জাগরিত হওয়ার আহ্বান। *চাঁদের অমাবস্যা*-য় এই তত্ত্বই পেয়েছে ব্যক্তি-বলয়িত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর অস্তিত্ববান হয়ে-ওঠার মাধ্যমেই তা সীমায়িত। সে-ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে আরো প্রাগ্রসর, সমাজের মুক্তি-অভিলাষী, স্বদেশ-সংলগ্ন ও জনজীবন-আশ্রিত, আর এখানেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌলিকত্ব। *কাঁদো নদী কাঁদো*-র মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে কোনো নৈকট্যই ছিল না। এমন কি নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব ও দায়ভার বহনের যোগ্যতা থেকেও সে বঞ্চিত। বস্তুত, খোদেজার মৃত্যু-অপরাধের দায়ভার বহন করে অস্তিত্বের ভয়ানক ও অগ্নিদাহময় সরণি, প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রমে ব্যর্থ হয়েই মুহাম্মদ মুস্তফা তার অস্তিত্ব থেকে পলায়ন (split of existence) করেছে। ফলে নীরব আত্মবিসর্জন, অলক্ষিত আত্ম-বিনাশই তার হয়েছে অনিবার্য পরিণতি। সে-ক্ষেত্রে খতিব মিঞা তার অন্তর্গত চেতনায় যেমন স্থিতপ্রাজ্ঞ ও মীমাংসিত তেমনি সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা-জাগরিত এবং

ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা-প্রসূত অস্তিত্ব-অভীপ্সু। এভাবেই মুক্তি মেলে, একটি সমাজ ও জনগোষ্ঠী প্রকৃত-অর্থেই অর্জন করতে পারে তার মানবিক অস্তিত্বময় রূপ ও চারিত্র। সে-দিক থেকে বলা যায়, খতিব মিঞাই ঔপন্যাসিকের প্রতিপাদ্য, ক্ষুদ্র প্রাতিস্বিক অস্তিত্ব নয় ব্যাপক সমাজ-অস্তিত্ব অন্বেষাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য, তাঁর শিল্পী জীবনার্থের পরম প্রত্যয়। *লালসালু*-তে যে-জীবনবোধ, ঔপন্যাসিকের যে-জীবনচর্যা ও মৌলিক প্রতিপাদ্যের সূচনা *চাঁদের অমাবস্যা* তার মধ্যপর্ব আর *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে এসে তা হয়েছে সমুদ্রসমর্পিত, পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত।

কাঁদো নদী কাঁদো-র অন্তর-সংগঠন, অন্তর্গত পরিচর্যা ও দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, ভাষা-শৈলীর অন্তর্বয়ন—সর্বত্রই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পূর্বাপেক্ষা অগ্রসর, আরো বেশি পরিশীলিত এবং তাঁর বিশ্বপ্রসারিত জীবনাদর্শ ও শিল্পবোধ-উৎকীর্ণ।

কাঁদো নদী কাঁদো-য় অনুসৃত দৃষ্টিকোণ মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের। কিন্তু প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অবস্থান প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একইভাবে সুদৃঢ় ও সুসংহত নয়। লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ ও তবারক ভুঁইঞার নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষণবিন্দুর সম্পূরক ও পরিপূরক ব্যবহার এবং এই দুই রীতি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট, 'নদীর মতো অভিন্ন স্রোতধারায়' পরিণত হওয়ার মধ্যেই *কাঁদো নদী কাঁদো*-র পরিচর্যা-রীতির শিল্প-গৌরব নিহিত। *কাঁদো নদী কাঁদো*-র সূচনা মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে, তারই উত্তম পুরুষে সূর্যাস্তের বর্ণনা দানের মাধ্যমে :

> লোকটিকে যখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ণ, হেলে-পড়া সূর্য গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে-থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয় শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। সে-জন্যে, এবং রোদ-ঝল্‌সানো দিগন্ত বিস্তারিত পানি দেখে-দেখে চোখে শ্রান্তি এসেছিলো, তন্দ্রার ভাবও দেখা দিয়েছিলো। তারপর কখন নিকটে গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন একদল যাত্রীর মধ্যে কেউ হঠাৎ চীৎকার করে উঠলে তন্দ্রা ভাঙে, দেখি আমাদের স্টীমার প্রশস্ত নদী ছেড়ে একটি সংকীর্ণ নদীতে প্রবেশ করে বাম পাশের তীরের ধার দিয়ে চলেছে। উঁচু খাড়া তীর, তীরের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছোট ছোট ছায়া-শীতল চালাঘর, এখানে-সেখানে সুপারিগাছের সারি, পেছনে বিস্তীর্ণ মাঠ, আরো দূরে আবার জনপদের চিহ্ন।[১৬২]

কিন্তু লোকটির অর্থাৎ, তবারক ভূঁইঞার কথামালা থেকে তার সম্পর্কে মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের মধ্যে যে-অন্তর্মুখি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে তা তুলে ধরার জন্য গৃহীত হয়েছে ভিন্ন রীতি, স্বতন্ত্র প্রেক্ষণবিন্দু। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণই এ-জন্য ঔপন্যাসিক বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন :

> বস্তুত তার বাক্যস্রোত রীতিমত একটি নদীর ধারায়' পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদুকণ্ঠে কলতান করে কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বারবেগে ছুটে যায় না। সে-ধারা ক্রমশ অজানা মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-জনপদ চড়াই-উৎরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।[১৬৩]

উদ্ধৃতাংশের পরের বাক্যেই আবার ফিরে এসেছে মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের প্রেক্ষণবিন্দু। কেননা *কাঁদো নদী কাঁদো*-র প্রারম্ভিক অংশের সে-ই বক্তা এবং তারই চোখ দিয়ে আমরা তবারক ভূঁইঞাকে দেখেছি ও তারই সঙ্গী-সহযাত্রী হয়ে পথ চলেছি :

> অনেক কিছুই সে বলে, যার কিছু কানে আসে না, কিছু বুঝতে পারি কিছু পারি না; মনটার ওপর তখন তন্দ্রা উড়ন্ত মেঘের মত থেকে থেকে ছায়া সম্পাত করেছিলো।[১৬৪]

কুমুরডাঙ্গার কাহিনীস্রোত ব্যাপকভাবে তবারক ভূঁইঞা আশ্রিত ও অনুগত। কিন্তু এই এক রৈখিক বিন্যাস-রীতির বৈচিত্র্য ও প্রতিক্রম (monotony) সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন সবিশেষ সচেতন। ফলে তবারক ভূঁইঞার প্রাধান্য স্বীকার করেও কাহিনী মধ্যে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তবারক ভূঁইঞার প্রেক্ষণবিন্দুর পাশাপাশি গৃহীত হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু :

> ঘাট খোলার উপলক্ষটিকে একটি স্মরণীয় ব্যাপারে পরিণত করার জন্যে কোম্পানি বেশ জাঁক-জমক সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলো। তখনো ঘাটে ফ্লাটটি বসানো হয়নি, তবে নদীতীরে উঁচু দরওয়াজা তৈরি করে সেটি নানা রঙের কাগজে আবৃত করে পতাকা ঝুলিয়ে শোভিত করেছিলো, তারপর জেলা শহর থেকে আমদানি করেছিলো পুলিশের বাদকদল চমক্প্রদ রণবাদ্যের ঝঙ্কার তুলে শহরবাসীদের আমোদিত করার জন্যে। নির্দিষ্ট দিনে স্টীমার আসার অনেক আগে ঘাট লোকে-লোকারণ্য হয়ে পড়ে। শুধু শহর থেকে নয়, কোম্পানি দশ গ্রামে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘাট-প্রতিষ্ঠানের খবরটি সাড়ম্বরে প্রচার করেছিলো বলে সারা অঞ্চল থেকে মিছিল করে লোকেরা ঘাটে উপস্থিত হয়েছিলো তামাশা দেখবার জন্যে। দেখতে-না-দেখতে ঘাটের সামনে রীতিমত হাট-বাজারও বসে গিয়েছিলো; জনতার সমাগম ব্যবসায়ী মানুষের মনে অবিলম্বে অর্থলিপ্সা জাগায়।[১৬৫]

কিন্তু সুসজ্জিত, উৎসবমুখরিত ঘাট ও কুমুরডাঙ্গার প্রচল জীবন স্রোতের সঙ্গে নবপ্রতিষ্ঠিত স্টীমার ঘাটের বৈপরীত্য ও বাস্তবতার উল্লেখ করতে গিয়ে তবারক ভূঁইঞা আর উপস্থিত থাকেনি ঔপন্যাসিক তখন নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন, উপজীব্য হয়েছে তাঁরই প্রেক্ষণবিন্দু :

> বস্তুত সবকিছু মিলে সদ্য-খোলা ঘাটটি একটি বৃহৎ মেলার রূপ ধারণ করে, আনন্দোৎফুল্ল উদ্দীপনা উল্লাস-উত্তেজনায় স্থানটি সরগরম হয়ে *ওঠে*। বলতে গেলে তখন এ-অঞ্চলে কারো বাষ্পীয় জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিলো না, মুষ্টিমেয় যারা অত্যাশ্চর্য বস্তুটিকে সচক্ষে দেখেছিলো তারা দূর থেকেই দেখেছিলো কেবল, কখনো তাতে চড়েনি। এক-আধজন সৌভাগ্যবান যারা শুধু দেখেনি তাতে আরোহণ করে ভ্রমণও করেছে, তারা এ-সুযোগে আসন্ন যন্ত্রদৈত্যের সম্বন্ধে চটকদার বিবরণ দিয়ে অজ্ঞদের ঔৎসুক্য মাত্রাতিরিক্তভাবে শাণিত করে তোলে।[১৬৬]

তবারক ভূঁইয়া ও লেখকের প্রেক্ষণবিন্দুর পাশাপাশি অবস্থানের অপর দৃষ্টান্ত কুমুরডাঙ্গার গৃহবধূদের উকিল মোসলেহ্উদ্দিনের বাড়িতে আগমন এবং সকিনা খাতুনের আত্মপক্ষ সমর্থন। সকিনা খাতুন কর্তৃক শ্রুত কান্নার কথা প্রচারিত হলে শুধু

কুমুরডাঙ্গার পুরুষ সমাজের অভিনিবেশই তাতে আকৃষ্ট হয়নি, অন্তঃপুরের মেয়েদেরও তা সমান উৎকণ্ঠিত, অভিভূত ও উৎকর্ণ করেছে। তারা প্রকৃত সত্য-অনুসন্ধানে হয়েছে ব্যাগ্র ও উন্মুখ। মোসলেহ্উদ্দিনের বাড়িতে তাদের উপস্থিতির বিবরণ তবারক ভূঁইঞাই দান করেছেন তারই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে :

> স্ত্রীর দল সরাসরি অন্দরে এসে অযথা কালক্ষেপ না করে সকিনা খাতুনকে জেরা করতে উদ্যত হয়। ... সামনে সকিনা আড়ষ্ট হয়ে বসলে সে প্রথমে কটকটে চোখে নয়, নরম চোখেই মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, দেখে তার শীর্ণ লাবণ্যহীন চেহারা, হাসিশূন্য মুখ। সকিনা খাতুনের জন্মদাগটিও লক্ষ্য করে দেখে। জন্মদাগটি তেমন স্পষ্ট নয়, শ্যামল রঙের ওপর আরেকটু শ্যামল একটা ছাপ যা মুখের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে গলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। তারপর সে দেখে তার কণ্ঠাস্থি, অলঙ্কারশূন্য বুকের উপরাংশ, প্রায় সমতল বুক। অবশেষে সে মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "সত্যি কিছু শুনতে পান নাকি ?"[১৬৭]

কিন্তু জিজ্ঞাসা-বিব্রত সকিনার প্রতিক্রিয়ার শব্দরূপ সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক আর তবারক ভূঁইঞাকে গ্রহণ করেননি, তিনি নিজেই এ-ক্ষেত্রে বাঙ্ময়; তাঁরই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণিত হয়েছে সকিনার অবস্থান ও স্বীকারোক্তি :

> বস্তুত, আয়েশার নরম দৃষ্টি এবং মিষ্টি কথা তাকে হঠাৎ কেমন নিরস্ত্র করে ফেলে, সদলবলে এতজন মেয়েলোকের আকস্মিক আবির্ভাবে মনে যে কোণঠাসা ভাব দেখা দিয়েছিলো সে-ভাবটি দূর হয়। হয়তো একবার ভাবে, যদি সে বলতে পারতো কিছুই সে শোনে না, কী কারণে তেমন একটা খেয়াল হয়েছিলো গত কয়েকদিন কিন্তু সে-খেয়াল কেটে গিয়েছে, তবে স্বস্তিই পেতো। কিন্তু সে জানে তা সত্য নয়। প্রথমে কান্নাটি শুনতে পেলে মনে হতো, সত্যি কি কিছু শুনতে পায়? এখন তা-ও মনে হয় না, যখন কিছু শুনতে পায় না তখনও কান্নার রেশটি অন্তরে কোথাও যেনো ঘোরাঘুরি করে।[১৬৮]

সকিনার প্রতি মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। বৃষ্টির পর আকাশে ঝল্মলে রোদ উঠেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা তার অফিসে রওনা হয়েছে। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর ছাতা মাথায় হেঁটে যাওয়া সকিনা খাতুনের প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছে। ছাতার জন্য সকিনার সম্পূর্ণ মুখ সে দেখতে পায়নি। আড়াল থেকে যেটুকু মুহাম্মদ মুস্তফার দৃষ্টিসীমায় ধরা পড়েছে তাতেই তার মনে হয়েছে :

> ... সে যেন খোদেজা : একই শারীরিক গঠন, একই হাঁটার ভঙ্গি, চিবুকের যে-অংশটি নজরে পড়ে তাও মৃত মেয়েটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ... এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে ধীরপদে এগিয়ে আসতে থাকা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এমনভাবে কোন মেয়েমানুষের দিকে কখনো তাকায়নি বলে সে লজ্জা বোধ করে কিন্তু তবু দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। শীঘ্র তার দিকে তাকিয়ে থাকতে তেমন বাধেও না, কারণ তার মনে হয় যে-মেয়ে দেখতে ঠিক খোদেজার মত তার দিকে তাকালে ক্ষতি নেই।[১৬৯]

সকিনা খাতুনের অনুষঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার এই আকস্মিক পরিবর্তন, তার স্মৃতিময় অতীতে প্রত্যাবর্তন একান্ত তার হলেও তা উপস্থিত হয়েছে তবারক ভূঁইঞার

প্রেক্ষণবিন্দু থেকে। মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে তবারক ভূঁইঞা ঘনিষ্ঠ হলেও তাদের মধ্যেকার ব্যবধান অনেক, পদমর্যাদার দিক থেকে তা সম্পূর্ণ অনতিক্রম্য একটি বিশেষ এলাকার পর অগ্রসর হওয়া তাই নিরাপদ নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ও সেই সীমান্ত-রেখা অতিক্রম করেননি। অতঃপর তিনি নিজেই সব নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক প্রজ্ঞাসহ উপস্থিত হয়ে ঔপন্যাসিক তাঁরই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

> তাছাড়া, ক্ষতি আছে কী ক্ষতি নেই, কাজটি ঠিক কী বেঠিক—এ-সব ভাবা হয়তো সম্ভবও হয় না; মানুষের পক্ষে সব সময়ে ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভাবা সম্ভব কি?[১৭০]

উপন্যাসের শেষে উল্লিখিত ত্রয়ী প্রেক্ষণবিন্দু অর্থাৎ, মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাই, তবারক ভূঁইঞা এবং সর্বজ্ঞ লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু অভিন্ন ধারায় এসে মিশেছে। দীর্ঘ যাত্রা শেষে 'সচকিত' তবারক ভূঁইঞা উঠে পড়েছে এবং আড়মোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙে বলেছে :

> "নদী কী তার নিজের দুঃখে কেঁদেছিলো? নদী কেঁদেছিলো তাদের দুঃখেই।"[১৭১]

মুহম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাই তখন ভিড়ে মিশে গিয়েছে। কিন্তু তবারক ভূঁইঞার 'শেষোক্তিটি' তার মন থেকে মুছে যায় নি :

> ··· নদী যদি কেঁদে থাকে তবে নিজের দুঃখে নয়, কুমুরডাঙ্গার অসহায় অধিবাসীদের দুঃখেই কেঁদেছিলো।[১৭২]

এরপরই বর্ণিত হয়েছে ঘাটে স্টীমারের আগমন দৃশ্য যা চিরায়ত, সব স্টীমার-ঘাট সম্পর্কেই সত্যি। এ বর্ণনা মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে সম্ভব নয়, সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণই এর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন :

> স্টীমার ধীরে-ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুর্পাশে উচ্ছৃঙ্খল পানি শতশত হিংস্র সরীসৃপের মত গর্জন করে।[১৭৩]

কাঁদো নদী কাঁদো-র শেষ তিনটি বাক্যও বিশেষ অভিনিবেশ ও গুরুত্ব দাবি করে। উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যা, *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার-বৈচিত্র্যের মূলসূত্রও এই ত্রিবিধ বাক্যেই খুঁজে পাওয়া যায় :

> তবে সহসা আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি: কাঁদো নদী কাঁদো।[১৭৪]

উদাহরণের প্রথম বাক্যটি মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের অন্তস্তল-উৎসারিত ভাবনা। ফলে তার চেতনা, প্রেক্ষণবিন্দু থেকেই রচিত হয়েছে বাক্যটি। দ্বিতীয় বাক্যের কেন্দ্রে অবস্থান করছেন লেখক। তাঁরই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে এখানে ঘটনাকে কোনো বিশেষ এলাকা থেকে মুক্ত করে সর্বজনীন ব্যাপ্তিতে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা লক্ষণীয়। অন্তিম বাক্যে আবার ফিরে এসেছে মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাই। *কাঁদো নদী কাঁদো*-র কথা-আরম্ভ মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের আত্মগত সংলাপ উচ্চারণের সঙ্গে, পরিসমাপ্তিতেও রয়েছে তারই মানস-সংলাপ, আত্মকথন। মাল্টিপল্

সিলেকটিভ অমনিস্যেন্স পয়েন্ট অব্ ভিউ-ই তাই *কাঁদো নদী কাঁদো*-র ঘটনা-উপস্থাপন রীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, মৌল পরিচয়। অন্য কথায়, *কাঁদো নদী কাঁদো*'-র দৃষ্টিকোণ সামগ্রিকভাবে লেখকের হয়েও তা তবারক ভূঁইঞা-সংলগ্ন, আর উপন্যাসের প্রেক্ষণবিন্দু একাধিক–মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাই, তবারক ভূঁইঞার কখনো-কখনো লেখকের নিজেরও।

বস্তুত, *লালসালু*-র অনেকান্ত নির্বাচিত দৃষ্টিকোণ ও ঘটনা-অন্তর্গত কতিপয় চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যার আত্মপ্রকাশ মাঝখানে *চাঁদের অমাবস্যা*-র বাঁক পরিবর্তন, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী-কাদের-দাদাসাহেবের প্রেক্ষণবিন্দুর প্রয়োগ-সাফল্যের পর *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে তার পরিপূর্ণ বিকাশ, চূড়ান্ত শিল্পসিদ্ধি।

নিজের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পরিতৃপ্ত হয়ে আত্ম-অনুকরণে নিমজ্জিত হওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বভাবধর্ম নয়, নিয়ত নিরীক্ষার মাধ্যমে সাফল্য-সন্ধানই তাঁর শিল্পিসত্তার মৌল পরিচয়। উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার, ঘটনা-সন্নিবেশ ও সংস্থাপন কৌশল–সর্বত্রই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সদা বৈচিত্র্যপ্রিয় ও নিঃসঙ্গ পথযাত্রায় অক্লান্ত। *লালসালু*-র কাহিনীসজ্জা সমগ্রতা-আশ্রয়ী, আদি মধ্য ও অন্ত সম্বলিত এবং সময়ের স্বাভাবিকক্রম-অনুসারী। *চাঁদের অমাবস্যা*-য় এই ভিক্টোরীয়, উনিশ শতকীয় প্রথাসিদ্ধ রীতি বিচূর্ণিত এবং ব্যক্তি-মননের জটিল স্তরগভীরে শিলীভূত। এ উপন্যাসের ঘটনাবৃত্তের অগ্রযাত্রা পারম্পর্যহীন, কালের ভগ্নক্রমিক ব্যবহারের মধ্য দিয়েই পরিণতির দিকে ধাবিত। *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে উল্লিখিত দুই উপন্যাসের অন্তর্বয়ন প্রক্রিয়ার কোনোটিই অনুসৃত হয়নি। *কাঁদো নদী কাঁদো*-র ঘটনা- গ্রন্থন সম্পূর্ণ অভিনব, এবং তা শুধু বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্য থেকে নয়, ইয়োরোপীয় উপন্যাস-সংগঠন থেকেও দূরায়িত, এক বিরল ব্যতিক্রম হয়েও গৌরবান্বিত, নিজস্ব পরিচয়ে সমুজ্জ্বল।

কাঁদো নদী কাঁদো-তে দুটি কাহিনীধারা—মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের অনুচ্চারিত চৈতন্যস্রোত এবং তবারক ভূঁইঞার কাহিনীপ্রবাহ পরস্পরিত হয়ে মোহনায় মিলন শেষে অভিন্ন গতিতে বহমান নদীর জলধারার মতোই প্রবাহিত হয়েছে। মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের অন্তর্লোকে দৃশ্যমান ঘটনাস্রোতই হচ্ছে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনের কথামালা, আর তবারক ভূঁইঞার সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত কাহিনীপ্রবাহই কুমুরডাঙ্গার গল্প।

মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের অনুচ্চারিত কথামালাই মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী। তার মনস্তাপ ও বীত-অস্তিত্বের কথকতা। এ-অংশের পরিচর্যা উল্লম্ফনধর্মী, পূর্বাপর অনুপ্রবিষ্ট, চেতনাপ্রবাহরীতির, নাটকীয়তা-স্পন্দিত কখনো পরাবাস্তবতা-আশ্রয়ী।

মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনীর শুরু ঘড়ির গতির বিপরীত ক্রমানুসারে (anticlok-wise), বর্তমান থেকে অতীতে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে। মানুষ এক স্বতন্ত্র সত্তা, সময়

ও সমাজশাসিত হয়েও সে কালোত্তীর্ণ প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত। পরিপূর্ণভাবে অতীতে তার পক্ষে কখনোই ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে অবস্থান করেই তাকে হতে হয় অতীতচারী। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই সঙ্গে নিজের মধ্যে ধারণ করেই মানুষ সমগ্র। মানব চৈতন্যের এই ত্রিকালস্পর্শী স্বরূপ নির্মাণের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে চেতনাপ্রবাহরীতির।[১৭৫] মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের মনোজগতেও অতীত ও বর্তমান পরস্পরিত, যাত্রীদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়েও সে স্মৃতিময়। অচেনা এক যাত্রীর মুখে কুমুরডাঙ্গার নাম শুনলেই তার সামনে থেকে বর্তমান হয়েছে অপসৃত:

> লোকটি আরো কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকে। তারপর সহসা সে একটি শহরের নাম নেয়, যে-নাম শুনে প্রথমে চমকিত হই, তারপর এ-কথা বুঝতে পারি যে তখন স্মৃতির পর্দায় অকারণে দোলা লাগেনি। তবে লোকটি কী তবারক ভূঁইঞা? তাকে কখনো স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু সহসা কেমন নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ি যে সে তবারক ভূঁইঞাই হবে। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলে মনে-মনে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ি, একটি মানুষের স্মৃতি অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সহসা। স্মৃতি নয়, একটি ভার, যে-ভার এত বছরেও হাল্কা হয়নি। উত্তেজিত হয়ে ভাবি; তবে লোকটির মুখে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা শুনতে পাবো কি? আমি জানি মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হয়েছিলো। শুধু তাই নয়; যে-বিচিত্র দ্বন্দ্বে সে-সময় মুহাম্মদ মুস্তফা সমগ্র মনে-প্রাণে নিপীড়িত হয়েছিলো সে-দ্বন্দ্বের কথা এবং সে-দ্বন্দ্বের কারণের কথাও জানতে পেরেছিলো।[১৭৬]

কুমুরডাঙ্গায় প্রথম আগমন-কালে স্টীমারে একজন দারোগার সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার সাক্ষাৎ হয়। সদরে মামলার সাক্ষ্য দিয়ে সে তার কর্মস্থলে ফিরছিল। মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গার ছোট-হাকিমের পদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে জেনে দারোগাটি সালাম জানাতে মুহাম্মদ মুস্তফার কাছে উপস্থিত হয়। তার অবশিষ্ট যাত্রা তাই বিরস, নিঃসঙ্গ হয়নি, দারোগার সাথে কথালাপের মধ্য দিয়েই তা অতিবাহিত হয়েছে। দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ-উত্তর মুহাম্মদ মুস্তফার যাত্রার বিবরণ ঘড়ির কাঁটার সম্মুখ গতির মতোই গল্প-কথনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রদত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফার চাচাত ভাইয়ের প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র। কালের স্বাভাবিক গতির প্রতি অনুগত হয়েই সে স্মৃতিমগ্ন, মুহাম্মদ মুস্তফার পূর্বজীবনে বিচরণশীল। ফলে ঘটনা-বর্ণনা হয়ে উঠেছে চেতনাপ্রবাহরীতির, বর্তমান ও অতীতকালের সমান্তরাল বিন্যাসের মধ্য দিয়ে বহমান :

> মনে আছে, একবার বাড়ি থেকে চাঁদবরণঘাট পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর সে শহরে ফিরে যাচ্ছিলো। খালের পথে নৌকায় করে কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছি এমন সময় সহসা তার স্মরণ হয় একটি বড় দরকারি বই বাড়িতে ভুলে এসেছে। সারা ছুটিতে উঠানে গাছের তলায়, পুকুরের ধারে, ক্ষেতের পাশে বসে বা বিছানায় শুয়ে বইটি পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করেনি, এমনকি শোবার সময়েও বইটি তার বালিশের নিচে রাখতো যাতে সকালে ঘুম ভাঙলেই সেটি খুলে চোখের সামনে ধরতে পারে।[১৭৭]

কাঁদো নদী কাঁদো-র আভ্যন্তর পরিচর্যায় নাটকীয়তা সর্বাধিক তীব্রতা লাভ করেছে মুখ্যত তিনটি ক্ষেত্রে। প্রথমত, কালু মিঞার বাড়ির সামনে মুহাম্মদ মুস্তফার

উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে। পিতা খেদমতুল্লার মৃত্যুর কয়েক বছর পর ছুটিতে মুহাম্মদ মুস্তফা দেশের বাড়িতে আসে। তারপর 'এক অপরাহ্ণের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে।' ক্রমে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসে ও মুষলধারে বৃষ্টি নামে। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফার হাঁটার বিরাম নেই। এক-সময় সে মুক্তাগাছি গ্রামের 'প্রসিদ্ধ' বটতলায় পৌঁছে। বটগাছটির অনতিদূরেই ছিল কালু মিঞার বাড়ি। বাড়ির লোকদের বলা-কথা তখন মুহাম্মদ মুস্তফার স্মরণে আসে : 'কালু মিঞাই খেদমতুল্লাকে খুন' করেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা অতঃপর বিস্ময়াভিভূত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটায়, শেষে বোঝে 'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়।' কিন্তু বাড়ির দিকে রওনা হতেই একটি 'বিকট কণ্ঠ রাত্রির নীরবতা খণ্ডবিখণ্ড করে তাকে বলে : 'বটতলায় কে ?' এ প্রশ্নে মুহাম্মদ মুস্তফা ভীত, অবচেতন মনের অন্ধকার থেকে চেতন পৃথিবীতে সংস্থাপিত হয়। অন্যদিকে এ-উত্তর ভূত কিংবা কোনো মানুষের আত্মার কণ্ঠস্বর শুনবে বলে মানসিকভাবে প্রস্তুত প্রশ্নকর্তাকেও তার উদ্বেগ থেকে মুক্তি দেয়। মুহাম্মদ মুস্তফা ও প্রশ্নকর্তা উভয়ের জন্যই এ পরিবেশ নাটকীয়, উৎকণ্ঠা-আন্দোলিত ও জানা-অজানার দ্বন্দ্বে তীক্ষ্ণচূড়।

দ্বিতীয়ত, কালু মিঞার স্বীকারোক্তি। 'বৃহৎ বটগাছটির পাশে কালু মিঞার বাড়ির সামনে যেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা দেখা দিয়েছিলো তার দু-দিন পরে জুমার নামাজের সময় একজন মধ্যবয়সী জামাই আর একজন চাকরের কোলে চড়ে কালু মিঞা গ্রামের মসজিদে হাজির হয়।'[১৭৮] কেননা 'কী একটা নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তার বাইরে আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়ে।' মসজিদে কালু মিঞা উপস্থিত হলে গ্রামবাসীরা একটি প্রত্যাশাকে লালন করে চরমভাবে উৎকণ্ঠিত হয়। তারা ভাবে, কালু মিঞা সত্য প্রকাশ করবে; বলবে, সে-ই খেদমতুল্লার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। নামাজ শেষে ইমামও তাকে প্রশ্ন করে; 'কিছু বললেন কালুমিঞা ?'[১৭৯] কিন্তু সেই নাটকীয়, চরমভাবে শ্বাসরুদ্ধকর ও অধীর আগ্রহ-ভরা পরিবেশের অকস্মাৎ অবসান ঘটে। সকলকে স্তম্ভিত করে কালু মিঞার জামাই তার শ্বশুরের পক্ষে ঘোষণা করে :

> তিনি বললেন—খেদমতুল্লাকে খুন করেন নাই, করানও নাই।[১৮০]

অতঃপর সবাইকে আগমন মুহূর্তটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে কালু মিঞা মসজিদ ত্যাগ করে।

তৃতীয়ত, মুহাম্মদ মুস্তফার সিদ্ধান্ত। মসজিদে কালু মিঞার নিজেকে নির্দোষ ঘোষণার খবরটি শোনার পর মুহাম্মদ মুস্তফার বাড়ির সকলেই তা অবিশ্বাস করে। তারা ভাবে, ঘাতককে এতোদিন পর চিহ্নিত করা গেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা এবার তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। মুহাম্মদ মুস্তফার চাচা সরাসরিই তাকে জিজ্ঞেস করে : 'কী করতে চাও, বাবা ?'[১৮১] কিন্তু এর উত্তরে মুহাম্মদ মুস্তফা কোনো প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেনি। সে কেবলই একটি নৈর্ব্যক্তিক উক্তি করেছে : 'মসজিদে কেউ মিথ্যা কথা বলে না।'[১৮২]

স্মরণীয়, *কাঁদো নদী কাঁদো*-র অন্তর্গত পরিচর্যায় নাটকীয়তাকে আশ্রয়, উৎকণ্ঠাময় নাট্যিক মুহূর্তকে আলিঙ্গন করলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কখনোই তা

দীর্ঘায়িত করেননি। একটি উত্তেজনা, স্নায়ু-টানটান মুহূর্ত সৃষ্টির পরই তিনি ফিরে এসেছেন ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে, নাটকীয়তার মধ্যে একটি অন্তর্নাটকীয় আবহ নির্মাণের পর তাঁর পরিকল্পিত আখ্যান-বস্তুর গভীরে। *লালসালু*-তেও আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই সৃষ্টিকৌশলের অপূর্বত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের নাট্যিক পরিচর্যা বহিরারোপিত কোনো-প্রক্রিয়া নয়, মানুষের প্রাত্যহিক ও স্বাভাবিক জীবন–নাট্যকে উপন্যাসের জীবনপ্রবাহে সংযুক্ত করার সচেতন প্রয়াস থেকেই তা আহরিত, পরিচর্চিত ও সৃষ্ট।

মানুষ তার পরিচিত জগৎ, বহির্বাস্তবের সঙ্গে যখন অপরিচয়ের (alienation) সম্পর্কে বদ্ধ হয় তখন দৃশ্যমান বস্তুবিশ্ব তার কাছে বস্তু-অতিরিক্ত সত্যে ধরা দেয়। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ, মানব-মনের চেতন ও অবচেতন পর্যায়ের মধ্যে অধিশ্রয়ণ ঘটিয়েই পরাবাস্তববাদীরা তাই এমন একটি বস্তু-অতিরিক্ত জগৎ নির্মাণ করেন যা একান্তভাবেই ব্যক্তি-চেতনানির্ভর।[১৮৩] *কাঁদো নদী কাঁদো*-র মুহাম্মদ মুস্তফার নিরস্তিত্ব চেতনা, তার অবচেতন সত্তায় গুহায়িত অপরাধবোধ থেকে সৃষ্ট শূন্যচেতনার শব্দরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রথাসম্মত–রীতি গ্রহণ করেননি। পরাবাস্তববাদী পরিচর্যাই তাই তাঁর অভিযাচিত হয়েছে। কুমুরডাঙ্গার সরকারি বাড়িতে অবস্থান করেও মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়েছে সে যেন নদীতে ভাসমান নৌকারই যাত্রী; আবার বাল্যকালে 'গ্রামের একটি মেয়েলোকের কাছে' শোনা গল্পের কলিজা তাকে ছায়ার মতো তাড়িত ও অনুসরণ করেছে; কখনো আবার সচল কলিজার মধ্যে সে খোদেজার আহ্বান শুনেছে। মানসিক বৈকল্যের একটি পর্যায়ে সুটকেসকেও মুহাম্মদ মুস্তফার কলিজা বলে বোধ হয়েছে :

১ কখন মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকবে, কারণ তার মনে হয় সে যেন কুমুরডাঙ্গা নামক একটি মফস্বল শহরের অন্যতম সরকারি বাড়ির বারান্দায় বসে নেই, বসে রয়েছে একটি নৌকার ওপর। নৌকা ঈষৎ দুলছে, থেকে–থেকে পানি থেকে ছলছল শব্দও আসছে। খালের পথ। তবে সে চাঁদবরণঘাটে স্টীমার ছেড়ে ছাপরশূন্য নৌকায় উঠেছে।[১৮৪]

২ কলিজাটি বহুদিন পরে তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে বলে সে গভীর কৌতূহল বোধ করে, একটু ভয়-ভয়ও করে, এবং শীঘ্র এমনও মনে হয় সেটি যেন বাস্তবরূপ ধারণ করেছে, যেন সত্যি তা দেখতে পাচ্ছে : তার চোখের সামনে শূন্যে ঝুলে-থাকা কলিজাটি কাঁপতে থাকে থরথর করে, অশ্রান্তভাবে, নির্দয়ভাবে। নির্দয়ভাবে কারণ সে কলিজার কম্পন কখনো যেন থামবে না, কখনো শান্ত হবে না; সেটি এমনই কিছু যার শেষ নেই, যা অমর।[১৮৫]

৩ সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট

হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে, পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গ স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত ধড়ফড় করছে যেন। সে আশা করে পানির অভাবে শীঘ্র মাছটির ধড়ফড়ানি শেষ হবে, তার দেহ স্থির হয়ে পড়বে, কিন্তু তাও হয় না, পতঙ্গের মত মাছটিও ধড়ফড় করতে থাকে। বিচিত্র কলিজাটি সত্যিই অমর; আগুনে তা দগ্ধ হয় না, দম বন্ধ হলেও তার শ্বসনকার্য থামে না।[১৮৬]

তবারক ভূঁইঞার উচ্চারিত চেতনাস্রোতের মাধ্যমে উপস্থাপিত কুমুরডাঙ্গার কাহিনী-অংশের পরিচর্যা মুহাম্মদ মুস্তফার উপাখ্যান থেকে স্বতন্ত্র সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যে-প্রোজ্জ্বল, ভিন্নতর মাত্রায় উদ্ভাসিত। এ অংশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু বিস্তৃত ক্যানভাসই গ্রহণ করেননি, একটি জনগোষ্ঠীর জীবন-উৎসের সমগ্র পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ঘটনাধারাকেও মহাকাব্যিক প্রসারতায় স্থাপন করেছেন। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *কাঁদো নদী কাঁদো* মহাকাব্যিক-উপন্যাস নয়, তাঁর জীবনাদর্শের প্রতিমান চিত্র; ব্যক্তিক অস্তিত্বের দায়ভার বহনে ব্যর্থ মুহাম্মদ মুস্তফার নাস্তি-চেতনার আলেখ্য হয়েও তা খতিব মিঞার মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানবিক অস্তিত্ব বোধের পাণ্ডুলেখ। তাই কোনো অতিশয়ন প্রবণতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে স্পর্শ করেনি, কখনো তিনি প্রধান ঘটনা-অংশ পরিহার করে যত্নবান হননি অপ্রধান; উপ কিংবা শাখা কাহিনী-সৃষ্টিতে। তাঁর কুমুরডাঙ্গার আখ্যান মূলত কোলাজধর্মী টুকরো ছবি এবং ঘটনাখণ্ডের মাধ্যমেই অখণ্ডকে আভাসিত করার সচেতনতা-সঞ্জাত। যেমন, কুমুরডাঙ্গার বার লাইব্রেরির বর্ণনা :

> এ-ঘরে বসে কুমুরডাঙ্গার কতিপয় উকিল মামলা-যুদ্ধের ফন্দি-কারবারই-এর সন্ধান করে, গল্পগুজব করে, চা-সিগারেট পান করে, গা-ঢালা নিস্পন্দতায় চুপ করে থেকে আরাম করে, অথবা চতুষ্পার্শ্বের কলরব বা সামনের মাঠ থেকে জনতার যে-অশ্রান্ত গুঞ্জন ভেসে আসে সে-গুঞ্জন অগ্রাহ্য করে নিদ্রা দেয়। ঘরের এক কোণে একটি আলমারিতে ঠাসা ইংরেজ-হিন্দুদের আমলের পুরাতন আইনের বই। তবে আলমারির কাঁচের দরজা অনেক দিন হলো ভেঙে গিয়েছে বলে সে-সব বইতে ধূলার প্রলেপ : সামনের ঘাসশূন্য, শুষ্ক মাঠ থেকে নিরন্তর যে-ধূলা ভেসে আসে সে-ধূলা ছোট ঘরটির সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে একটি ঘন আবরণ ছড়িয়ে রাখে।[১৮৭]

একই দৃশ্যবদ্ধ ও চিত্রাত্মক পরিচর্যা গৃহীত হয়েছে রোকনউদ্দিনের ওষুধের দোকানের বর্ণনায় :

> নানা রঙের রহস্যময় পানিতে ভরা বড়-বড় কতকগুলি কাঁচের পাত্র, দাওয়াইর শিশি-প্যাকেট ইত্যাদিতে সজ্জিত পুরানো কয়েকটা আলমারি, দেয়ালে বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন—একটি বিবর্ণ ঈষৎ ছেঁড়া বিজ্ঞাপনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিদেশিনী নারী দাঁত বের করে হাসছে⋯।[১৮৮]

কুমুরডাঙ্গার কাহিনী অংশের বাক্য গঠনও দীর্ঘ, কখনো তথ্যভারনত আবার কখনো পৌনঃপুনিক উপমা ব্যবহারে প্রলম্বিত হয়েই দীপান্বিত :

১ জমিদার বাবু এবং তার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা কোম্পানির নজরে পড়েনি, বা পড়লেও আসল আসামীকে যখন সরকার পর্যন্ত ধরতে পারেনি, চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে; মানহানির আইনের বিষয়ে উচ্চ ব্যবসায়ীরা সদাসতর্ক, যে-সতর্কতার প্রয়োজন গোপন-রিপোর্ট লিখতে বসেও তারা ভোলে না। তাছাড়া, সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত এ-সব গুপ্ত মন্তব্য কদাচিৎ সত্যের পথ অনুসরণ করে। মাস কয়েক পরে অনেক গবেষণা-আলোচনার পর কোম্পানি যেদিন কুমুরডাঙ্গা নামক ভয়ানক স্থানে আবার স্টীমার পাঠায় সেদিন সাবধানতার অন্ত থাকেনি। সেদিন স্টীমার অভ্যর্থনার জন্যে তারা কোন জাঁকজমক-সমারোহের ব্যবস্থা তো করেই নি, বরঞ্চ পুলিশেরা এমন কড়াকড়ি করেছিলো যে দু-একজন ন্যায্য যাত্রী ছাড়া আর কেউ ঘাটের ত্রিসীমানায় যেতে পারেনি। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নয়, সেদিন বন্দুক নিয়েই পুলিশ ঘাটে মোতায়েন ছিলো।[১৮৯]

২ স্টীমার আসবে না—সে-কথাই স্টেশনমাষ্টার বারবার ভাবে : নিত্য একবার উজানে, একবার ভাটিতে দু-দুবার ঘাটে জীবন-স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে-স্টীমার এসেছে সে-স্টীমার আসবে না। সুগম্ভীর সুরে বাঁশি বাজিয়ে দূরত্বের বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্টীমারের আগমন, ঢেউএর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, যাত্রীদের ত্রস্তব্যস্ত ওঠা-নামা, লস্করদের কর্মতৎপরতা, অবশেষে স্টীমারের প্রস্থানের পর আকস্মিক নীরবতা, আরো পরে উল্টো পথের স্টীমারের জন্যে প্রতীক্ষা—এ-সব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর নিতান্ত গতানুগতিক মনে হলেও খতিব মিঞার জন্যে একটি সত্যের পুনরোচ্চারণের মতই : সে ঘাটের স্টেশনমাস্টার।[১৯০]

৩ বহুদিন হলো তারই অজান্তে দুনিয়াটি কখন সঙ্কীর্ণ হয়ে কর্মজীবন ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানুষ এখন একটি রূপেই দেখা দেয় তার চোখে যাত্রীর, এবং দু-দণ্ডের জন্যে দেখা সে-যাত্রীও ভালোমন্দ আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হবার সুযোগ পায় না : যাত্রীর ছায়া, উড়ন্ত পাখির ছায়া, যে-ছায়া দিনে দুবার দেখা দেয় তার কর্মজীবনের প্রাঙ্গণে; কে কি-রকমের লোক তা বোঝার ক্ষমতা সে সত্যিই হারিয়েছে।[১৯১]

৪ তারা এ-ও জানে যে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রূপে মানুষের জীবনে মছিবত দেখা দেয় : কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো ধ্বংসাত্মক ঝড়তুফানের মত সগর্জনে, কখনো ফসল-পোড়ানো অনাবৃষ্টির মত নিঃশব্দে, কখনো মহামারীর মত অদৃশ্যভাবে, কখনো প্লাবনের মত প্রকাশ্যভাবে, কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে, কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে।[১৯২]

প্রথম দৃষ্টান্তে কুমুরডাঙ্গার স্টীমারঘাট প্রথম চালু হওয়া-কালীন বিপত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা অন্য কর্তৃক শ্রুত, তবারক ভুঁইঞার সমসাময়িক নয়। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রসায়নে পরিস্নাত হয়ে তা পুনর্নির্মিত হওয়ার সুযোগ নেই। উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্যও অতীতমুখিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই তথ্যবহ, বিশ্লেষণাত্মক রীতিই হয়েছে এর উপযুক্ত পরিচর্চা, অনিবার্য গদ্যরীতি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণে কুমুরডাঙ্গায় স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় যথাক্রমে খতিব মিঞা ও তবারক ভুঁইঞার দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। মূল প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও এ বিপন্ন বোধ একান্তই তাদের। খতিব মিঞা ও তবারক ভুঁইঞার অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অবস্থানের মিলনে নিষ্কাসিত বাস্তবতার প্রয়োজনেই তাই বাক্য হয়েছে নাতিদীর্ঘ; তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা বোধ ও বর্তমান অবস্থানের উল্লেখে গুরুভার।

উপরের সর্বশেষ উদাহরণে কুমুরডাঙ্গায় আকস্মিক নেমে-আসা বিপর্যয়কে মানবজীবনের বন্ধুর পথযাত্রার সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। জীবনপ্রবাহ দীর্ঘ এবং তা দেশ ও মহাকালের ব্যবধান অতিক্রম করেও বহমান। চরম সংকট মুহূর্তে একমাত্র ঔপন্যাসিকের পক্ষেই অনাসক্ত থেকে দার্শনিক প্রত্যয়ে জাগরিত হওয়া সম্ভব। সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত দৃষ্টান্তে তাই উপমার পর উপমা নির্মিত হয়েছে, সুপরিসর বাক্যে জন্ম মৃত্যু-শাসিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, রূপ-রূপান্তরকেই প্রকাশ করা হয়েছে।

কাঁদো নদী কাঁদো-তে 'শ্যাওলা আবৃত ডোবা'-এর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে মোট তেরো বার। শ্যাওলা আবৃত পুকুর যেমন গ্রামীণ বহির্বাস্তবতার উপমান চিত্র তেমনি তা মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনার্থের প্রতিরূপক। শিক্ষিত, কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম হয়েও মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মোত্তরণ ঘটেনি, আবাল্যের সেই সংকীর্ণ এলাকাতেই সে মানসিকভাবে আবদ্ধ থেকে গেছে। নিরস্তিত্ব বোধে আপন্ন ও আকীর্ণ মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহত্যাই তার দুর্বলচিত্ততা ও স্বাতিক্রমণে ব্যর্থ অন্তর-সত্তার বাষ্পীভূত রূপ, পরাভব ও ট্র্যাজেডি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *কাঁদো নদী কাঁদো*-র সঙ্গে আলবেয়ার কামু (Albert Camus ; 1913-1960)-র *দি প্লেগ* (১৯৪৭) উপন্যাসের আপাত ও অব্যবহিত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় যা স্বতন্ত্র বিবেচনায় উপস্থাপনযোগ্য।

কাঁদো নদী কাঁদো-র বেশকিছু ঘটনার সঙ্গে *দি প্লেগ*-এর সাদৃশ্য রয়েছে। *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে উকিল কফিলউদ্দিনের মৃত্যু কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদেরকে ভীত, এক গভীর অনিশ্চয়তা বোধ ও দুর্ভাবনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। *দি প্লেগ*-ও এম মিশেলের মৃত্যু ওরাঁ (Oran). বাসীদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে নিদারুণ আতঙ্ক ও অনিঃশেষ উদ্বেগের :

কাঁদো নদী কাঁদো :

> ... উকিল কফিলউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শহরময় প্রচারিত হলে সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, যেন তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, জরা-বার্ধক্য সে-মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। কাছারি-আদালতে, কাছারি-আদালতের সামনে ঘাসশূন্য ধূলাচ্ছন্ন মাঠে, বাজারের পথে, সে-পথের দুপাশে দোকানগুলিতে, মানুষের বাড়িতে উঠানে সর্বত্র একটি থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়। সকলের মনে একটি প্রশ্নই ঘোরাফেরা করে : বজরায় উঠতে গিয়ে উকিল সাহেব সর্পদষ্ট মানুষের মত ক্ষীপ্রবেগে পা

তুলে নিয়েছিলো কেন, কীই-বা শুনতে পেয়ে এমন ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলো? ডাক্তার বোরহানউদ্দিন বলে, ঘাটে পৌঁছাবার পর বৃদ্ধ মানুষটির হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় কেউ সন্তুষ্ট হয় না। সবারই মনে হয়, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন আসল কথাটা বুঝতে পারে নি: হৃৎপিণ্ড বিকল হলেও কেন হয়েছিলো, সে-কথা। নিঃসন্দেহে উকিল সাহেব কিছু শুনতে পেয়েছিলো, বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে কী একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তার কানে ফেটে পড়েছিলো।[১৯৩]

The Plage :

M. MICHEL'S death marked, one might say, the end of the first period. that of bewildering portents, and the beginning of another, relatively more trying, in which the perplexity of the early days gradually gave place to panic···· if things had gone thus far and no farther, force of habit would doubtless have gained the day is usual. But other members of our community, not in all cases menials or poor people, were to follow the path down which M. Michel had led the way. And it was then that fear, and with fear serious reflection, began.[১৯৪]

কুমুরডাঙ্গার বিচ্ছিন্নতা, দেশের অপরাপর অংশ এমন কি, বর্হির্বিশ্ব থেকে বিযুক্ত ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়াও *দি প্লেগ*-এর ওরাঁ-র বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এই দুই বিচ্ছিন্নতার কারণ এক নয়। কুমুরডাঙ্গা বিচ্ছিন্ন হয়েছে বাকাল নদীতে চর পড়ে স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ায়, আর ওঁরা-এর সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূলে আছে ডাক্তার বার্নার্দ রিউ-এর প্রতিবেদন (write) অনুধাবন করে জারিকৃত সরকারি অধ্যাদেশ :

On the day when the death-roll touched thirty, Dr Rieux read an official telegram which the Prefect had just hannded him. remarking. 'so they've got alarmed—at last.' The telegram ran : Proclaim a state of plague Stop close the town.[১৯৫]

কাঁদো নদী কাঁদো-র রহমত শেখের অবচেতন মনের ভয়, তার জীবিকার উৎস দোকানটি হারানোর আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার নবজাতক বাছুরটিকে নদীতে বলি দেওয়ার ঘটনার অনুরূপ পশু-হত্যাও *দি প্লেগ*-এ উপস্থিত। কিন্তু *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে রহমত শেখের বাছুর হত্যার দৃশ্যটি যেভাবে তার আবেগ, অবচেতন মনের ভীতিবোধের সঙ্গে সমীকৃত করে উপস্থাপিত হয়েছে-*দি প্লেগ*-এ তা অনুপস্থিত। ফরাসি উপনিবেশাধীন কোনো আলজিরীয় বন্দরের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এ-রূপ আচরণ সম্ভবও ছিল না। *কাঁদো নদী কাঁদো*-ও *দি প্লেগ*-এর সমধর্মী ঘটনাংশদ্বয় নিচে উদ্ধৃত করা হল :

কাঁদো নদী কাঁদো :

প্রথমে সে ধারালো ছুরি দিয়ে বাছুরটির গলা কাটে, ফিনকি দিয়ে তাজা উষ্ণ রক্ত উঠে তার দেহ এবং বস্ত্রের খানকিটা রঞ্জিত করে, যার উগ্র রঙের তুলনায় সন্ধ্যাকাশের রক্তিমাভা ফিকা-পানসে মনে হয়। তারপর রহমত শেখ রক্তাক্ত, মস্তকছিন্নপ্রায় বাছুরটি আবার বুকে জড়িয়ে ধরে তীর বেয়ে নিচে নেবে যায়,

> চোখে-মুখে নিথর ভাব। পানিতে নেবে সে হাঁটতে তাকে; হাঁটু, কোমর তারপর বুক পর্যন্ত সে-পানি উঠে আসে। এবার সে বাছুরটিকে শ্লথগতি স্রোতে ছেড়ে দেয়, চতুর্দিকে নদীর পানি গাঢ় হয়ে ওঠে।[১৯৬]

The Plague :

> It was about this time that our townsfolk began to show signs of uneasiness. For from 18 April onwards, quantities of dead or dying rats were found in factories and warehouses. In some cases the animals were killed to put an end to their agony.[১৯৮]

কাঁদো নদী কাঁদো-তে 'কান্নার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ' করে মোল্লা–মৌলবিরা কান্নাটির হাত থেকে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের' মুক্ত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের এই সক্রিয়তার উল্লেখ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :

> তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে আজানের ব্যবস্থা করে যাতে তার আওয়াজ শহরের সর্বত্র পৌঁছায়, প্রত্যেক শহরবাসীর কর্ণগোচর হয়। সঙ্গে-সঙ্গে মিলাদ পড়ানো বা ছদকা-শিরনি দেয়ার ব্যবস্থা করে। একদিন রাতে মসজিদে অনেক রাত পর্যন্ত বিশেষ নামাজের আয়োজন করে। তাতে শরিক হলে বিচিত্র কান্নার আওয়াজ বন্ধ হবে— এই বিশ্বাসে অসংখ্য লোক জড়ো হয় মসজিদে, অনেক রাত পর্যন্ত নামাজীদের সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠধ্বনিতে রাতের আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হয়।[১৯৮]

দি প্লেগ-এও আয়োজন করা হয়েছে সপ্তাহ-ব্যাপী প্রার্থনার। সেন্ট রক গির্জায় সমবেত অধিবাসীদের উদ্দেশে ফাদার প্যানেলিউ (Father Paneloux) ঘোষণা (sermon) দান করেছেন :

> Calamity has come on you, my brethren, and my brethren, you deserved it' ··· The first time this scourge appears in history, it was wielded to strike down the enemise of God. Pharaoh set himself up against the devine will, and the plague beat him to his knees. Thus from the dawn of recorded history the scourge of God has humbled the proud of heart and laid low those who hardened themselves against Him. Ponder this well, my friends, and fall on you knees'.[১৯৯]

কিন্তু কামু-র প্রতিপাদ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্বিষ্ট নয়। কামু-র *দি প্লেগ* মূলত ডাক্তার বার্নার্দ রিউ-এর একক প্রচেষ্টায় আত্ম-উত্তরণ, তাঁর সংগ্রামী চৈতন্য ও মানব প্রেমেরই উপাখ্যান। তাছাড়া কামুর প্লেগ প্রতিরূপকী মূল্যে বিশিষ্ট, মানুষে-মানুষে বিচ্ছেদ, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা এবং পাশ্চাত্য ধনবাদী সভ্যতারই রূপান্বিত রূপক। তাঁর মতে, প্লেগের জীবাণুকে কখনোই সর্বাংশে নির্মূল করা যায় না, তা বার-বার ফিরে আসে। *দি প্লেগ*-এর শেষে ডাক্তার বার্নার্দ রিউ-ও বলেন :

> ··· the plague bacillus never dies or disapperas for good ; that it can lie dormant for years and years in furniture and linen-chests ; that it bides its time in bedrooms, cellars, trunks, and bookshelves; and that perhaps the day would come when, for the bane and the enlightening of men, it roused up its rats again and sent them forth to die in a happy city.[২০০]

সে-ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো একক মানুষের জাগরণের মধ্যে মুক্তি খোঁজেননি। বৃহৎ মানুষের মৃত্তিকা-সংলগ্ন পুনর্জাগরণের মধ্যেই তিনি মুক্তির সন্ধান করেছেন। আর খতিব মিঞাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সেই ঔপন্যাসিক জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতিভূ।

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবনদর্শন, শৈল্পিক জীবনার্থের মতো উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যার দিক থেকেও *কাঁদো নদী কাঁদো*-য় ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভা চূড়ান্ত পরিণতি, প্রত্যাশিত শিল্পসিদ্ধি ও অনিবার্য সাফল্য লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ ক …'লালসালু'ই পাক-বাংলা সাহিত্যের প্রথম সত্যিকারের উপন্যাস। … 'আমাদের সমাজ-জীবনের একটা গলদকে এমন বস্তুনিষ্ঠভাবে সরস রচনার মাধ্যমে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ'—আবুল কালাম শামসুদ্দিন; সভাপতির ভাষণ ('পূর্ব পাকিস্তানের উপন্যাস' শীর্ষক আলোচনা) : *আমাদের সাহিত্য* (সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত) ; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ ১৯৭

খ 'লালসালু' সম্ভবত গ্রাম্য সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ—দুর্মর কুসংস্কার ও ধর্ম-ব্যবসার মর্মান্তিক প্রকৃতি নিরূপণে প্রথম আধুনিক প্রচেষ্টা।"—হাসান আজিজুল হক, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ ২১

গ "সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাস বেত্তার দূরদৃষ্টি ও শিল্পীর স্বাস্থ্যকর সহমর্মিতা *'লালসালুর'* শিল্পীর অন্তরে সমন্বিত হয়েছিল। সেজন্য সমাজ-বাস্তবতার সুনিপুণ চিত্রণে ওয়ালীউল্লাহ্র কৃতিত্ব অসামান্য।"—মনসুর মুসা ; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, *লালসালু : ভাষারীতি* ; *লালসালু এবং ওয়ালীউল্লাহ্*, (মমতাজউদদীন আহমদ সম্পাদিত) ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশন, পৃ ৬৫

২ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী* (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ৫

৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী*-১, পৃ ৭

৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৯

৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৯

৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫–৬৬

৭-৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫

১০ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

১১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫

১২-১৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩–৩৪

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৫

১৯ স্মরণীয়, একটি উপন্যাসে তিন ধরনের চরিত্র থাকে—কেন্দ্রীয়, মধ্যবর্তী ও পরিপ্রেক্ষিত। প্রধান চরিত্রই উপন্যাসের প্রাণ। কেননা তারই মাধ্যমে উপন্যাস–ধৃত বক্তব্য প্রকাশ পায়। ঔপন্যাসিকের মানস-সহানুভূতি, তাঁর মৌল আকর্ষণ এই চরিত্রের

প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু মধ্যবর্তী চরিত্র প্রধান চরিত্রকে বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য ও হয়ে-উঠতে সাহায্য করে। 'They are the vehicles by which all the most interesting questions are raised ; they evoke our beliefs, sympathies, resulasions ; they incurnate the moral vision of the world inherent in the total novel. In a sense they are end-products ; they are what the novel exists for ; it exists to reveal them".—W.J. Harvey ; 1965, *Character and the Novel*, London : Chatto & Windus, p. 56

২০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–১, পৃ ৬১

২১ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮

২২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫

২৫-২৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

২৮ পরিপ্রেক্ষিত–চরিত্র প্রসঙ্গে হার্ভের বিবেচনা স্মরণীয় : "···many different kinds of creation we may leemp together as "background" characters. These may ··· be allowed a moment of intensity and depth, but equally they may be almost entirely anonymous, voices rather than individualized characters. Singly they may be merely useful cogs in the mechanism of the plot, collectively they may established themselves as a chorus to the main action..."—*Character and the Novel*. P 56

২৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত।

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ ৫ থেকে ৬৬ পর্যন্ত।

৩১ প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬ থেকে উপন্যাসের সমাপ্তি পর্যন্ত।

৩২ আধুনিক উপন্যাসের দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, পরিচর্যা-রীতি সম্পর্কে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য : Percy Lubback ; 1965, *The Craft of Fiction*, London : Jonathan Cape. Pp 72-76

৩৩-৩৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী*–১, পৃ ৩

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৬

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৮

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭–৩৮

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩

৪০-৪১ প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৮

৪৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–১, পৃ ৭১

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫

৪৮ *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ ৫৯

৪৯ উপন্যাসের ভাষা, শব্দের গুণাগুণ বিচারের ইতিহাস কথাসাহিত্যের এই বিশেষ প্রজাতিটির ক্রমবিকাশের ইতিকথার মতোই বিস্তৃত ও দীর্ঘকলেবর এবং এ ক্ষেত্রে আলোচকদের সিদ্ধান্তও বিবিধ, কখনও পরস্পর-বিরোধী আবার কখনও একান্তভাবেই

তাদের মনোদ্ভূত, চেতনালোকাশ্রয়ী। অনেকের মতে উপন্যাসের ভাষাকে অবশ্যই ব্যঞ্জনাত্মক হতে হবে এবং এই বিশেষ চারিত্রের কারণেই উপন্যাসের শব্দ অভিধান–অতিরিক্ত অর্থপ্রকাশের সহায়ক হয়: "মনের ক্রিয়া ভাষার সম্মিলনে সম্ভব করে তোলাই ঔপন্যাসিকের তথা সমস্ত শিল্পীর কাজ। একাজে তাঁর প্রধান অবলম্বন শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি।"—শিশির চট্টোপাধ্যায়; মে ১৯৬২, *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা,* কলিকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ৫৬

এ অভিমত থেকে অন্য সমালোচকের বিবেচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব প্রেক্ষণচিন্তা ও জীবনদৃষ্টির অনুগামী। তিনি উপন্যাসের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন কোনো আর্টরূপে বিবেচনার পরিবর্তে যে-জীবন রূপায়ণের অনিবার্য যন্ত্রণা থেকে ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন, তাঁর সেই আন্তর অনুভূতির সঙ্গে পরম্পরিত করে বিবেচনায় আগ্রহী :

উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুইকে ধারণ করে। আর যেহেতু উপন্যাস যে-কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাসমাত্র নয়, সেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্ঘানকালেই উপন্যাস–লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। কাব্যিক মানুষ অথবা নাটকীয় মানুষ নয়, বাস্তব মানুষটা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। তার কর্মিষ্ঠ অস্তিত্বকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গিয়ে উপন্যাস–শিল্পের জন্ম। ··· "গদ্যের স্থল এবং কাব্যের জল উভয়ত্র তাকে হতে হয় সাবলীল।"—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৮০, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* কলিকাতা : সাহিত্যশ্রী, পৃ ৫৩

অন্যদিকে ইংরেজ সমালোচক সমগ্রতা-সন্ধানী, বাক্য গঠন-প্রক্রিয়া ও অলংকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে ঔপন্যাসিকের ভাষারীতি অপূর্বত্ব অন্বেষণে সচেষ্ট :

The good novelist ; for example, will use language in such a way that at every point in the narrative the meaning of each unit is sharpened and paticularized by its position in the context, by its relation to meanings that preceedes it and follow it, so that as the story preceeds the narrative line as laid down by purely semantic meaning of the words becomes, not a single line, but a rich pattern of significance in which the rise and fall of sentence, the lenght of panagraphs, the verbs and images used in describing an incident all constitute new enrichment to what is being said David Daiches : 1964, *A Study of Literature for Readers and Critics,* London : The Norton Library, P 75

৫০ অমিয়ভূষণ মজুমদার : বৈশাখ ১৩৬৮, *উপন্যাসের ভাষা : বাঙলা গদ্য-জিজ্ঞাসা,* (নীহাররঞ্জন রায় ও অন্যান্য সম্পাদিত), কলিকাতা : সমতট প্রকাশনী, পৃ ১৫৬

৫১ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮

৫২ *লালসালু*-র সংলাপে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক ভাবা, বিশেষত, নোয়াখালি-ময়মনসিংহের কথ্যবুলির ব্যবহার লক্ষণীয়। আর উপন্যাসের চরিত্রের ব্যক্তিস্বরূপ ও পারিপার্শ্বিকতা উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক বিপুলভাবে ব্যবহার করেছেন আরবি-ফারসি শব্দ, কোরান-হাদিসের অনুষঙ্গ।

(ক) "পীর সাহেবের খাতিরের শেষ নেই; তার সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তার রুহানি, তা'কত ও কা'শ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে নামাজ-

পড়ানো খোন্‌কার-মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রূহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে-অন্তরে দীনতা বোধ করে।"— *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১; পৃ ৩২

(খ) "কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথম বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভনিতাসহকারে বর্ণনা করে।"—প্রাগুক্ত, পৃ ৪১

৫৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ১০

৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

৫৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*- ১, পৃ ২০

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৫২

৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭

৬০ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

৬১ প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

৬৩ M Rosenthal & P Yudin (ed.) : 1967, A Dictionary of *Philosophy*. Moscow : Progress Publishers, p 441

৬৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ১৬৬

৬৫-৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১০১

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১০২

৬৯ অবন্তীকুমার সান্যাল ; *জাঁ-পল* সার্ত্র : বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ; অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, *বিজ্ঞাপনপর্ব* (রবিন ঘোষ সম্পাদিত), ১৬ : ১-২, পৃ ২৮৩

৭০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ১১৭

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬

৭৩ যুবক শিক্ষকের অন্তর-আদালতের সঙ্গে ফ্রানৎস কাফকা-র *The Trail*-উপন্যাসের জোসেফ কে-এর মনো-আদালতের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দ্র : Franz Kafka. : 1988, *The Collected Novels of Franz Kafka*, England : Penguin Books, Pp 88-126. এই অন্তর্লক্ষণ ও আপাতত সামঞ্জস্যকে উপজীব্য করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে পাশ্চাত্য-প্রভাব সম্পর্কিত একটি বিবেচনাও প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু বর্তমান অভিসন্দর্ভের সঙ্গে তা প্রসঙ্গবদ্ধ নয় বলে সে-প্রচেষ্টা থেকে সচেতনভাবেই বিরত থাকা হয়েছে।

৭৪ দ্রষ্টব্য : প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় ; অক্টোবর ১৯৮৬, *জাঁ-পল সার্ত্রর দর্শনে মানবতাবাদ*, কলকাতা : দে বুক সেন্টার (পরিবেশক), পৃ ২০

৭৫ "...there is freedom only in a situation, and there is a situation only through freedom. Human-reality evereywhere encounters resistence and obstacles which it has not created, but these resistences and abstacles have meaning only in and through the free choice which human-reality is."-Jean-Paul Sartre : 1969, *Being and Nothingness*. London : Methuen & Co. Ltd. P 489

৭৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী*–১, পৃ ১৫৩
৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫
৭৮-৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৮
৮০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫
৮১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬
৮২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৮
৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৪
৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৩
৮৫-৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৪
৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭
৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১৯০
৮৯ "The Border line situation enables man to pass from the untrue being to the true being, frees him from the bondage of everyday consciousness, which, the existentialists claim, cannot be achieved by the theoretical, scientific thought."— *A Dictionary of Philosophy*. Ibid. Pp 56-57
৯০ দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্র অস্তিত্বকে অভিপ্রায় বা কর্মের সঙ্গে সমান্তরাল করে ভেবেছেন। তাঁর মতে, সচেতন অভিপ্রায়ের জৈবিক ও জ্ঞানবান প্রতিনিধি হয়েই মানুষ হয় অস্তিত্ববান। এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য : প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায় ; *জাঁ-পল সার্ত্রর দর্শনে মানবতাবাদ*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০-৪৩
৯১ সৈয়দ আকরম হোসেন ; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬
৯২ দ্রষ্টব্য : বদরুদ্দিন উমর, নভেম্বর ১৯৭০, *পূর্ববাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম খণ্ড), ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ ১০৮-১১
৯৩ দ্রষ্টব্য : কামরুদ্দীন আহ্‌মদ ; ১৩৭৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৩, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : ইনসাইড লাইব্রেরী, পৃ ১২৬-৪০
৯৪ সৈয়দ আকরম হোসেন ; *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ ২১
৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ ২১
৯৬ J A Guddon : 1979, *A Dictionary of Literary Terms*. England : Penguin Books, P 46
৯৭ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–১, পৃ ১০৪
৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭-০৮
৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬
১০০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৩
১০১ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–১, পৃ ১৩৭
১০২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৬
১০৩ দ্রষ্টব্য : *A Dictionary of Literary Terms*. P 47
১০৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–১, পৃ ৯৫
১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭
১০৬-০৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩
১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩
১০৯ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮
১১০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬

১১১ প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২
১১২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৫
১১৩ প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৭
১১৪-১৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬
১১৬-১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৭
১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৪
১১৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ১১৪
১২০ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫
১২১ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩
১২২ *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ ৬১
১২৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৯৬
১২৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪
১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩১
১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৫
১২৭-২৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬
১২৯ প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯
১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯
১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ ১১৩
১৩২ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬
১৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৪
১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৯
১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩
১৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮
১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭
১৩৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, ১২৮
১৩৯ দ্রষ্টব্য : (ক) মনসুর মুসা ; এপ্রিল ১৯৭৪, *পূর্ববাঙলার উপন্যাস*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ ৬২
খ) আবু রুশদ্ ; জুলাই ১৯৮৮, *শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস*, ঢাকা : সৃজনী প্রকাশনী লিমিটেড, পৃ ৫৮
১৪০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; ১৯৭৪, *কালের প্রতিমা* ; কলিকাতা ; দে'জ পাবলিশিং, পৃ ৩৬৯
১৪১ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*-১, পৃ ২২৭
১৪২ প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩
১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ ২৩৩-৩৪
১৪৪-৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৫
১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৫
১৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯০
১৪৯ *The Encyclopedia of Philosophy* (Vol. 3 and 4) : 1967, London: Mack-millan Philosophy Co., Inc. & the Free Press, P 149
১৫০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*-১, পৃ ২২১-২২
১৫১ প্রাগুক্ত, পৃ ২২১
১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ ২২৯
১৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৫
১৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৬

১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৭
১৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮০
১৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮১
১৫৮-৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮২
১৬০ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৯
১৬১ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫২
১৬২ প্রাগুক্ত, পৃ ১৯৯
১৬৩-৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ ২০০
১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ ২১২
১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ ২১২-১৩
১৬৭-৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮
১৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৯-৩০
১৭০ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩০
১৭১ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৫
১৭২-৭৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৫৬
১৭৫ *A Dictionary of Literary Terms*, Ibid, p 661
১৭৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ২০৭
১৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ ২১৭
১৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮২
১৭৯-৮০ প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৬
১৮১ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫
১৮২ প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬
১৮৩ Robert Short ; 1976, *Dada and Surrealism : Modernism.* London : Penguin Books, p 302
১৮৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*—১, পৃ ৩৩৪
১৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪২
১৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৫-৪৬
১৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৮
১৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৮
১৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ ২১৪
১৯০ প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮
১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ ২২১
১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ ২২৭
১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৫-৩৬
১৯৪ Albert Camus ; 1947, 1972, *The plauge*, London : Penguin Books, p 22
১৯৫ *The Plague*, Ibid, P 56
১৯৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-রচনাবলী*-১, পৃ ৩৩৯
১৯৭ *The plague*, p. 15
১৯৮ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*-১, পৃ ৩১৬-১৭
১৯৯ *The Plague*, p 80
২০০ প্রাগুক্ত (A.D.of l. Texmd.) P 252

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক

বহিপীর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম নাটক *বহিপীর*। ১৯৬০ সালে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের সম্পাদনায় অপর দুটি নাটক (মা, আবর্ত)-এর সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত[১] হলেও এর রচনাকাল ১৯৫৫। এ বৎসর পি ই এন ক্লাবের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা'-য় অংশগ্রহণের জন্যই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *বহিপীর* রচনা করেন ও দ্বিতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস *লালসালু* (১৯৪৮) থেকে *বহিপীর*-এর প্রকাশকালগত ব্যবধান সাত বৎসর এবং শিল্পরূপের বিভিন্নতা সত্ত্বেও দুটি রচনাতেই তিনি অভিন্ন প্রতিপাদ্য উপস্থাপন, এ দেশীয় সমাজ-চৈতন্যকে স্পর্শ করেও আধুনিক ব্যক্তিমনের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচনে হয়েছেন সচেষ্ট। তবে *লালসালু*-র দেশকাল সংলগ্ন সুবিস্তৃত ক্যানভাস, *বহিপীর*-এ নেই। এ নাটকে মাত্র ছটি চরিত্রের সাহায্যেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বক্তব্য, তাঁর নাট্য-প্রতিভার শৈল্পিক নৈপুণ্য হয়েছে অভিব্যক্ত।

রেশমপুরে 'যৎকিঞ্চিৎ জমিদারি'-র মালিক হাতেম আলী তাঁরই পারিবারিক বজরায় ঢাকা যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন স্ত্রী খোদেজা এবং ' কলেজের পড়া-শেষ করা' পুত্র হাশেম আলী। 'সান্ধ্য-আইনে' হাতেম আলীর জমিদারি নিলামে ওঠার উপক্রম হয়েছে। তাঁর ঢাকা-আসার লক্ষ্য তাই অর্থসংগ্রহ, বিপন্ন জমিদারি রক্ষা। কিন্তু হাতেম আলী তাঁর ঢাকা-আগমনের অভিপ্রায় স্ত্রী-পুত্রের কাছে গোপন রেখে বলেছেন, চিকিৎসার জন্য তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। কেননা, তাঁর বিশ্বাস, এই দারুণ দুঃসংবাদে খোদেজা ও হাশেম আলী অন্তরে চরম আঘাত পাবে, পিতাকে কপর্দকশূন্য জানলে হাশেম আলীর 'ছাপাখানা দেয়া'-র স্বপ্ন হবে বিচূর্ণিত, তার প্রত্যাশা হবে আহত ও উন্মূলিত।

ঢাকার নিকটবর্তী ডেমরাঘাটে বজরা উপস্থিত হলে জমিদার-গৃহিণী খোদেজা 'বিপন্ন অবস্থায়' তাহেরাকে দেখেন। তখন তাহেরার প্রতি তাঁর সহানুভূতি জাগে। তাহেরাকে তিনি 'বজরায় তুলে' নেন। ক্রমান্বয়ে জানা যায় যে, তাহেরা সৎমার সংসারে, তাঁরই অনাদর ও অবহেলায় লালিত হয়েছে। পিতাও কখনো তাহেরার প্রতি সদয়, অতিরিক্ত স্নেহার্দ্র ছিলেন না। অতঃপর তাহেরার বিমাতা ও বাবা তাঁদের পীর, 'কিছু বেশি' বয়সের বহিপীরের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। কিন্তু সে বকরী-ঈদের গরু-

ছাগল নয়। তাই 'সাক্ষী-কাবিননামা' থাকলেও জবরদস্তিমূলক ও তার অনিচ্ছায় নিস্পন্ন এ বিয়ে সে মানে না। অতঃপর নিরুপায় তাহেরা সবার অজান্তে তার চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে ঘর ছেড়েছে। এ দিকে বহিপীর তাঁর ত্রিশ বছরের খেদমতগার হকিকুল্লাহ্কে 'সঙ্গে করিয়া' তাহেরাকে 'খুঁজিতে বাহির' হন। কিন্তু ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। 'খালের ভিতর ঢুকবার সময়' তাঁর নৌকার সঙ্গে জমিদারের বজরার ধাক্কা লাগে। ফলে বহিপীরও হাতেম আলীর বজরায় স্থান পান।

বহিপীর জানতেন না যে, একই বজরায় তিনি ও তাহেরা অবস্থান করছেন। হকিকুল্লাহ্ই সে-তথ্য তাঁকে পরিবশেন করেছে: 'হুজুর তিনি পাশের কামরাতেই আছেন। ..... জমিদার সাহেবের বিবি একটি অচেনা বিপদগ্রস্তা মেয়েকে কাল ডেমরার ঘাট থেকে বজরায় তুলে নিয়েছেন'।[২]

হাতেম আলী পূর্ব-পরিকল্পনানুসারে ডাক্তার দেখানোর নামে ঢাকায় আনোয়ারউদ্দিনের গৃহে উপস্থিত হন। তাঁর বিশ্বাস, বাল্যবন্ধু তাঁকে নিরাশ করবেন না, যেভাবেই হোক টাকার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তাঁর সে-প্রত্যাশা সফল হয়নি। বজরায় ফিরে এলে হাতেম আলীর উৎকণ্ঠিত রূপ, তাঁর 'বিলাপ', 'অস্থিরভাবে পায়চারি' বহিপীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বোঝেন, তাঁরা একই কামরায় বসে অথচ 'দুজনেই দুঃখ ভোগ' করছেন, 'কেহ্ কাহারো সাহায্যে' আসছেন না। বহিপীর তাই হাতেম আলীর বেদনার কারণ জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন:

> সারা বিকাল, সারা সন্ধ্যা কাটলো আশায়-আশায় যে বাল্যবন্ধু আনোয়ার আসবে। .... কিন্তু সে এলো না। ....আর একটা রাত। এতদিনের পুরোনো জমিদারির শেষরাত। আমার ছেলে আর তার মা এখনো জানে না যে এইটেই তাদের জমিদারির শেষরাত।[৩]

পীর সাহেব হাতেম আলীকে সাহায্য করতে রাজি হন: 'আমি পীর মানুষ, আমি অত টাকা কোথায় পাইব যাহার দ্বারা আপনার জমিদারি উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু খোদা আমাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন। ....তিনি আমাকে অনেক ধনী মুরিদও দিয়াছেন, যাঁহাদের কাছে হাত পাতিলেই যাহা চাইব তাহাই তাঁহারা দিবেন।[৪] কিন্তু তাঁর উপকার নিঃশর্ত হবে না। হাতেম আলীকেও তাঁকে সাহায্য করতে হবে : 'আপনাকে আমি টাকা কর্জ দিব এই শর্তে যে আমার বিবি আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।'[৫] কিন্তু তাহেরা জানিয়েছে যে, তাকে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করা হলে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করবে। হাশেম আলীর মতে, এভাবে জোরপূর্বক একজন বৃদ্ধের সঙ্গে তাহেরার বিয়ে দেওয়া অন্যায়, অবিচার। সে এর প্রতিকার চায়। শেষপর্যন্ত মা, বাবা ও বহিপীরের বিরুদ্ধে গিয়ে হাশেম আলী তাহেরার সঙ্গে বজরা থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

উল্লিখিত ঘটনাবৃত্ত আপাতভাবে সরল, এক রৈখিক এবং তা একটি বিশেষ সমাজ বাস্তবতাকেই স্পর্শ করেছে। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *লালসালু*-র মতো *বহিপীর*-এও এ দেশীয় ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তি, পীর-দরবেশ-খাদেমদের

অন্তর্গত চারিত্রিক অসংগতি, তাঁদের ফ্রয়েডীয় বিচ্ছিন্নতা ও লিবিডো চেতনা, উপভৌগিক মানসিকতার রূপাংকনেই সচেষ্ট, সযত্ন ও সনিষ্ঠ। কিন্তু আমরা জানি, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শিল্পী হিসেবে কেবলই সমাজের বহির্স্তরকে আশ্রয় করেন না। তাঁর রচনামাত্রই স্তরবহুল, বাহির ও অন্তর সত্যে উজ্জ্বল। বহিরাঙ্গিক সমাজবাস্তবতা তাঁর অবলম্বন হলেও অন্তর্গত মৌল প্রতিপাদ্য নয়। অন্য কথায়, একটি সমাজ চৈতন্যমূল ও প্রাত্যহিক বাস্তবতাকে অবলম্বন করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর অভিপ্রেত সত্য পরোক্ষে, অনাসক্ত ও অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। *বহিপীর*-এও তিনি সেই অন্তর্গত সত্য (inner truth), তাঁর অস্তিত্ববাদী বক্তব্যসহ উপস্থিত। *বহিপীর*-এ গৃহীত চরিত্র বিশেষত, তাহেরা, হাশেম আলীর পুনর্জাগরণ, দায়িত্বের দায়ভার বহন করে তাদের শুদ্ধ সত্তা ও মীমাংসিত চেতনায় সুস্থির হওয়ার মাধ্যমেই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য, অন্বিষ্ট সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তাহেরা *কাঁদো নদী কাঁদো*-র খোদেজা নয়। বরং লালসালু-র জমিলার সঙ্গেই সে দূরস্থিত সম্পর্কে বদ্ধ। বিয়ের পরই জমিলা বুঝেছে 'যে সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।' অতঃপর মজিদ, মাজার ও পরিণামভীতিশূন্য জমিলা হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী। সে-ক্ষেত্রে তাহেরা প্রথম আবির্ভাব থেকেই পরিণাম ভয় শূন্য আর এই মনোগঠন, জাগরণের কারণেই মা-বাবার অজান্তে নাবালেগ চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে গৃহবহির্গত হওয়ার সাহস তার হয়েছে। খোদেজার উক্তিতেও তাহেরার ব্যক্তিস্বরূপ, তার জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে: 'যে-মেয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে সে অত সহজে ভয় পায় না'।[৬] হাশেম আলী তাহেরাকে পীর সাহেবের 'বিবি' বলে সম্বোধন করলেও তাহেরার অহং চেতনা ও মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। ফলে এ-ক্ষেত্রেও সে হয়েছে প্রতিবাদী:

> বহিপীরের বিবি। তিনি আমাকে কখনো দেখেননি, তার ঘরও করিনি খেদমতও করিনি।[৭]

একই সম্বোধন বহিপীর করলেও তাহেরা তা সমর্থন করেনি, জানিয়েছে তার পৌনঃপুনিক অসম্মতি ও অসমর্থন। বহিপীর-প্রদর্শিত পুলিশ-ভীতি থেকেও তাহেরা মুক্ত, নিজস্ব সিদ্ধান্তে শিকড়ায়িত ও কৃতকর্মের পরিণামী দায়ভার বহনের প্রতিজ্ঞায় অবিচলিত:

> আমাকে বিবি সাহেব ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। ··· আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাবো না। আপনি আমাকে দেখেননি, আমিও আপনাকে দেখিনি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।[৮]

পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহারের মাধ্যমে বিপ্রতীপ পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম-উত্তরণে তাহেরা সিদ্ধ, সক্ষম ও মেধাশাসিত। হাতেম আলীর জমিদারি উদ্ধারের জালে যে-শর্ত বহিপীর আরোপ করেছেন তার সঙ্গে পরিচিত হয়েই সে বুঝেছে: 'পীরসাহেব বুদ্ধিমান লোক। কেবল তিনি এবার অন্য এক ধরনের চাল

চেলেছেন'।[৯] তাহেরাও তাই নেমেছে বুদ্ধির খেলায়, হয়েছে কৌশলী। সেও আরোপ করেছে শর্ত:

> পীরসাহেব যা চান তাই হবে। তাকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাবো। কিন্তু আগে তাঁকে টাকাটা দিতে হবে, তারপর আমি যাবো।[১০]

কেননা ইতোমধ্যে তাহেরা জেনে গেছে যে, সে আর একা, নিরবলম্ব নয়, জমিদার-পুত্র হাশেম আলী এখন তার সঙ্গী। বহিপীর তাই পরাজিত, তাঁর কৌশল ব্যর্থ।

হাশেম আলীকে *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলী বলা যায় না। কেননা আরেফ আলী সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা থেকে এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তাবোধ ও পরিণামভীতির অগ্নিদাহ অতিক্রম করেই হয়ে উঠেছে দায়িত্ববান, অস্তিত্ব-সচেতন; আর হাশেম আলী প্রথম থেকেই দায়িত্ববোধে সচকিত ও জাগ্রত। অন্তর্গত জাগর সত্তা ও বুদ্ধি-বিবাচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাকে কোনো প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়নি। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই তাকে জ্ঞানময় ও দায়িত্ব-সচেতন সত্তায় করেছে প্রতিস্থাপিত ও শিলীভূত। তাহেরা-প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেনি। মা খোদেজাকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে :

> আমি তাঁকে বাঁচাবোই। তাকে বিয়ে করে হলেও বাঁচাবো।[১১]

হাশেম আলীর মানবিক সত্তার এ জাগরণ, তার দায়িত্ববোধ ও নির্ভীক সত্তার উজ্জীবন শেষপর্যন্ত উচ্চকিত থেকেছে। জমিদারি হারানোর ভয়, ছাপাখানা দেওয়ার স্বপ্ন অপসৃত হলেও, এমনকি জীবন-জীবিকার গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েও কর্তব্য পালনের দায়ভার থেকে হাশেম আলী পলায়ন করেনি। অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি হয়েও সে ঘোষণা করছে :

১ আমার আর ভয়-ডর নাই। আর আমি কাউকে ভয় করি না।[১২]

২ চলুন আমার সঙ্গে, ...আপনাকে নিয়ে যাবোই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাবো। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।[১৩]

একজন অস্তিত্বঅভীপ্সু ব্যক্তির দায়িত্ব শুধু তাঁর নিজের মধ্যেই সীমায়িত থাকে না। তিনি নিজের জন্য যে-সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন, তা তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্যই করেন।[১৪] মানুষের দায়িত্ব ও স্বাধীনতাকে সংরক্ষণের জন্য তিনি সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত থাকেন।[১৫] হাশেম আলীই তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আরাধ্য; তিনিই নাট্যকারের অস্তিত্ববাদী বক্তব্যের প্রাণপুরুষ, তাঁর উদ্দিষ্ট প্রতিপাদ্যের সত্তাময় প্রতিনিধি।

হাশেম আলীর পিতা হাতেম আলীর মধ্যেও একটি দ্বন্দ্বমথিত সত্তা প্রত্যক্ষ করা যায়। নাটকের শুরু থেকেই তিনি জমিদারি হারানোর আশঙ্কায় কাতর ছিলেন। বন্ধু আনোয়ার উদ্দিনের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির আশা অন্তর্হিত হলে তাঁর সেই ভয়, অনিশ্চয়তাবোধ ও পরিণামভীতি হয় আরো গভীর ও অন্তর্ভেদী। পীরসাহেব টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব করলে তাই তাঁর সামনে একটি নবতর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ

প্রস্তাব তাঁকে আবার সংকটের মধ্যেও নিক্ষেপ করে। কেননা এর পর তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। [এক]. তাহেরাকে ফেরত পাঠিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা। [দুই]. তাহেরাকে বাঁচতে সাহায্য করে দুঃসহ বাস্তবতাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয়টিকেই হাতেম আলী নির্বাচন করেছেন, ভীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি বহিপীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন:

> তিনি রাজি আছেন আমি রাজি নাই। আমি এভাবে টাকা নিতে পারবো না। যায় যাক জমিদারি।[১৬]

বহিপীরের মধ্যে *লালসালু*-র মজিদের কণ্ঠস্বরই শ্রুত হয়, মজিদের মতোই তিনি বলেন: 'আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।'[১৭] মজিদের অবচেতনায় লালিত উপভৌগিক মানসিকতা, নিজের মধ্যে ঘনীভূত বিচ্ছিন্নতাবোধ দূর করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ের প্রবণতাও বহিপীরের মধ্যে লক্ষণীয় :

> আমার প্রথম স্ত্রীর এন্তেকাল হয় চৌদ্দ বৎসর আগে। ···আমার সন্তান-সন্ততিও নাই, দেখাশুনা করিবার জন্য এ হকিকুল্লাহ আছে। কিন্তু সে আর কত করিতে পারে। দেখিলাম, বিবাহ করাটাই সমীচীন হইবে। অতএব আমি নিমরাজি হইতেই বাকি কার্যের ভার আমার পেয়ারা মুরিদ নিজের হাতেই গ্রহণ করিলেন।[১৮]

মজিদ জমিলাকে তার প্রতি একনিষ্ঠ ও অখণ্ড অনুগত্যে শৃঙ্খলিত করে তুলতে প্রায় অমানবিক, পাষণ্ডের মতো আচরণ করেছে। কিন্তু বহিপীর সে-তুলনায় সংযত ও পরিস্থিতি–সচেতন। তাৎক্ষণিকভাবে তাহেরাকে পুলিশের ভয় দেখালেও তিনি বুঝেছেন, 'জোর জুলুম করিয়া পাগলা হাতিকেও বশ করা যায়, কিন্তু মানুষ-তো আর জন্তু নয়।[১৯] এবং তাঁর আর তাহেরার সংকট-নিষ্পত্তি 'পুলিশের ব্যাপার নহে। পুলিশ কীই-বা করিতে পারে।'[২০]

বহিপীরের আত্ম-উত্তরণ মজিদের ঘটেনি। *লালসালু*-র অন্তিমে পরাজিত মজিদ গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু বহিপীর চরম পরাভব মুহূর্তেও নিজেকে ভিন্নভাবে নির্মাণ করেছেন। হাশেম-তাহেরার বজরা ছেড়ে চলে যাওয়ার মাধ্যমে যে-পরিবর্তনের সূচনা, নবতর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার যে-ইংগিত আভাসিত হয়েছে তা উপলব্ধি করেই তিনি ভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে সচেষ্ট হয়েছেন :

> তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়া-তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই। ···· আসুন জমিদার সাহেব, আমরা আপনার জমিদারি রক্ষার ব্যবস্থা করি।[২১]

প্রগতিশীল শক্তির যখন বিকাশ ঘটে তখন মৌলবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূল্যবোধ নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এভাবে হয় সংঘবদ্ধ। হাতেম আলী-বহিপীরের মিলন তাই সমাজসত্য, নাট্যকারের সময় ও সমাজ সচেতনতারই রূপক।

বস্তুত, বহিপীর *লালসালু*-র মজিদের 'চরিত্রপ্যাটার্নের নবতর রূপায়ণ'[২২]; আর তার পরাভবের মাধ্যমে সামন্ত মূল্যবোধ-আশ্রয়ী এ দেশীয় সমাজ-কাঠামো ও সেই অন্তঃসারশূন্য চেতনা হয়েছে সংকেতায়িত।[২৩]

খোদেজাকে নাট্যকার তাহেরার বিপরীত মূল্যবোধে স্থিতধী এক নারী-সত্তা রূপে নির্মাণ করেছেন। খোদেজা সংস্কারে বিশ্বাসী, অদৃষ্টবাদী ও প্রচলিত ধর্মবোধে আস্থাশীল। তাঁর মতে, 'বিয়ে হলো তকদিরের কথা। কারো ভালো দুলা জোটে, কারো জোটে না, কেউ স্বাস্থ্য, সম্পদ, সবই পায়, কেউ পায় না।'[২৪] খোদেজার বিবেচনায় তাই বহিপীরের সঙ্গে তাহেরার 'বিয়ে হওয়াটা কোন খারাপ কথা নয়।' 'পীরসাহেবের ঘর পালানো বিবিকে লুকিয়ে রেখে' তিনি ' মুশকিলে পড়তে'ও অনাগ্রহী। কেননা এমন কর্ম ধর্মদ্রোহিতা এবং তাতে 'গুনাহ্গার' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে-ক্ষেত্রে খোদেজা পীরসাহেব ও তাঁর বিবির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে কিছু সওয়াব পেতেই পছন্দ করেন। স্বামীকে খোদেজা সংস্কারের মধ্য দিয়েই পেয়েছেন। হাতেম আলীকে 'হয়রান' দেখালে অমঙ্গল চিন্তা তাঁকে গ্রাস করে। পুত্র হাশেম আলী তাহেরার প্রতি আকৃষ্ট, সহমর্মী ও তাহেরার যন্ত্রণার দায়ভাগী হলেও এ দুর্ভাবনা খোদেজাকে পীড়িত করেছে। বস্তুত, গার্হস্থ্য জীবনপ্রবাহের মধ্যে কল্লোলিত এবং এই জীবন-কাঠামোর স্বচ্ছলতা, সুখ-সমৃদ্ধি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবর্তিত হয়েই খোদেজা উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট।

আধুনিক নাটকে সংলাপ-সৃষ্টি, নাট্যশৈলী-নির্মাণ, অভিনয় কৌশল, বিষয়বস্তু-যোজনা, মঞ্চ-পরিকল্পনা—সর্বত্রই ব্যাপক বৈচিত্র্য এসেছে, অপসৃত হয়েছে, নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধারণা। এ-কালের নাট্যকারেরা এক ধরনের সংস্কারসাধন প্রবণতা-পরিচালিত। ক্রমান্বয়ে নাট্যরস ঘনীভূত হওয়ার প্রথানুগ নীতিতে তাঁদের আস্থা নেই। মানব-জীবনের নৈতিক ও মনোগত সমস্যাকেই তাঁরা ধরতে চান, সচেষ্ট হন মানব-চৈতন্যের স্বাভাবিকতার বিপরীতে গিয়ে ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায়। তাঁদের নাটককে তাই আপাতভাবে মনে হয় উদ্ভট, কার্যকারণহারা ও পারম্পর্যশূন্য।[২৫]

বিশ শতকে নাট্যচর্চা ও নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অভাবিত অগ্রগতি, বিবিধ বৈচিত্র্য সাধিত হলেও পূর্ববাংলার নাট্য রঙ্গমঞ্চে সেই যুগান্তর ও রূপান্তরের আবির্ভাব বিলম্বিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-সহ কতিপয় বিশ্বমনস্ক, আধুনিক ও নিরীক্ষাশীল নাট্যকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রথাসিদ্ধ নাট্য-আঙ্গিকের বিপরীতে গিয়ে ১৯৫৫ পর্যন্ত অর্থাৎ, *বহিপীর*-এর সমকালে এ দেশের উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন মাত্র তিনজন, নূরুল মোমেন (১৯০৮-৯০) আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম ১৯৪১) ও মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)।

আসকার ইবনে শাইখ তাঁর *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫৩) ও *রক্তপদ্ম* (১৩৬৮) নাটকে এবং ত্রয়ী একাংকিকা সংকলন দুরন্ত ঢেউ (১৯৫৪)-এ আঙ্গিকগত বিবেচনায় বাংলা নাটকের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থেকেও সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে সাহসিকভাবে রূপায়িত করেন।[২৬] নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস' (১৯৪৮)-এই একজন এ-দেশীয় নাট্যকার নাট্যসংগঠন-প্রোকৌশল ও মঞ্চ-পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য

নাট্যকৃতিকে সচেতনভাবে অবলম্বন করেছেন।[২৭] মুনীর চৌধুরীর প্রথম 'মৌলিক' ও পূর্ণাঙ্গ নাটক *রক্তাক্ত প্রান্তর* প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। কিন্তু এর পূর্বে রচিত বিবিধ একাঙ্ক নাটকে সমকালীন সমাজ-চাঞ্চল্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা *(কবর, নষ্টছেলে, মানুষ)*, সমাজ ও রাষ্ট্র-মানসের অসংগতি *(ফিটকলাম, মিলিটারী)* ব্যক্তি-মনের আত্যন্তিক বিষয়বুদ্ধির অন্তঃসারশূন্যতা *(বংশধর, দণ্ড, দণ্ডধর, দণ্ডকারণ্য)*–কে উপজীব্য করে পূর্ববাংলার নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও মঞ্চায়ন সম্ভাবনাকে বহুদূর প্রসারিত করেছেন।[২৮]

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের পাঁচ দশকের এক বিরল, নিরীক্ষাপ্রিয় ও মৌলিক নাট্য-প্রতিভা; আর তাঁর বহিপীর বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার নাট্য–সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন, ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প-অভিজ্ঞান।

বহিপীর-এ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথাশ্রয়ী পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠনরীতি অনুসরণ করেননি। একাঙ্ক নাটকের ঐক্য-সংহতি ও সংক্ষিপ্ততাও এ নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায় সময়-বিভাজন ও মঞ্চ–পরিকল্পনায় অনুসৃত নাট্যকারের প্রাতিস্বিক শিল্পব্যক্তিত্ব, তাঁর চেতনার প্রাগ্রসরতা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর*-এর বিস্তার নদীতে ভাসমান একটি বজরার দুটি কামরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর এ নাটকে আশ্রিত সময়ের পরিধি মাত্র বার ঘণ্টা। দুটি অঙ্ক বিভাগ থাকলেও *বহিপীর*-এ কোনো দৃশ্য বিভাজন নেই। সে-অভাব পূরণ করেছে নাট্যকারের বর্ণনা। প্রতিটি চরিত্রকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের পূর্বেই তিনি চরিত্র বিশেষের ব্যক্তিস্বরূপ, মঞ্চে তাদের অবস্থান, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি, মঞ্চে আলো-ছায়ার ব্যবহার পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে রূপায়িত চরিত্রসমূহ তাঁদের সংলাপ উচ্চারণের সঙ্গে মঞ্চে তাদের আত্মপ্রকাশকালীন আচরণও নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী প্রদত্ত এ নির্দেশের কিছু অংশ স্মরণীয়:

> সারা সকাল খোদেজা আর তাহেরা রান্নাবান্নার কাজ করবে। বাইরে যে চাকর-টিকে মশলা পিষতে দেখা যাবে, সে থেকে-থেকে আসবে যাবে এটা সেটা নিয়ে।
>
> পর্দা ওঠার পর হাতেম আলী ও বহিপীরকে আলাপ করতে দেখা যাবে বটে, কিন্তু তার আওয়াজ শোনা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পাশের ঘরে হাশেম আলী ও খোদেজার কথাবার্তা শেষ না হয়। দুই কামরার মধ্যে দরজাটি বন্ধ।[২৯]

পাত্রপাত্রীদের স্বরক্ষেপ, সংলাপ উচ্চারণ-কালীন তাঁদের আচরণ-বিধি সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কখনো প্রথম আবার কখনো তৃতীয় বন্ধনীতে সংলাপ রচনার পাশাপাশি নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত, তাহেরার প্রতি উচ্চারিত বহিপীরের সংলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য:

বহিপীর ।। আসুন, আমরা চলিয়া যাই। ও বিবি।

[তাহেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে পায়চারি করতে-থাকা হাশেমের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে।]

বহিপীর ।। (অপেক্ষা করে) হুঁ।

[তিনি স্বস্থানে আবার ফিরে যান, গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন। ইশারায় হুকুম করলে এবার হকিকুল্লাহ্ তাঁর ঘাড়-পিঠ-বাহু পিটতে থাকে। পাশের ঘরে হাশেম পায়চারি বন্ধ করে হঠাৎ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বেঞ্চির ওপর। মাঝে মাঝে খোদেজা, হাশেম আলাপ করে। সে আওয়াজ শোনা যাবে না।][৩০]

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শুধু নাটকই রচনা করেননি, *বহিপীর*-এ তিনি একই সঙ্গে নাট্যনির্দেশক ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *বহিপীর*-এর সংলাপ নাটকটির চরিত্রসমূহ, পাত্রপাত্রীদের জীবনার্থ, তাদের সংকট ও ব্যক্তি চৈতন্যের স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক। তাহেরা, বহিপীর, হাতেম আলী, হাশেম আলী, খোদেজা এমনকি হকিকুল্লাহ্কে পর্যন্ত আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারি। তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপই তাদেরকে পৃথক, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বরে পরিচিত করেছে।

তাহেরা প্রতিবাদী, জীবনকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে নিরুপায় যন্ত্রণায় অধীর, বেদনাপ্লুত হওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। জীবনের ছন্দপাতনের কারণেই তাঁর সংলাপ তুলনামূলকভাবে উচ্চকণ্ঠের, ব্যক্তি মনের উত্তেজনায় কম্পমান ও তার অন্তর্গত বেদনায় নিষিক্ত :

> না, না, পীরসাহেবের কথা বলবেন না। পীরসাহেবের কথা শুনলেই আমার ভেতরটা এক মুহূর্তে কালো হয়ে যায়। মনে হয়, এখনই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, না হলে একটি মেয়ে অত সহজে ঘর ছেড়ে পালাতে পারে? সেকথা বোঝেন না কেন ?[৩১]

খোদেজা তাহেরাকে তার 'পীর মানুষ স্বামী'-র কাছে ফিরে যেতে বলেছেন। কিন্তু তাহেরা তা চায়নি। ফলে সে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেনি। খোদেজার সংলাপ শেষ হওয়ামাত্রই তাহেরা তার প্রতিবাদ করেছে, জানিয়ে দিয়েছে বহিপীরের প্রতি লালিত তার ক্ষোভ, গভীর অসন্তোষ। তাহেরার সংলাপ তাই প্রকৃতই তাঁর বেদনাময় চৈতন্যের কণ্ঠস্বর, তারই স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত অন্তরের স্বগতভাষণ।

বহিপীর নাটকের প্রধান চরিত্র। দীর্ঘ পরিসর জুড়ে তাঁর উপস্থিতি, নাটকের যবনিকাপাতও বহিপীরের সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়েই। তাঁর নামেই নাটকের নামকরণ। চরিত্র হিসেবে বহিপীর তাই যেমন সুচিত্রিত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সর্বাধিক প্রযত্নসৃষ্ট তেমনি বহিপীরের সংলাপও সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি কথা বলেন সাধুরীতির গদ্যে। নিজের এই ভাষাভঙ্গি অবলম্বনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহিপীর বলেছেন :

> দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একেক ঢঙের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্যস্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কি করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে-সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতে আলাপ আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি, বহির ভাষাই আমার একমাত্র ভাষা।[৩২]

পীর-ফকির-দরবেশরা নিজেদেরকে অতিমাত্রায় ধর্মনিষ্ঠ বলে দাবি ও প্রচার করেন। উৎসের কারণেই ইসলাম ধর্মের চর্চায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার প্রায়শই অনিবার্য হয়ে পড়ে। *লালসালু*-র মজিদের সংলাপেও আরবি-ফারসি শব্দ, কোরান-হাদিসের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ব্যাপক প্রাধান্য পেয়েছে। সে-ক্ষেত্রে 'মুরিদান' (পৃ ৩৯৪, ৩৯৫), 'মোজাহেদ' (পৃ ৩৯৫, ৩৯৮), 'নোসকা' (পৃ ৩৯৭), 'ইসানে গায়েব' (পৃ ৪০৭) প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যতীত *বহিপীরের* সংলাপে আরবি-ফারসি শব্দ, ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার বিরল, চার ও পাঁচ দশকের পূর্ববাংলার সাধু গদ্যরীতিকে স্পর্শ করাই *বহিপীর*-এর ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা।

বস্তুত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *বহিপীর* তাঁর নাট্য- প্রতিভার উন্মেষপর্বের, *লালসালু* পর্যায়ের রচনা। তৎসত্ত্বেও তা একটি ব্যাপক প্রতিশ্রুতিতে প্রোজ্জ্বল, বিষয়ভাবনা, চরিত্র ও সংলাপ নির্মাণ কুশলতা, সাংগঠনিক অন্তর্বয়নের মৌলিকত্বে তা সমকালীন নাট্যধারা থেকে স্বতন্ত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র বিশ্বপ্রসারী জীবনাদর্শ, তাঁর পরবর্তীকালের শিল্প সচেতনতা, তাঁর ব্যাপক ও গভীর অস্তিত্ব-অন্বীক্ষার স্বরূপ ও সত্যার্থও *বহিপীর*-এ খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে, এই উৎস মূল থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কালান্তরে, তাঁর *তরঙ্গভঙ্গ-উজানে মৃত্যু-তে* হয়ে উঠেছেন সেই বিশিষ্ট নাট্যপ্রতিভা যাঁর স্পর্শে আমাদের এই শিল্প-আঙ্গিকটি হয়ে উঠেছে বিশ শতকের বিশ্বনাট্য-নিরীক্ষার সমান্তরাল, সমীপবর্তী ও প্রতিস্পর্ধী।

তরঙ্গভঙ্গ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র দ্বিতীয় নাটক *তরঙ্গভঙ্গ*[৩৩] (১৯৬২) পূর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর, *বহিপীর* (১৯৫৫) থেকে অধিক শিল্পশুদ্ধ, সতর্ক, বাংলা নাটকের সংগঠন জিজ্ঞাসার লৌকিক ধারায় স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক নাট্য-আন্দোলন পরিমার্জিত ও পরিস্নাত। বক্তব্যগত বিবেচনায় *তরঙ্গভঙ্গ* সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র অন্তিম উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)-র সমধর্মী, দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে ব্যক্তির অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু উল্লিখিত সৃষ্টিদ্বয় অভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। 'তরঙ্গভঙ্গ' *কাঁদো নদী কাঁদো*-র অগ্রজ, ছয় বৎসর পূর্বের সৃষ্টি। বলা যায়, *তরঙ্গভঙ্গ*-পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-মানসে যে-জীবনপ্রত্যয়, শিল্পবোধ শিলীভূত হয়েছে, *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে এসে তা উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে পেয়েছে শিল্পিত প্রতিষ্ঠা, স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ।

তরঙ্গভঙ্গ-এর মৌল সংকট আমেনাকে আশ্রয় করেই হয়েছে পল্লবিত ও বিস্তৃত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দুটি। প্রথম অভিযোগ স্বামী হত্যার। আমেনার স্বামী কুতুব শেখ ছিল দরিদ্র, 'মেদমাংসহীন' ও 'রোগাটে শরীরের'। তৎসত্ত্বেও কাজকর্মে তার 'বড় মন'। দুঃসহ দারিদ্র, চরম অভাবের সংসারে একক ব্যক্তির শ্রমে স্বচ্ছলতা-আসা দুষ্কর। এ অবস্থায় মানুষ দীর্ঘায়ু হয় না, প্রায়শই শিকার হয় অকাল মৃত্যুর। কুতুব শেখও একদিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং ক্রমশ 'রোগে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে'। কেননা

তার 'পেটে এক ফোটা ওষুধ' পড়েনি। স্বামীর অসহ্য রোগযন্ত্রণা আমেনাকেও সমান বিদ্ধ করে। কিন্তু সে নিরুপায়, কুতুব শেখের চিকিৎসার সামর্থ্য তার নেই। তাই সে 'ধুতরাপাতার রস বানিয়ে' কুতুব শেখের ' কষ্টের শেষ করে'।

দ্বিতীয় অভিযোগ সন্তান হত্যার। স্বামীর অবর্তমানে সন্তানদের অনাহার সহ্য করতে না-পেরে আমেনা নিজেই উপার্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু তার সে-প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে সে দ্বিতীয় হত্যা সংঘটিত করেছে, আমেনা 'কোলের শিশুটিকে গলাটিপে হত্যা' করেছে।

স্ত্রী হয়ে স্বামী এবং মা হয়ে সন্তান হত্যা সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক অপরাধ এবং তা শাস্তিযোগ্য। আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী তাই বাদি হয়ে আমেনার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ রুজু করেছেন। 'সাক্ষি-সবুদ' প্রস্তুত, বিচারকও বিচারকার্যে নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি তিনি বিধান করতে পারেননি। তার পরিবর্তে দেখা যায়, 'ছাদ থেকে জজের দেহ দড়িতে ঝুলছে।' অর্থাৎ, বিচারক আত্মহত্যা করেছেন।

আমেনার স্বামী ও সন্তান হত্যা, বিচারকের মৃত্যু বলতে গেলে 'নেহাৎই সাধারণ, মামুলি ঘটনা'। কিন্তু সাধারণ থেকে অসাধারণ্যে, বহির্বাস্তবতা থেকে অন্তর্বাস্তবতায় বিচরণই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পী চারিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। আরাধ্য সত্য, ব্যক্তি-সত্তার মূলীভূত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি কখনো তপস্যা-নিমগ্ন, আত্মিক নিরীক্ষায় সদা শ্রম-অকাতর ও বিশ্বপথিক, ব্যক্তির চেতনা থেকে অবচেতনার অন্ধকার প্রদেশে বিচরণশীল, কখনো আবার নিঃসঙ্গ ও যন্ত্রণাময়। *তরঙ্গভঙ্গ*-এর আমেনার হত্যাকান্ড, প্রধানচরিত্র জজের আত্মহত্যা তাই অভিধামুক্ত ব্যঞ্জনা পায়, এ-সবের মাধ্যমে নাট্যকারের জীবনাদর্শই হয় সংকেতায়িত।

বিচারকর্মে নিয়োজিত হয়ে জজ দেখেন যে, আমেনা নয়, প্রকৃত হত্যাকারী অপর দুজন: মিঞার বিবি ও আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী। চার সন্তানের ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে আমেনা 'গিয়েছিলো মিঞাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। কিন্তু মিঞাদের বাড়িতে কাজ নাই। আজও নাই কালও নাই। মিঞার বিবি নাকের নথে ঝট্‌কা দিয়ে বললো, না গো বেটি, তোমার কোলের এইটুকুন বাচ্চা কেঁদে-কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলেমেয়েগুলো ঘরে-বাইরে ছোটাছুটি করে পাগল বানিয়ে দেবে। তুমি তাদের সামলাবে না কাজ করবে।'[৩৪] শেষবারের মতো আমেনা বলেছিল : 'কাজ না দিলে না খেয়ে'যে মারা যাবো ছেলেমেয়ে নিয়ে।'... আজ অন্তত চারটে চাল দিন।'[৩৫] কিন্তু মিঞার বিবির সেই একই উত্তর, স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান: ' অনেক দিয়েছি, কিন্তু দেয়ার একটা সীমা আছে। আর দিতে পারি না। '[৩৬]

উঠোনে বসে মিঞার বিবির কথা, নিজের সন্তান, ভাতে কষ্ট-পাওয়া তার মা-র কথা আমেনা ভাবছিল। হঠাৎ উপস্থিত হন আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী। তিনি বলেন: 'আমেনা, আমি যা-বলি তাই কর।'[৩৭] ' অন্তত একটা সমস্যার সমাধান কর।... ছোটটা এখনো অবুঝ। কিছু বোঝে না, তাই জানবেও না কিছু।'[৩৮] মা হয়ে

সন্তান হত্যার এ প্রস্তাবে আমেনা প্রথমে সম্মত হয়নি। নেওয়ালপুরীই তাকে বুঝিয়েছে: 'তোমার গুনাহ্ হবে, তুমি দোজখে যাবে, কিন্তু তার কষ্টের শেষ হবে।'[৩৯] শেষপর্যন্ত আমেনা নেওয়ালপুরীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

বিচারক হিসেবে অপরাধীকে চিহ্নিত ও তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান জজের পেশাগত, নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে, দ্বন্দ্ব-সংশয় ও পরিণামভীতির রক্তনদী পেরিয়ে অর্থাৎ, দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে অস্তিত্ববান হয়ে উঠতে, মিঞার বিবি ও আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর শাস্তি বিধান করতে তিনি পারেননি, হয়েছেন আত্মঘাতী। আর বিচারকের এই স্বেচ্ছামৃত্যুতে[৪০] তাঁর অস্তিত্বময় জাগরণের প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হলেও গভীরতর বিবেচনায় তা মূলত অস্তিত্ব থেকে পলায়ন। বস্তুত, শর্তবন্দি সমাজব্যবস্থায় বিচারক ন্যায় বিচার প্রদানে ব্যর্থ, অস্তিত্বের দায়ভার বহনে অসমর্থ হয়েই অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্ম বিবেচনায় অস্তিত্ববাদী চিন্তা যেমন মূল প্রতিবাদের সঙ্গে অনিবার্যভাবে প্রসঙ্গবদ্ধ হয়েছে তেমনি তাঁর সৃষ্টির অন্তর্বয়ন, আঙ্গিক-বীক্ষণে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ফর্ম-নিরীক্ষা সমান গুরুত্বে হয়েছে উপস্থাপিত। স্মরণীয়, দার্শনিক নীটশে (Friedrich Nietzsche : 1844-1900) কর্তৃক ' ঈশ্বরের মৃত্যু' (death of god) ঘোষণা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাব-পূর্বকালের ইয়োরোপীয় সমাজের অগ্রগতি, উদারনৈতিক বিশ্বাস, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, মার্কস-কথিত সমাজবিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের অভ্যুদয়, জার্মানিতে রাজনৈতিক নিধন ও গণহত্যা, পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলিসহ যুক্তরাষ্ট্রের ধনবাদী সমাজের আত্মিক শূন্যতাবোধে ও সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে মানুষের সামনে যখন সুখস্বপ্ন, লীব্নীজীয় আশাবাদ (optimism) অপসৃত হয়েছে, তখন সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানবসত্তার রূপাংকনের প্রয়োজনেই হায়েডগার-সার্ত্রে-কামু প্রভাবিত ঔপন্যাসিক-নাট্যকারেরা প্রকাশবাদী ও অ্যাবসার্ড রীতিকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করেছেন।[৪১] সাহিত্যচিন্তায় ইয়োরোপমনস্ক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র *তরঙ্গভঙ্গ*-এর কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র-নির্মাণ এবং ভাষাশৈলীর সৃষ্টিতে প্রকাশবাদী[৪২] নাট্য-লক্ষণের পাশাপাশি অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির [৪৩] আন্তর পরিচর্যাও লক্ষণীয়।

আধুনিক নাট্যকৃতির সূচনায় বিশেষত ইবসেনের প্রতীকী নাট্যকলায় স্টিন্ডবার্গের *Dream Plays* (১৯৫৩)-এ এবং মেটারলিংকের সাবজেকটিভ নাট্যধারায় প্রকাশবাদী আঙ্গিক বিশেষভাবে গৃহীত হয় এবং ১৯২০-এর মধ্যেই তা ইয়োরোপের প্রধান নাট্য আন্দোলনে রূপ পায়।[৪৪] নাটকের উপস্থাপনা ও মঞ্চায়ন-সর্বত্রই প্রকাশবাদী নাট্যকারেরা প্রাচীন, অ্যারিস্টটলীয় আদর্শের পরিবর্তে নিজেদের চৈতন্য, শিল্পধারণাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা অ্যারিস্টটলের অনুকরণতত্ত্বে (imitation of tife) আস্থাহীন বলে নাটকের বাস্তবতাকে ভিন্নভাবে নির্মাণে যত্নশীল আর তা

তাৎক্ষণিকভাবে এই শিল্পরীতির সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির কাছে অবাস্তব, সম্ভব ও অসম্ভবের জগতে সমান সঞ্চরণশীল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁরা জীবনকে বাস্তবে যেভাবে দেখেন নাটকে তা সেভাবেই চিত্রায়িত করতে আগ্রহী। তাঁদের চরিত্রেরা কোনো আদর্শায়িত কিংবা শ্রদ্ধিত ব্যক্তি নন। তারা একই সঙ্গে সংগ্রামী নায়ক ও হাস্যস্পদ ভাঁড়। কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নাট্যিক দ্বন্দ্বের পিরামিড্-সদৃশ্য উর্ধ্বায়ণ ও অবরোহণের ধারণাকেও প্রকাশবাদীরা ভেঙেছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন দর্শকদের আসক্তিহীনভাবে নাটকের ঘটনাস্রোত উপভোগের। তাঁদের নাটকের কাহিনী তাই অবিন্যস্ত, শ্লথবদ্ধ এবং মঞ্চ-পরিকল্পনায় নাট্য-কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের ব্যবধান সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস-জাত। নাটকের সংলাপসৃষ্টিতেও প্রকাশবাদীরা স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী হওয়ায় তাঁদের রচিত সংলাপ কখনোই নাট্যাশ্রিত চরিত্রের জীবনাবেগের রূপকল্প হয় না, তা কখনো ব্যক্তিমনের অসংলগ্ন উচ্চারণ বলে মনে হয়, কখনো তা বোধ হয়, শিশুর কলতান (babble) বলে, আবার কখনও মনে হয় তা কেবলই ব্যক্তির অর্থহীন বাগ্‌বিলাস, তার নিছক বাগ্মিতারই প্রকাশ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ*-এর কাহিনী স্বামী ও সন্তান হত্যার অপরাধে আমেনার বিচারদৃশ্য উন্মোচনের মাধ্যমে। কিন্তু হত্যার ঘটনাদ্বয় এসেছে ফ্লাশ ব্যাকে, ভিখারিণী ও আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর সংলাপের মাধ্যমে। কাহিনীস্রোতে কালগত বিক্ষেপ সৃষ্টি, বর্তমানের সংকট-বর্ণনায় পশ্চাৎমুখি হওয়ার এ প্রবণতা ন্যাচারালিস্ট নাট্যকারেরই স্বভাবজ লক্ষণ। কিন্তু হত্যা-দৃশ্যের বিবরণ উঠে আসায় *তরঙ্গভঙ্গ* ভিন্ন অভিধা পেয়েছে, লাভ করেছে প্রকাশবাদী পরিচয়। স্মরণীয়, ন্যাচারালিস্ট নাটকে অতীত ঘটনার কেবলই উল্লেখ থাকে; আর প্রকাশবাদী নাট্যকারেরা ঘটনাকে তার ঘটমান অবস্থাসহই রূপায়িত করেন।[৪৪] মতলুব আলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত অণুকাহিনী, যুদ্ধের সময় তার অর্থসংগ্রহের ঘটনার অন্তর্বয়ন তাই প্রকাশবাদী রীতির নয়। কেননা তা এই বিশেষ অবস্থানে বদ্ধ শ্রেণীচরিত্রের পরিচয় হয়েও তা কেবলই তথ্য, নাট্যকারের সমাজসচেতনার আলেখ্যই থেকে যায়:

> গতযুদ্ধের গোড়াতে কিছু পয়সা করেছিলাম। আমার প্রাপ্য অবশ্য বিলেই আটকে আছে, বিল পাশ হয় না। একগাদা বিল। সামান্য যা নগদ পেয়েছিলাম তা তিন মেয়ের বিয়েতেই খরচ হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের বিয়ে শান-শওকাতেই দিয়েছিলাম।[৪৬]

তরঙ্গভঙ্গ-এ মোট চারটি মৃত্যু ঘটনা আছে: পূর্বোল্লিখিত আমেনার স্বামী ও সন্তানের মৃত্যু এবং উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আমেনার হত্যা ও জজের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য, মৃত্যুভাবনা প্রকাশবাদী নাটকের একটি লক্ষণীয় প্রবণতা। জার্মান প্রকাশবাদী নাট্যকার রেইনহার্ড জোহান্ সোর্গ (১৮৯২-১৯১৬)-এর *দি বেগার* (১৯১০) নাটকে জনৈক তরুণ কবি তার মা ও বাবাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সেই হত্যার মধ্যে নায়কের কোনো জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় নেই। মাতা-পিতার প্রতি গভীর সহানুভূতিবশত এবং বার্ধক্যের দুঃসহ যন্ত্রণা, স্থবিরতা থেকে তাঁদের মুক্তি দিতে ও

একজন নতুন মানুষ হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারের জন্যই সে এই হত্যাকে নির্বাচন করেছে। অর্থাৎ, রুদ্র বা ভীষণ কিংবা সাধারণ কোনো ঘটনা—যে-রূপেই মৃত্যু আসুক না কেনো প্রকাশবাদী নাটকে তা চরিত্রের পুনর্জন্ম ঘটায়, তাকে পৌঁছে দেয়- অন্য এক সংবেদনার তটভূমে। *তরঙ্গভঙ্গ*-এ আমেনার মৃত্যুও মতলুব আলীকে পুনর্জাত করেছে, অন্তর্গত অভিপ্রায়সহ নাটকে তার আত্মপ্রকাশকে করেছে সুদৃঢ়:

> জজসাহেব, সর্বনাশ হয়ে গেছে। যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সে আর বেঁচে নেই। ... রক্তপাগল জনতার আর্তনাদ শুনছেন ? আমেনাকে খুন করেও তাদের তৃপ্তি হয় নাই।[৪৭]

মতলুব আলীর ঘোষণা জজ চরিত্রকে অনুধাবনেও আমাদের সাহায্য করে। আমরা বুঝি, প্রচলিত সমাজকাঠামোয় অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের জন্য প্রায়ই দায়ী নয়। প্রকৃত অপরাধীকে প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থায় শাস্তি দেওয়া যায় না। এ-অবস্থায় *তরঙ্গভঙ্গ*-র জজের মতো সংবেদনশীল ও মানবিক বোধ জাগরিত বিচারককে প্রত্যাবর্তন করতে হয় মনের আদালতে, স্বপ্নের অন্তর্বিচারালয়ে।[৪৮] বস্তুত, জজের মৃত্যু সময়ের সত্য, প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোরই অনিবার্য পরিণতির ইংগিত, অন্তঃসারশূন্যের কাছে সারবানের পরাভব-চিত্র।

পাদপ্রদীপের অন্ধকার থেকে জজের মৃতদেহ আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী প্রথম তুলে আনলেও বিচারকের এই আত্মবিনষ্টি পূর্বেই, ভিখারিণীর সংলাপে পরোক্ষে উল্লিখিত হয়েছে। জজের প্রতি তারও রয়েছে সুগভীর সহানুভূতি :

> জজসাহেব অন্ধকারের বুকে আশ্রয় নিয়েছেন! তাঁকে এ-লজ্জা আর ছুঁতে পারবে না।[৪৯]

আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর অবস্থানও অপরিবর্তিত থাকেনি। একদা নিজেকেই 'বিচারক, অন্যায়ের শাস্তিদাতা, দুর্নীতি ব্যভিচারের শাসক, শৃঙ্খলতার রক্ষক' বলে ঘোষণা এবং তাঁরই প্ররোচনা ও প্রভাবে স্থানীয় উকিলসম্প্রদায় জজের বিচার-ক্ষমতায় আস্থাহীন হয়ে জজের বিরুদ্ধে অভিযোগলিপি উপস্থাপন করলেও নেওয়ালপুরীর হৃদয় থেকে মানবিক বোধ মুছে যায়নি। পরিস্থিতি, প্রতিবেশ-বিস্মৃত আত্মবিচারণা কালে তিনিও সত্যসন্ধ, স্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী ও জজের প্রতি বৈরিতাবোধ-শূন্য :

> জজসাহেব, আমাদের মতভেদের কারণ যখন দূর হয়েছে তখন আমাদের মন-মিলনের পথে আর বাধা কী ? আসুন মিলজুক করে ফেলি। আমার বন্ধুত্বের প্রমাণ যদি চান তবে এই দেখুন। ... আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি পাঠানো আমি বন্ধ করেছি। আপনার প্রতি বন্ধুত্ব না থাকলে, আপনার মঙ্গল কামনা না করলে বাধা দিতাম কী ?[৫০]

বস্তুত, মতলুব আলী নেওয়াল্পুরী পাশ্চাত্য প্রকাশবাদী নাটকের চরিত্রেরই সমগোত্রীয়, স্টিন্ডবার্গ-কথিত দ্বৈত সত্তার অধিকারী; নিজস্ব অহংবোধে দৃঢ় ও কখনও-কখনও দুর্বিনীত হয়েও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরদুঃখকাতর।[৫১]

তরঙ্গভঙ্গ মূলত আমেনার বিচার-উপাখ্যান; তার শাস্তিবিধানের জন্যই নাটকটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার আমেনার মুখে কোনো সংলাপ দেননি। পূর্বাপর সে নির্বাক ও নিরুচ্চারই থেকে গেছে। ভিখারিণীর মাধ্যমেই আমেনা-প্রসঙ্গ ও আমেনা-চারিত্র হয়েছে উন্মোচিত। 'ভিখারিণী'-র সংজ্ঞার্থের সাথে তার অন্তর্গত ব্যক্তিত্বেরও রয়েছে সামঞ্জস্যহীনতা, গভীর বৈসাদৃশ্য। নাট্যকার গ্রিকে নাটকের কোরাসের ইমেজেই ভিখারিণীকে সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রের এ নবমূল্যায়ন, প্রাচীন ঐতিহ্যকে নব-আঙ্গিকে পরিবেশনের এ-রীতিও প্রকাশবাদী নাটকেরই চরিত্র-লক্ষণ এবং অ্যাবসার্ড নাট্যকর্মেও তা সমান নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে।

বহিপীর-এর মঞ্চ পরিকল্পনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রাতিস্বিক শিল্প-ব্যক্তিত্বের যে-পরিচয় আভাসিত তা *তরঙ্গভঙ্গ*-এও লক্ষণীয়। বরং পূর্বাপেক্ষা তিনি আরো প্রাগ্রসর, আধুনিক এবং এ ক্ষেত্রে সমকালীন বাংলা নাটকের এক অনতিক্রান্ত প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য। *বহিপীর*-এর মতো *তরঙ্গভঙ্গ*-র মাত্র দুটি অঙ্ক। কিন্তু *বহিপীর*-এ দৃশ্যবিভাগ অনুপস্থিত হলেও *তরঙ্গভঙ্গ*-র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের শেষদৃশ্য পরিকল্পনা বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ-সজ্জার বিবরণ দিতে গিয়ে নাট্যকার লিখেছেন :

> [বিচারালয়] মঞ্চের ডান দিকে দুই ফুট উঁচু পাটাতনের ওপর বিচারকের চেয়ার-টেবিল। বিচারকের সামনে ডান দিকে কাঠগড়া। সরাসরি বাঁপাশে বিচারকের কেরানির ছোটখাটো ধরনের টেবিল-চেয়ার এবং পেছনে দুটি পুরাতন ফাইল-নথিপত্রের আলমিরা। বিচারকের সামনে চার সারি বেঞ্চি। পেছনে তিন সারিতে বসে আট জন শ্রোতা। সামনের বেঞ্চিতে চশমাধারী উকিল এবং ফরিয়াদি মৌলবী আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর বসার স্থান। মঞ্চের পেছনের দিকে একজন চাপরাশি এবং দুই জন পুলিশ। মঞ্চের বাঁদিকে দর্শকের কাছাকাছি মাটিতে বসে এক ভিখারিণী। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার। সামনে ভাঙাপাত্র।
>
> কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী আমেনা। গ্রাম্য মেয়ে; বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ; পরনে শাদা শাড়ি। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা। দৃষ্টি অবনত। কাঠগড়া কিছুটা অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাই আসামীর চেহারা দর্শকের কাছে অস্পষ্ট থাকবে।....][৫২]

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যেও সেই একই মঞ্চ, কেবল চাপরাশির এখানে স্থান নেই। কিন্তু গুণগত ও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে অন্যত্র, চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপের। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাষ্য স্মরণীয় :

> বর্তমান দৃশ্যের জজ পদমর্যাদাসচেতন সজ্ঞান ব্যক্তি, গুরুগম্ভীর কিন্তু সতর্ক, এবং নিঃসন্দেহে বিচারালয়ের সর্বাধ্যক্ষ। এক কথায়, সত্যিকার বিচারক। মঞ্চের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল, এবং কারো ব্যবহারে একটুও শিথিলতা নেই।
>
> আবদুস সাত্তার শাদা-শিদা গ্রাম্য মৌলবী। বিচারালয়ের কায়দা-কানুন সে বোঝে না। বিচারকার্য তার কাছে নেহাৎই রহস্যময় ঠেকে বলে জজের প্রতি ভীতি-শ্রদ্ধার অন্ত নাই।[৫৩]

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এতোক্ষণ মঞ্চায়িত নাটকের সবটুকুই ঘটেছে স্বপ্নে, জজের মনোলোকে, অবচেতনায়। স্বপ্ন কোনো ক্রমধারা মানে না। স্বপ্নের জগতে থাকে না কোনো গোপনীয়তা, ছদ্মবেশ ও পরিসীমা।[৫৪] অনুষঙ্গের মাধ্যমেই স্বপ্নের সৃষ্টি। স্বপ্ন কোনো আদর্শ, ভাব কিংবা বক্তব্যেরও বাহন নয়; স্বপ্ন শুধুই প্রকল্প, ইমেজের স্রষ্টা। বাস্তবের চেতনা, দৃশ্যমান ও প্রথাবদ্ধ নীতিনিয়ম-শাসিত জীবনে যা সম্ভব নয়, স্বপ্নানুষঙ্গের মাধ্যমে আধুনিক ঔপন্যাসিক, নাট্যকারেরা সেই রূঢ়, কঠিন ও দুর্মদ সত্যই তুলে ধরেন।

বিশ শতকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অরথ্যাডক্সি, গোঁড়ামিকে বিদ্ধ ও বিদ্রূপের জন্যই প্রকাশবাদী ও অ্যাবসার্ড রীতিপ্রিয় নাট্যকারেরা তাঁদের সৃষ্টিতে সজ্ঞানে ও সমান প্রযত্নে স্বপ্নকে ব্যবহার করেছেন। *তরঙ্গভঙ্গ*-র স্বপ্ন-প্রসঙ্গ সেই একই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তা আমাদের ইয়োনেস্কীয় নাট্যকৃতিকেই[৫৫] স্মরণ করিয়ে দেয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র যুগাতিক্রমী ও সমকালীন বিশ্বনাট্যের আঙ্গিক ও ঐতিহ্য-সচেতনাকেই তুলে ধরে।

তরঙ্গভঙ্গ-এর সংলাপ ন্যাটকটির উৎকর্ষের পরিচয় বহন করলেও তা কখনোই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ-পর্বের অন্বিষ্ট নাট্যরীতির সংলাপ সৃষ্টি-কৌশলের অনুগামী নয়। কেননা, নির্দেশক অব্যয় পরিহার, পদক্রমের বিভঙ্গ ব্যবহার এবং পৌনঃপুনিক বিশেষণ-প্রলম্বিত বাক্যগঠন-প্রবণতা কিংবা বিচ্ছিন্ন ও আপাত সংগতিহীন উক্তির পুঞ্জিত সামবেশ[৫৬] *তরঙ্গভঙ্গ*-র সংলাপে লক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ, বক্তব্যগত দিক থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যিচিন্তাকে আলিঙ্গন করলেও আঙ্গিক নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন সমন্বয়বাদী, স্বাধীন ইচ্ছা–পরিচালিত। বারিশপুরীর সংলাপে 'আঁখু' (পৃ ৪৯৭), 'মিট্টি' (পৃ ৪৯৭), 'পছনত' (পৃ ৪৮০), 'খারাবি' (পৃ ৪৯৭), 'শোস্ত' (পৃ ৪৯৭), 'কথাভি' (পৃ ৪৯৭), 'দরখত' (পৃ ৪৮০) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার তাই কিছুটা কৃত্রিমতার ও ভাষার সচল প্রবাহকে ঈষৎ আড়ষ্ট করলেও কোনো দুরূহতা কিংবা দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করে না। আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি সহজেই উল্লিখিত শব্দসমূহের অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হন। ফলে চরিত্রটিও লাভ করে একটি নিজস্ব পরিচয় ও কণ্ঠস্বর। আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর সংলাপে পুঁথির উল্লেখ সেই একই কারণে অনিবার্যতা পায়, মধ্যযুগের বাংলা রোম্যানসধর্মী কাহিনীকাব্যের জগৎকেই আমাদের সামনে উন্মোচিত করে, ব্যক্তিকে তার বাইরের আবরণ বিসর্জন দিয়ে অকৃত্রিমভাবে ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে জাগরিত ও বিকশিত হতে সাহায্য করে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি স্মরণীয় :

আবদুস সাত্তার। । শোন ভাই, শোন সত্য নারীর সত্য মাতার কাহিনী শোন।
চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দুঃখিনী যখন আপন শিশু হতে বিদায় নিলেন তখন সহসা ···

আসমান হইল আঁধার, বিজলি ছুটিল
নিমেষে সর্বত্র দোজখীভাব, আগুনও ধরিল।

হারাইয়া দৃষ্টিশক্তি দস্যু প্রাণভরে ধাবিল
খোদার কুদরতে সতীনারী সতীত্ব রাখিল।
শ্রোতাগণ। ··· আহা, আহা ···

জজ।। ··· খামোশ-খামোশ। খামোশ হোন সবাই। আখতারীবিবিকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হোক।[৫৭]

আমরা জানি একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দের অভিধামুক্ত ব্যবহার, প্রতিরূপকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষারীতির লক্ষযোগ্য বৈশিষ্ট্য। *তরঙ্গভঙ্গ*-এর আভ্যন্তর পরিচর্যা, সাংগঠনিক অন্তর্বয়নেও নাট্যকারের সেই প্রবণতার পরিচয় মেলে। নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনাতে 'কুকুরছানার অবিশ্রান্ত আর্তনাদ'। শুধু মঞ্চ সজ্জায়, পর্দা-উন্মোচনের পূর্বকালীন আবহ হিসেবে নয়, পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ উচ্চারণকালেও তা বহুবার হয়েছে ব্যবহৃত। এমনকি কুকুরছানার বিকট ও পুনরাবৃত্ত চিৎকার চরিত্রগুলির একাগ্রতা, অন্তর্গত সংবেদনাকেও করেছে বাধাগ্রস্ত :

১ আবদুস সাত্তার।। ···না, জ্বালাতন করে মারলো। কার সাধ্য একটু চোখ বোজে। কী জ্বালাতন। কেউ ওটাকে থামায় না কেন?··· না হদ্দ হয়ে গেলাম। কে আছো?[৫৮]

২ আবদুস সাত্তার।। জজসাহেব, কুকুরছানার চিৎকারে ঘুমটা হলো না ? সাধ্য কী একটু চোখ বুজি। শুনছেন ?

ভিখারিণী।। দোষ এবার কুকুরছানার। ঘুম না আসে-তো কানে তুলো দিলেই হয়।[৫৯]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক তাঁর জীবনচর্যা, অস্তিত্ব-অভীপ্সু জীবন-জিজ্ঞাসারই নান্দনিক ভাষ্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যেমন নিয়ত নিরীক্ষাশীল, নাটকেও তিনি একইভাবে বিশ্বপ্রসারী শিল্পচেতনাসহ উপস্থিত। *বহিপীর*-এর মাধ্যমে তাই যে-নাট্যকৃতির সূচনা *তরঙ্গভঙ্গ*-এ প্রকাশবাদী নাট্যরীতির নির্বাচিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেই পরীক্ষাপ্রবণ ও গতিশীল শিল্পচেতনাই পৌঁছেছে মধ্যপর্বে; আর পরবর্তী নাটক *উজানে মৃত্যু*-তে এই ক্রমধারাই পেয়েছে চূড়ান্ত পরিণতি, প্রত্যাশিত শৈল্পিক সাফল্য ও অনির্বচনীয় সিদ্ধি।

সুড়ঙ্গ

উজানে মৃত্যু-র পূর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি নাটক, তাঁর একটি ব্যতিক্রমী ও পূর্বোক্ত ত্রয়ী নাট্য-রচনা থেকে ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪) প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের ঘোষণা অনুযায়ী *সুড়ঙ্গ* 'কিশোর কিশোরীদের জন্য' রচিত। কিন্তু তাঁর অন্তর্প্রেরণা ছিল আরো বিস্তৃত পরিধিকে স্পর্শ করা। তাঁর কথায় :

> ··· তরুণমনা বয়স্করা—যারা সম্ভব অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি।[৬০]

অর্থাৎ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সুড়ঙ্গ রচনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত, কিশোর উপযোগী একটি নাটক রচনা করা। দ্বিতীয়ত, আত্মমগ্ন ও সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ পাঠককে পরিতৃপ্তি ও পরিতুষ্টি দান করা।

সুড়ঙ্গ-এর কথা বস্তু গড়ে উঠেছে রেজ্জাক সাহেবের কন্যা রাবেয়াকে আশ্রয় করে। রাবেয়ার বয়স পনের-ষোল। রেজ্জাক সাহেব তাই মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছেন। কিন্তু নির্ধারিত তারিখের পূর্বে একটি উপসর্গ দেখা দিয়েছে। রাবেয়া তার ঘরে সারাক্ষণ 'চাদর আবৃত হয়ে' শুয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়াও সে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং নিজের ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না। কন্যার এ অবস্থায় বিচলিত রেজ্জাক সাহেব চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'ডাক্তার বলে' রাবেয়ার 'বুক পেট জিব দাঁত কান সব ভালো।' হেকিম বলে তার 'নাড়ি তেজী ঘোড়ার মতো দিব্য টগবগিয়ে চলছে' রেজ্জাক সাহেব অতঃপর প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছে, বিয়েতে সম্ভবত মেয়ের মত নেই। তাই সে এভাবে তার অসম্মতি প্রকাশ করছে। এক পর্যায়ে রেজ্জাক সাহেব রাবেয়াকে সে-কথা জিজ্ঞাসাও করেছেন :

> বিয়ে এড়াবার জন্য তুই অসুখের ভান করছিস না-তো ? দুলা কি তোর মনোমত নয়? বল্...কথা দিচ্ছি, যদি কোন কারণে বিয়ে করতে না-চাস বা ছেলে মনোমত না-হয়, তবে যে কোনো অজুহাতে—ধর্ তোর এই ভান-করা অসুখের অজুহাতেই বিয়েটা এক্ষুণি ভেঙে দেবো। বল্ মা, বল্! বিয়ে করতে চাস না তুই ?[৬১]

কিন্তু রেজ্জাক সাহেবের সন্দেহে অমূলক। রাবেয়া জানিয়ে দিয়েছে, বিয়েতে তার সম্মতি আছে : 'চাই', 'দুলায় অমত নেই।' রাবেয়ার রোগী সাজার কারণ তাই ভিন্ন এবং তা এক দুর্দমনীয় কৌতুহল, অজানা রহস্য উন্মোচনের অপার আগ্রহ।

রাবেয়ার ঘরের পুরোনো আলমারির নিচে গুপ্তধন আছে। দু-দিন ধরে এক যুবক সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে সেই গুপ্তধন পাওয়ার আশায়। খননের শব্দ রাবেয়াকে অভিভূত ও কৌতূহলী করেছে, একটি চূড়ান্ত সাফল্য প্রত্যক্ষের জন্য সে উৎকর্ণ হয়ে আছে; ঘর, বিছানা ছাড়তে পারেনি। এরই মধ্যে রাবেয়ার চাচাত ভাই কলিম ফকিরের ছদ্মবেশে ও রাবেয়াকে চিকিৎসা করার বাহানায় তার ঘরে প্রবেশ করেছে। নিজের কেরামতি প্রকাশের জন্য তারই ইচ্ছা-অনুসারে রাবেয়ার কাছে তার পরিচয় গোপন থাকেনি। খুন্তি-শাবল দেখে সে বুঝেছে যে, গুপ্তধনের খবর কলিমের জানা আর সে-উদ্দেশ্যেই সে এসেছে। কিন্তু রাবেয়ার তাতে আগ্রহ নেই। সে কেবলই রহস্যের মধ্যে ডুবে থেকে রোমাঞ্চিত হতে চায়। শেষপর্যন্ত সুড়ঙ্গ-পথে কলিম ও যুবক উভয়ই পৌছেছে। কিন্তু গুপ্তধন-প্রাপ্তির ভাগ্য তাদের হয়নি। কেননা সিন্দুক শূন্য।

একজন সমালোচক[৬২] *সুড়ঙ্গ*-কে রূপক নাটক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যুবক ও কলিমই তাঁর অভিমতকে পোষকতা দান করেছে। তাঁর মতে, যুবক ও কলিম উভয়ই রাবেয়াকে চায়, তার ভালোবাসা, কুমারী হৃদয়ের অখণ্ড প্রেম প্রত্যাশা করে। কিন্তু তাদের আত্মনিবেদন, নিজেকে উপস্থাপন করার কৌশল এক নয়। যুবক সুড়ঙ্গ কেটে অর্থাৎ, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের দীর্ঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই রাবেয়ার সামনে

নিজেকে নিবেদন করতে চায়। কিন্তু সেই বিলম্বিত যাত্রায়, সাধনা-সংক্ষুব্ধ সরণি অতিক্রমে কলিম অনাগ্রহী। তার উপস্থিতি তাই আকস্মিক, ছদ্মবেশ-আশ্রয়ী।

দৃশ্যমান, স্পর্শযোগ্য রূপকে সামনে রেখে রূপান্তরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিই রূপক নাটকে নাট্যকারের অন্বিষ্ট।[৬৩] অদৃশ্য কোনো বস্তু কিংবা তত্ত্ব ভাবনাকে '-রূপকের মধ্যে ধরা'-র জন্যই রূপক নাটকের সৃষ্টি। অন্য কথায়, 'রূপক নাটকে অনুভববেদ্য মনোজগতের কথাই বড়—বাস্তব নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত সেখানে প্রকাশিত হলেও অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত, কাব্যিক ব্যঞ্জনাই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে। বহির্জগতের দ্বন্দ্বসংঘাত তখন অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।'[৬৪] কিন্তু যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* (১৯১২) রূপক নাটক সে-অর্থে এডুয়ার্ড এলবির *টিনি এলাইস্* রূপক নাটক নয়। *ডাকঘর* 'প্রাণধর্মের সঙ্গে জড়শক্তি'-র রূপক আর এই 'প্রাণধর্ম উদ্বোধিত হয়েছে প্রকৃতির উদারও মুক্তি পটভূমি থেকে। এই সৌন্দর্যে-র স্পর্শেই কবির অভিপ্রেত ইংগিত এক আশ্চর্য মোহাবরণে ব্যক্ত হয়েছে।' সে-ক্ষেত্রে এলবি *builds a metaphysic while denying man freedom with a social role'.*[৬৫] আর তাঁর *টিনি এলাইস* (১৯৬৩) *offers one of the purest recent embodiments enticing notion that man is born free and enchained by society.*[৬৬] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *সুড়ঙ্গ*-এ নাট্যকারের এ জাতীয় কোনো অতীন্দ্রিয়ের সাধনা কিংবা রূপ থেকে রূপান্তরে উপনীত হওয়ার অভিলাষ লক্ষ করা যায় না। *সুড়ঙ্গ*-এর বক্তব্য সহজ-সিদ্ধ, একেবারেই পার্থিব।

ডাকঘর-এর অমল তার স্বল্প জীবনেও একটি বিকশিত চরিত্র। কিন্তু *সুড়ঙ্গ*-এর রাবেয়া সে-পরিচয়ে বদ্ধ নয়। রাবেয়া অবিকশিত, একটি বিশেষ অনুভূতির আবর্তেই সে বন্দি। গুপ্তধন উদ্ধার-কর্ম প্রত্যক্ষ করে আনন্দিত ও শিহরিত হওয়ার বাইরে তার আর কোনো অনুভূতি নেই। রূপক নাটকে যেভাবে ঘটনা-রূপায়ণে অনিবার্য ও আবেগদীপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়, ভাষায় চিত্রময়তা ও সাংগীতিক ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির মাধ্যমে যেভাবে 'দূরত্বের সত্যতর জগৎ'-কে আভাসিত[৬৭] করা হয় *সুড়ঙ্গ*-এ তা প্রযুক্ত হয়নি। বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *সুড়ঙ্গ* সীমাবদ্ধ অর্থেই রূপক নাটক অভিধা লাভের যোগ্য।

প্রজাতি বিচারে *সুড়ঙ্গ* রূপক নাটকের মর্যাদা হারালেও এর শিল্পগৌরব নিঃশেষিত হয় না। একটু অনুসন্ধিৎসু হলেই আমরা দেখি যে, এ নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বিশ্বমনস্ক নাট্য-প্রতিভাসহই আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। নাটকটির চরিত্রায়ণ প্রক্রিয়া, অন্তর্গত পরিচর্যা ও ভাষাশৈলী নির্মাণই একে দান করেছে শিল্পগৌরব, আর এর স্রষ্টাকে দিয়েছে প্রাতিস্বিক পরিচয়।

সুড়ঙ্গ-এর চরিত্রায়ণ সাফল্যকে ধারণ করে আছে এর চরিত্রসমূহ। আধুনিক নাটকে বিশেষত, অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে চরিত্র দুটি বিশিষ্ট চারিত্রে রূপ লাভ করে। মঞ্চে তাকে আমরা যতটুকু দেখি তার বাইরে, মঞ্চের আড়ালে সেই পরিমাণেই সে উপস্থিত থাকে[৬৮] ; আর এই দ্বৈত রূপেই সে সমগ্র, রূপবান।

সুড়ঙ্গ-এর লক্ষ্য গুপ্তধন হলেও সেই আবহ নির্মিত হয়েছে যুবকের মাধ্যমেই। কিন্তু নাট্যকার তাকে রেখেছেন দৃশ্যের অন্তরালে, পর্দার নেপথ্যে। নাটকের অন্তিম পর্বে আবির্ভূত হলেও তার আত্মপ্রকাশ স্বল্প কালের জন্যই স্থায়ী। রাবেয়া ছাড়া আর কারোর সঙ্গে কথালাপ করতেও তাকে আমরা দেখি না। অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় যুবকের উচ্চারিত সংলাপের দৈর্ঘ্যও স্বল্প, কখনো আবার সে-দৃশ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও একটি সংলাপও উচ্চারণ করেনি, নিজের নিঃশব্দ আচরণের মাধ্যমেই যুবক নিজেকে তুলে ধরেছে :

রাবেয়া।। (একটু অপেক্ষা করে) কী দেখছেন ?

যুবক।। (সভয়ে থমকে) ও! (তারপর গুটি-গুটি আলমারির দিকে সরতে থাকে)।

রাবেয়া।। (ফিক করে হেসে মধুর কণ্ঠে) দু-দিন ধরে আপনার সুড়ঙ্গ কাটা শুনেছি আর ভেবেছি আপনার কথা। আপনি নিশ্চয় কলিম ভাই-এর বন্ধু, যার সঙ্গে গুপ্তধনের লোভে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মানে তাকে নকল নক্শা দিয়ে নিজে আসলটা রেখে দিয়েছেন। ওকি! আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? ভয় পাচ্ছেন আমাকে ? না, আমাকে ভয় করবেন না। আমি কখনো কারো ক্ষতি করি না।

যুবক।। (কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ঢোক গিলে) ঐ, ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি?

রাবেয়া।। পারেন; কিন্তু এই সময়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। আপনার গায়ে-তো আর ফকিরি পোশাকের ছাড়পত্র নেই। বরঞ্চ ঠিক সিঁদকাটা চোরের মতো দেখাচ্ছে আপনাকে। আপনি সুড়ঙ্গেই ফিরে যান।

যুবক।। না। কলিম এই দিক দিয়ে ঢুকতে না পেরে সুড়ঙ্গের ও-মাথা দিয়ে ঢুকতে গেছে। তার মাথায় খুন চড়েছে। সে আমাকে মেরে ফেলবে।

রাবেয়া। (অম্লান হাসি হেসে) ভয় দেখিয়েছে! সুড়ঙ্গের ও-মাথা দিয়ে ঢুকবে, না হাতি করবে। সুড়ঙ্গে, মাটির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে সবাই কী ঢুকতে পারে ? যে-কাটে, সেই আবার ঢুকতে পারে, কারণ সে মাটির অন্ধকারের রহস্য নিজের হাতেই একটু-একটু করে ভেদ করেছে। তার কাছে সে দুর্ভেদ্য অন্ধকার আর ভীতিজনক নয়।

যুবক। কিন্তু ও ঢুকবে। ওর মাথায় খুন চড়েছে যে ?[৬৯]

অর্থাৎ, যুবককে নাট্যকার একই সঙ্গে শব্দ ও নৈঃশব্দের মাধ্যমেই করেছেন জীবন্ত ও প্রাণময়।

নাটক ভাষাশিল্প হলেও ভাষাসর্বস্ব নয়।[৭০] নাটকের বিবিধ উপকরণ, প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভাষা একটি এবং অন্যান্যের তুলনায় সর্বাধিক গুরুত্ববহ। এ-জন্যই নাট্যকার নাটকের সংলাপ-সৃষ্টিতে সবিশেষ যত্নবান হন, পরম অধ্যাবসায়ে নির্মাণ করেন তাঁর আরাধ্য নাট্যরূপ অনুসারে সংলাপ। এ কালে, বিশ্বযুদ্ধ উত্তরপর্বে জীবনাদর্শের মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে নাটকের সংলাপ সৃষ্টিতে গুণগত বৈচিত্র্য এসেছে। নাটকের সংলাপে এখন এসেছে এক ধরনের দার্পণিক স্বচ্ছতা; নাটকের ভাষা এখন হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীদের জীবন-বাস্তবতারই শব্দলেখ। মঞ্চ-উপকরণ,

পাত্র-পাত্রীদের আচরণ ও তাদের উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ, তাদের না-বলা কথা ও শ্রাব্যকল্পের সমবায়েই রচিত হয় আধুনিক নাটকের ভাষা। এ ভাষা তাই কখনো বোধ্য, অতিসহজেই অর্থজ্ঞান সৃষ্টিতে সক্ষম কখনো আবার তা দূরাগত ধ্বনি যা ক্ষণকালের জন্য আমাদের সচকিত করেই হয় নিঃশেষিত। 'কিশোর-কিশোরী'-র জন্য রচিত হয়েছে বলে নয়, *সুড়ঙ্গ*-এর সংলাপে রয়েছে সহজবোধ্যতা, নাট্যকারের সচেতন নিরীক্ষার পরিচয়। *সুড়ঙ্গ*-এর ভাষা অতিপরিচিত শব্দব্যবহার, সরল বাক্যসৃষ্টির, সাধারণ দৃশ্য-যোজনার হলেও এ ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অ্যাবসার্ড উপাদান, সামঞ্জস্যহীন ও আপাত বিচ্ছিন্ন ভাব, অনাত্মীয় এক পরিবেশ :

কলিম।। (চমকে উঠে) কে! ও।

রাবেয়া।। (ফিক্ করে হেসে) তিনটে নয়, চারটে!

কলিম।। (কিছুটা বিরক্তির ভাব করে) কী চারটে ?

রাবেয়া।। দাঁত। পোকা-পড়া দাঁত।

কলিম।। ও। (নক্‌শা পড়ে)।

রাবেয়া।। সেটা বড় কথা নয়। কেন, আমার নানির দশ-দশটা দাঁতে পোকা ছিল, তবু নানা-নানি কখনও ঝগড়া করেননি। আসল কথা, আপনি ফিকিরে ফকির। মানে, ফকিরের সাজ সেজে কিছুর ফিকিরে আছেন।

কলিম। না না, আমি ফকির, মস্ত ফকির। তবে একটু অদ্ভুত ধরনের। তুমি বুঝবে না।

রাবেয়া। আরেক কথা। আব্বার হার্টের আর ব্লাড-প্রেসারের গোলমাল-তো আছেই, চোখেও আছে। শুধু বড়াই করে বলেন যে বাজপাখির মতো তাঁর দৃষ্টি।

কলিম। (আবার মেঝে মাপতে-মাপতে অন্যমনস্কভাবে) কেউ নিজের দোষ স্বীকার করে না।

রাবেয়া। আমি সে-কথা বলছিলাম না। বলছিলাম যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই যদি বাজপাখির মতো চোখা হতো, তাহলে তিনি আপনাকে ঠিক চিনতেন! আমি-তো চিনেছি। সেই হাঁটা, সেই গলা, আর সেই নাকের আওয়াজ।[৭১]

সুড়ঙ্গ-এ এ জাতীয় সংলাপ, আবহের উপস্থিতি খুব বেশি নয়, নির্বাচিত কিছু অংশেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই পরিচর্যাই প্রমাণ করে যে, নাট্যকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সবসময়ই ব্যতিক্রমী হয়ে-ওঠার সাধনা করেছেন, আন্তর্জাতিক নাট্য-পরিধিকে স্পর্শ করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক এষণা, তাঁর প্রাণচঞ্চল সত্তার স্বাভাবিক প্রবণতা। সতর্ক বিবেচনায় তাই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, *সুড়ঙ্গ*-পর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-মানসে একটি নিঃশব্দ প্রস্তুতি চলছিল, দেশীয় পরিধি অতিক্রম করে নিজের সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক নাট্য-চিন্তার সংশ্লেষ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি একান্ত নিজস্ব নাট্যবিশ্ব নির্মাণে তিনি ক্রমশ অভিনিবিষ্ট ও ঐকান্তিক হয়ে উঠছিলেন যার প্রকাশ, প্রাকরণিক সাফল্য, শিল্পপ্রকর্ষ ও শিল্পশুদ্ধতাকে ধারণ করে আছে তাঁর পরবর্তী ও শেষ নাটক *উজানে মৃত্যু।*

উজানে মৃত্যু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু*[৭২] বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক বিরল ও নিঃসঙ্গ সৃষ্টি; অ্যাবসার্ডধর্মী বক্তব্য ও সে-অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ, ব্যক্তির অবচেতনায় স্তরীভূত ভাব-অনুভাবের রূপকল্প সৃষ্টি, শব্দ ও নৈঃশব্দ্য এবং রূপক ও প্রতীকের মেধাবী প্রয়োগ-সাফল্য-উজ্জ্বলিত এক অনতিক্রান্ত নাটক। বলা যায়, *বহিপীর*-এর মাধ্যমে যে-নাট্যযাত্রার সূচনা *তরঙ্গভঙ্গ-সুড়ঙ্গ*-এর মোহনা পেরিয়ে *উজানে মৃত্যু*-তে এসে তা হয়েছে বিশ্বপ্রসারী, সমুদ্রসমর্পিত।

বিশ শতকের মানুষের জীবনে কোনো গল্প নেই। ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে সে নিয়ত একা। গভীর অনিকেত বোধ, অপার শূন্যতা চেতনাকে বহন করেই সে প্রাণ ধারণ করে আছে, ভোগ করে চলেছে তারই পুনরাবৃত্ত জীবনের গ্লানি, দুঃখবোধ ও বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। *উজানে মৃত্যু* এই বিপন্ন মানব-চৈতন্যের কথাবস্তু, তাঁর শুভবোধশূন্য অন্তরানুভূতির কোলাজ। এ নাটকেও তাই কোনো গল্প নেই। কোনো নায়ক চরিত্ররূপেও এখানে কাউকে দাঁড় করানো যায় না। *উজানে মৃত্যু* গল্পহীনদের গল্প, ঘটনাহীনদের বিচূর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের সমাহার, নৌকাবাহক, কালো ও শাদা পোশাক পরিহিতের দুর্ভার জীবনানুভূতির প্রতীতি।

'ধীর-স্থির দয়ালু বউ', তিন ছেলে, বেঁচে থাকার জন্য উর্বর কিছু জমি–সবকিছুই নৌকাবাহকের ছিল। কিন্তু এখন তার জন্য কোনো কিছুই অপেক্ষা করে নেই। সে এখন সর্বরিক্ত, কালের করাল গ্রাসে পতিত, এক পরাজিত ও বেদনাময় সত্তা। দীর্ঘশ্বসিত ও অতিমাত্রায় প্রলম্বিত জীবনের দায়ভার বহনের ক্ষমতাও তার নেই। সে তাই যেতে চায় এমন এক জগতে যা তার জন্য যুগপৎ শান্তির ও স্বস্তির। অভীষ্ট এ গন্তব্যে উপনীত হওয়ার জন্যই তার নৌকা বাওয়া, উজানে যাত্রা। কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি আনন্দকর ও স্বস্তিদায়ক স্থানের সন্ধান কখনোই মেলে না। নৌকাবাহকের যাত্রা সে-অর্থে অনন্তের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, স্বনির্বাচিত মৃত্যুকে আহ্বান জানানোর জন্যই নৌকাবাহকের দাঁড়টানা। বস্তুত, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা যখন মানুষকে বিপর্যস্ত, ক্রমশ নিরস্তিত্ব ও নিমজ্জিত করে তখন বহমান সমাজচৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে অস্তিত্ব ঘোষণা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় অস্তিত্বকামী মানুষ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। ফলে তাকে যাত্রা করতে হয় সমাজ-স্রোতের বিরুদ্ধে, উজানে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *লালসালু*-র জমিলা, *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলী, *কাঁদো নদী কাঁদো*-র খতিব মিঞা, *বহিপীর*-এর হাশেম আলী এ অর্থেই উজানের যাত্রী।

জীবনের গতি মৃত্যুর দিকে ধাবিত হলেও সাধারণ ও লৌকিক সুস্থতা বোধের কোনো মানুষ কখনোই মৃত্যুর অভিলাষী হয় না। জীবনের সমার্থক হিসেবে, বেঁচে থাকার আনন্দে সমান্তরাল বলে মৃত্যুকে সেই ব্যক্তিই সহজে ও সোৎসাহে গ্রহণ করতে

পারেন যার জীবনার্থের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মৃত্যুবীজ, গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো যে সর্বদা বহন করে চলেছে তারই পতনের বৈনাশিক উপাদান। বস্তুত, মৃত্যু একটি জীবনদর্শন, ব্যক্তির পরম প্রত্যয়। তাই মৃত্যু কখনোই ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ করে না। মৃত্যু ব্যক্তির অস্তিত্ব-অনুভবের অবভাস; বর্তমান জীবনকে অনুপুঙ্খভাবে তার উপলব্ধিরই উপায়।[৭৩] নৌকা বাহকের পরিণতির জন্যও কেউ দায়ী নয়। নিজের সত্তার মধ্যেই লালন করেছে এক বৈনাশিক শক্তি, উইলিয়ম আই অলিভার-কথিত self-defeating complex[৭৪] অন্তরের শুদ্ধ চৈতন্য দিয়ে সে জেনেছে যে, তাকে 'কোথাও-না-কোথাও যেতে'-ই হবে, হয়ে উঠতে হবে অথেনটিক বিং। এ-জন্যেই সে উপভৌগিক জীবনাকাঙ্ক্ষা, গৃহী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় থেকে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন, অন্ধকারপ্রিয়, উৎকেন্দ্রিক ও পুনর্জাগরিত :

> অবশ্য ঘরেই থাকতে পারতাম। শান্ত-শিষ্ট একটি মেয়েকে আবার বিয়ে করতে পারতাম। তারপর অনেক ছেলেমেয়ে হতো। কিন্তু ওসব কিছু করিনি। তাতে কেবল পুনরাবৃত্তি হতো, এবং পুনরাবৃত্তির মতো সোজা জিনিস আর কিছু নাই। তাছাড়া জাঁক-জাঁকালো করে পুনরাবৃত্তি করলে তেমন নিদারুণ শোক-দুঃখও ডোবানো যায়। কিন্তু তবু আমি বেরিয়ে পড়ি। কারণ কেমন মনে হয়েছিলো, সেখানে কোথাও যেন ভুল আছে, কোথায় একটা ফাটল আছে, ...।[৭৫]

শাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি নৌকাবাহকের সহযাত্রী ও বাল্যবন্ধু। তার প্রতিক্রিয়াও নৌকাবাহকের অনুরূপ। তার মতে, নৌকাবাহক যে-যাত্রা শুরু করেছে তা অব্যাহত রাখা, নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানোই তার কর্তব্য। এভাবে, স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমেই সে হবে পুনর্জাত, প্রতিস্থাপন করতে পারবে তার অস্তিত্বময় সত্তাকে।

কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তির অনুভূতি ও জীবনপ্রত্যয় শাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। প্রথাবদ্ধ ও নিরস্তিত্বময় জীবনস্রোতে সমর্পিত হতেই সে অভ্যস্ত। তাই সারারাত নৌকা টেনে নৌকাবাহকের না-হলেও তার হয়েছে 'কাহিল অবস্থা।' নৌকাবাহকের উজানে যাত্রাকে সে ভয় পায়। বস্তুত, নরম্যান ফ্রেডরিক সিমসনের[৭৬] *অন ওয়ে পেনডুলাম* নাটকের মতোই *উজানে মৃত্যু*-র কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজবাস্তবতা, অনিশ্চয়তা-ভীতিতাড়িত ও নিমজ্জিত অস্তিত্ব মানুষের সত্তাস্বরূপ, তার সমাজ-অভ্যাসই আভাসিত হয়েছে।

আমাদের সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস-উন্মুখ হলে আমরা ক্রমশ পতিত হচ্ছি। এই চেতনা থেকে অ্যাবসার্ডের জন্ম বলে এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। অ্যাবসার্ডবাদীদের দ্বারা গৃহীত ও চর্চিত শিল্পপ্রকরণ, প্রক্রিয়াই এই নান্দনিক রীতির বৈশিষ্ট্য। সমগ্র জীবন ও সমাজসমস্যাকে আশ্রয় করা হয় বলে এ শিল্পচেতনার পরিধিও বহুবিস্তৃত। সমগ্র মানব অস্তিত্বই অ্যাবসার্ড জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রসঙ্গবদ্ধ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড রীতির প্রতি অনুরক্ত হলেও ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠ নন। বলা যায়, ইয়োরোপীয় সমাজসচেতনতা ও স্বদেশীয় সমাজকাঠামোর মধ্যে সমন্বয়, সংশ্লেষ

সাধন, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *উজানে মৃত্যু*-র অ্যাবসার্ড জগৎ।

বেকেট (১৯০৬-৮৯)-এলবি (জন্ম ১৯২৮)-র মতোই *উজানে মৃত্যু*-র চরিত্রদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো নাম দেননি। পূর্বসুরিদের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যানুসারেই তিনি তাঁর চরিত্রদের কোনো পরিচয় উদ্ধৃত করেননি, নৌকাবাহক, শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তি, কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি-পরিচয়েই তারা নাটকে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মোন্মোচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পূর্বসাদৃশ্য লক্ষণীয় নয়। শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তির মাধ্যমেই কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তির অন্তর্গত স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে আর তাদের যৌথ সংলাপের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়েছে নৌকাবাহকের জীবনার্থ :

কালোপোশাক
পরিহিত ব্যক্তি।। মেঘ যে কালো হয়ে আসছে আর শীতল হাওয়া যে ছুটেছে—সে-সব না দেখার ভান করছে আমার বন্ধু। কিন্তু সব কিছুই যে স্বাভাবিক সে-কথা প্রমাণ করবার জন্যে সে জ্বলন্ত সত্যকে অস্বীকার করতে প্রস্তুত। আপনাকে বলেছি না যে, নদীতীর অদৃশ্য হয়ে গেলেও কল্পনার নতুন একটি নদীতীর সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার আছে। সহস্রবার ধ্বংস হয়ে গেলেও তার জন্যে সে নদীতীর অবিনশ্বর।

শাদাপোশাক
পরিহিত ব্যক্তি।। (হতাশ হয়ে, আপন মনে) কি করি, কি করি এখন ?

কালোপোশাক
পরিহিত ব্যক্তি।। একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সে নৌকা ত্যাগ করবে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরে যাবে কিন্তু নিজের জগৎকে ধ্বংস করবে না।[৭৭]

উজানে মৃত্যু-র সংলাপ কার্যকারণহীন, বিষম কালচেতনার মধ্য দিয়ে বহমান চরিত্রসমূহের চেতনাপ্রবাহের ভাষ্য; তাদেরই কথামালার সমষ্টি। ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সন্ধান দেয় না :

নৌকাবাহক।। বুঝতে পেরেছি। সেও ঐ বাঁশবিদ্ধ মানুষের মতো। তিন-দিন তিন-রাত তার চারধারে দাঁড়িয়ে তার আত্মীয়-স্বজনরা কেঁদেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছিলো সব কিছুই অতি সাধারণ, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। সে যদি কোথাও যাচ্ছিলো, তা সে তার আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থেই যাচ্ছিলো। বড় শান্তিতেই তার মৃত্যু হয়।

কালোপোশাক
পরিহিত ব্যক্তি।। অন্য মানুষটাও শান্তিতে ডুবে মরেছিলো, কারণ, প্রতিবারই কোনো প্রকারে মাথা তুলতে পেরে যা সে দেখেছিলো তা সে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারে নাই। পানির অন্ধকারেও সে-দৃশ্য জ্বলজ্যান্ত থাকে। এবং কিছুই তার কাছে অসাধারণ মনে হয় নাই। আপন্যর বন্ধুও তেমনি। সবই তাঁর কাছে অতিশয় স্বাভাবিক। তাই আপনার ব্যবহার তাঁর কাছে একটু বেখাপ্পা ঠেকছে।

নৌকাবাহক।। কিন্তু সে আমার সুবন্ধু, তার হৃদয়ও বড় কোমল। বস্তুত সে আমার সঙ্গে আছে বলে আমার ভালোই লাগছে। তাছাড়া একাকী নৌকাটি টানতে

পারতাম না। মানুষ যতোই বলবান হোক,এমন কাজ একাকী করা সম্ভব নয়।

কালোপোশাক
পরিহিত ব্যক্তি।। সে আপনাকে সাহায্য করবে বৈ কি। ভয়ানক ভূমিকম্পে নদীতীর অদৃশ্য হয়ে গেলেও সে আপনাকে সাহায্য করবে, কাল্পনিক নদীতীর দিয়ে আপনার জন্য হাল ধরবে। তার জন্য নদীতীর অদৃশ্য হওয়া কখনো সম্ভব নয়। বলবো আপনার দয়ালু সুবন্ধুটি আসলে কী ?[৭৮]

উজানে মৃত্যু-তে অ্যাবসার্ডবাদীদের মতো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মঞ্চ সচেতনার পরিচয় আছে কিন্তু কোনো কষ্ট কল্পনার স্থান নেই। লৌকিক পরিবেশকে ব্যবহার, পরিচিত দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর মঞ্চ সাজিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সজ্জিত মঞ্চ সে-বাস্তবতার সৃষ্টি ছাড়াও লোকাতীত, সাধারণ-ঊর্ধ্ব এক মনোবাস্তবতারই জন্ম দিয়েছে। বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মঞ্চসজ্জা ন্যাচারালিস্ট রীতিশাসিত নয়, তা একান্তভাবেই অ্যাবসার্ডিস্ট পদ্ধতি-বিন্যস্ত। তাঁর *উজানে মৃত্যু*-র প্রকৃত মঞ্চ বাইরে নয়, দর্শক-পাঠকের অন্তরে, তাদের মেধা ও অনুভূতিলোকেই এর অবস্থান :

[উজ্জ্বল জোৎস্নাউদ্ভাসিত-মঞ্চ শূন্য এবং নিস্তব্ধ। শীঘ্র নেপথ্যে একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজটি ক্রমশ উচ্চ হয়ে ওঠে। এবার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। দিনাগমন শুরু হয়েছে। কিন্তু দৃশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। তারপর বাঁ দিক থেকে আবছায়ার মধ্যে দিয়ে একটি মানুষ মঞ্চে প্রবেশ করে। তার পরনে কাছামারা লুঙি; তাছাড়া সম্পূর্ণ দেহ উলঙ্গ। সে দড়ি দিয়ে নৌকা টানে। নৌকাটি দেখা না-গেলেও একটি মানুষের জন্যে যে সেটি অতিশয় ভারি এবং সেটি যে লোকটি অনেকক্ষণ ধরে টানছে, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

নৌকাবাহক মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছলে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবার দেখা যায় নদীতীর, মেঘশূন্য আকাশ, বিপরীত তীরের ক্ষীণরেখা এবং সেখানে একটা ছোট গ্রামের সামান্য আভাস।

লোকটি এবার থামে। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবেই এধার-ওধার তাকিয়ে দেখে। তারপর দূরে কোথাও একটি উড়ন্ত পাখির ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। পাখিটিকে সে মনোযোগ দিয়ে দেখে।][৭৯]

এ–মঞ্চে আছে অন্ধকার, শূন্যতা ও 'একটি মানুষের হাঁপানির আওয়াজ।' এই আলোকহীনতা কখনোই দূর হয়নি, চরিত্রের অবচেতনায় স্তরীভূত হয়ে বারবার তা ফিরে এসেছে :

১ [গানের শব্দ মিলিয়ে যায় এবং ডান দিক দিয়ে নৌকাবাহক বেরিয়ে যায়। তারপর মঞ্চ অন্ধকার হয়। অল্পক্ষণব্যাপী নীরবতার পর নৌকাবাহকের হাঁপানির আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমে আস্তে, ঢিমাতালে। ক্রমশ সে-আওয়াজ জোরালো এবং দ্রুত হয়ে ওঠে।][৮০]

২ [মঞ্চ আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ঝড়ের এবং নৌকাবাহকের শব্দ কতক্ষণ চলে। তারপর ঝড়ের শব্দ থেমে যায়।

আবার আলো; আবার নৌকাবাহক এবং কালোপোশাক পরিহিত ব্যক্তি বাঁ দিক দিয়ে মঞ্চে ঢোকে। নৌকাবাহকের অবস্থা বিশেষ কাহিল মনে হয়।][৮১]

হাঁপানির আওয়াজ কখনো থামেনি, পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে তা লাভ করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। এ-আওয়াজ কেবলই নৌকাবাহকের বেদনাপ্রকাশক ধ্বনি নয়; সভ্যতার, ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যূপবিদ্ধ মানুষের অবরুদ্ধ যন্ত্রণারও তা অভিব্যক্তি। বস্তুত, অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য, কালো রঙের ব্যবহার ও হাঁপানির শ্রাব্যকল্পই *উজানে মৃত্যু*-র পরিবেশকে করেছে ঘনীভূত, বেদনানীল আর নাটকটিকে দান করেছে অ্যাবসার্ড চারিত্র।

মোটকথা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যপ্রতিভা একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মঞ্চ-পরিকল্পনার বৈচিত্র্য এবং স্বদেশীয় সমাজ-কাঠামোর অন্তরালে আধুনিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপন সত্ত্বেও *বহিপীর*-এ তিনি ছিলেন মূলত ন্যাচারালিস্ট। *তরঙ্গভঙ্গ*-এ সেই একই জীবনবোধে প্রত্যয়দৃঢ় হয়ে নাট্যকার হিসেবে তিনি এক্‌সপ্রেশনিস্ট। *উজানে মৃত্যু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পূর্বাপেক্ষা আরো প্রাগ্রসর, বৈশ্বিক নাট্যকৃতিসচেতন, অ্যাবসার্ডিস্ট।

তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ৬৩
২ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২, পৃ ৪০০
৩ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১১
৪ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২২-২৩
৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৪
৬ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯১
৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৬
৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৫
৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৫
১০ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৬
১১ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১০
১২ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৭
১৩ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২, পৃ ৪৩০
১৪ (ক) *Jean-Paul Sartre* : First English edn. 1948 Reprinted 1970, Existentialism and Humanism, London : Methuen & Co. Ltd. P 30
(খ) সঞ্জীব ঘোষ; মার্চ ১৯৮৪, *জাঁ-পল সার্ত্র: জীবন ও দর্শন*, কলকাতা: রত্নাবলী, পৃ ৫৭
১৫ সঞ্জীব ঘোষ, জানুয়ারি ১৯৯০, *অস্তিবাদ গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ*, কলকাতা: রত্নাবলী, পৃ ২৩
১৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২, পৃ ৪২৮
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৬
১৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৪০৭
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২২
২০ প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৬
২১ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩১
২২ সৈয়দ আকরম হোসেন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, পৃ ৮০

২৩ আবুল কাশেম চৌধুরী : আশ্বিন ১৩৬৮. *পূর্বমেঘ* (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত), রাজশাহী, পৃ ১৬৭
২৪ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২ , পৃ ৩৯২
২৫ Alvin B. Kernan : 1967, The Attempted Dance : A Discussion of the Modern Theater : The Modern American Theater (Alvin B. Kernan edited). Englewood Cliffs. Nj : Prentic-Hall, Inc : P 17
২৬ দ্রষ্টব্য : মুহম্মদ মজিরউদ্দিন ; সেপ্টেম্বর ১৯৭০, *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা,* নওগাঁ (রাজশাহী) : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃ ৪৯৮-৫৬
২৭ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ ; আষাঢ় ১৩৯৮, বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী; সাহিত্য পত্রিকা (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), ৩০ : ৩, বাংলা বিভাগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ১৬০-৭০
২৮ দ্রষ্টব্য : (ক) আনিসুজ্জামান ; ডিসেম্বর ১৯৭৫, *মুনীর চৌধুরী,* ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ ৪৬-৫৫
(খ) আবু হেনা মোস্তফা কামাল ; মার্চ ১৯৮১, *কথা ও কবিতা,* ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ ৯৬-১০৩
২৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২, পৃ ৩৯১
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ ৪২০
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯৪
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪৯
৩৩ ১৯৬১-৬২ সালে রচিত *তরঙ্গভঙ্গ* প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮ ও বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ সংখ্যা *সংলাপ* পত্রিকায়।
৩৪-৩৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২ , পৃ ৪৫৮
৩৮-৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯
৪০ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ; ১৯৭৬, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮৯. *সাহিত্য-বিবেক,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২৫২
৪১ Martin Esslin : 1956, Introduction : *Absurd Drama,* England : Penguin Books. p 03
৪২ দ্রষ্টব্য : বেগম আকতার কামাল ; *তরঙ্গভঙ্গ* : একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক, *সাহিত্য পত্রিকা* (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত), ২৬ : ১, শীত ১৩৮৯, পৃ ৩৬-৪৩
৪৩ দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ; এপ্রিল ১৯৯১, *বাংলাদেশের সাহিত্য,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ ৮২-৯০
৪৪ Alvin B. Kernan; Introduction : *The Modern American Theatre,* Ibid, p 26
৪৫ Martin Esslin; 1976, Modernist Drama : Wedkind to Brecht ; *Modernism*, Ibid, p 532
৪৬ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২ , পৃ ৪৫৫
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৭
৪৮ *তরঙ্গভঙ্গ*-এর বিচারকের মনো-আদালতের সঙ্গে ফ্রানৎস কাফকার-র *The Trial* উপন্যাসের জোসেফ কে.-এর বিচারের একটি আপাত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।
দ্রষ্টব্য : The Colected Novels of Franz Kafka, Ibid. p. 157-68

৪৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২ . পৃ ৪৯০
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯-৯০
৫৪ *The Discovery of Drama,* p 519
৫৫ Martin Esslin : Introduction : *Absurd Drama,* Ibid, p 10
৫৬ Martin Esslin : Modernist Drama : Wedekind to Brecht, *Modernism,* Ibid. p 543
৫৭ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২. পৃ ৪৪৬
৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৬-৬৭
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬৮
৬০ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২ , পৃ ৪৯৭
৬১ প্রাগুক্ত, পৃ ৫০২
৬২ মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন; মার্চ ১৯৯০, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র নাটক, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ ৩২
৬৩ *A Dictionary of Literary Terms.* Ibid, p 25
৬৪ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত ; নভেম্বর ১৯৮২, *বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ-প্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা : বর্ণালী, পৃ ১৬৬
৬৫-৬৬ Lee Baxandall ; The Theater of Edward Albee : *The Modern American Theater.* Ibid, p 96
৬৭ *বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ-প্রসঙ্গ,* পৃ ১৬৭
৬৮ পবিত্র সরকার; ১৩৮৮ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৭, *নাটমঞ্চ ও নাট্যরূপ,* কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, পৃ ৩৬৩
৬৯ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২, পৃ ৫১০
৭০ *নাট্যমঞ্চ ও নাট্যরূপ,* পৃ ১৭৭
৭১ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী*–২, পৃ ৫০৫-০৬
৭২ *উজানে মৃত্যু* সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ (৬ বর্ষ: ১০ম সংখ্যা, পৃ ৭২০-৩৭) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।
৭৩ ... death does not remain simple ; it becomes mine. By being interiorized it is individualized. Death is no longer the great unknowable which limits the human; it is phenomenon of my personal life which maker of this life a unique life—that is, a life which does not begin again, a life in which one never recovers his stroke. Hence become responsible for my death as for my life,—Jean-Paul Sartre; *Being and Nothingness,*Ibi p 532
৭৪ William I. Oliver ; October 1970 : Between Absurdists and the playwright : *Literary Types and Themes,* New York : Holt, Renchart and Winston. Inc., p 229
৭৫ *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্–রচনাবলী*–২ , পৃ ৫৩৩
৭৬ দ্রষ্টব্য : Martin Esslin ; 1968, *The Theatre of the Absurd,* London : penguin Books, P 300
৭৭ *সৈয়দ ওয়ালীউল্ল ্হ্-রচনাবলী*–২, পৃ ৫৩০
৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৬
৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ ৫২১
৮০ প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৭
৮১ প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩১

উপসংহার

গভীর স্বজাতি নিষ্ঠা, এ-দেশীয় সমাজসংগঠন ও সমাজবিকাশ সম্পর্কিত অখণ্ড ধারণা, অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা-সূত্রে অর্জিত পাশ্চাত্য-সমাজবোধ এবং ধনবাদী সমাজ-শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের নৈঃসঙ্গ্য, শূন্যতা ও যন্ত্রণাকে আত্মস্থকরণ ও প্রকাশবৈচিত্র্যের মাঝেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাণচঞ্চল শিল্পিসত্তার মৌল পরিচয়। পারিবারিক বৃত্তে নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের ফলে তিনি স্বদেশের মৃত্তিকামূলে স্বাভাবিকভাবে শিকড়সঞ্চারী হতে পারেননি। উত্তর-যৌবনে চাকরি-সূত্রে স্বদেশ ও স্বজন থেকে বিযুক্ত হয়ে প্রবাসে অবস্থানের ফলে তাঁর শূন্যতাবোধ হয়েছে আরো গভীর ও প্রগাঢ়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সৃষ্টিকর্মে যে-সব অনিকেত চরিত্রের সন্ধান মেলে তাদের সেই বিচ্ছিন্ন চেতনার উৎস তাঁর জীবন-বাস্তবতা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র মতে, মানুষ মূলত বিচ্ছিন্ন এবং শিল্পবিপ্লব ও মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে মানুষের এই কেন্দ্রবিমুখি অনুভূতি হয়েছে আরো প্রবল। কিন্তু নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যে তিনি সার্থকতা খোঁজেননি। সমাজের জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ প্রতিনিধি হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁর শিল্পী-চৈতন্যের সার্থকতা। ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শন তাঁর এই স্বাতিক্রমণ প্রচেষ্টাকে দিয়েছে তাত্ত্বিক এক স্বতন্ত্র প্রেরণা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সৃষ্টিজগতের তিন উজ্জ্বল এলাকা তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। অন্য কথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রথমে গল্পকার, মধ্যপর্বে ঔপন্যাসিক এবং অন্তিম পর্যায়ে নাট্যকার।

প্রাক-*নয়নচারা* পর্ব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভার প্রস্তুতিকাল। এ-পর্যায়ের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি মূলত গ্রাম, গ্রামীণ প্রকৃতি ও কর্মচঞ্চল মানুষ। নাগরিক পরিবেশ থাকলেও তা মুখ্যত গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু সংস্করণ, ছোট মফস্বলীয় শহর। তাঁর এ-পর্বের পাত্র-পাত্রীরা বিষণ্ন আত্মমগ্ন ও নিঃসঙ্গ। কিন্তু তারা সমকালীন কথাসাহিত্যের লিবিডো চেতনাক্রান্ত ও জৈব-সম্পর্কের পঙ্ক-পল্বলে নিমজ্জিত মানব-মানবীর উত্তরাধিকার নয়। তারা একাকিত্ব বোধে বিপন্ন, অনিকেত চেতনায় আক্রান্ত হয়েও মার্জিত, রুচিবান ও সংস্কৃতিমনস্ক। এ-পর্যায়ের গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পরীক্ষাপ্রবণ বৈচিত্র্যসন্ধানী, সমকাল-অনুগত ও নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে যত্নশীল। তাঁর গল্পের প্লট-গ্রন্থন স্বতঃস্ফূর্ত চরিত্রচেতনাবাহী। ঘটনা ও চরিত্রের পরস্পর নির্ভরশীল সহ-অবস্থানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পের তৃতীয় প্রতীতি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র এ-পর্বের গদ্যশৈলী প্রতিশ্রুতি-চিহ্নিত, অন্তর্গত সংবেদনশীল অনুভবী প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত, চিত্র ও চিত্রকল্পময় এবং প্রতীকী ভাবব্যঞ্জনায় অভিধামুক্ত।

নয়নচারা-তেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ছোটগাল্পিক সত্তা স্পষ্ট ও স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত। এ-পর্বে তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রমানসের ঘটনাবর্তে আলোড়িত

এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত জীবনজিজ্ঞাসা রূপায়ণে আন্তরিক ও সনিষ্ঠ। দৃষ্টিকোণের সুষম ব্যবহার, প্রেক্ষণবিন্দুর অনিবার্য প্রয়োগ, চরিত্রায়ণ-প্রক্রিয়ায় ব্যাপক গুরুত্ব দান এবং ব্যক্তিকে তার চেতন ও অবচেতন সত্তা, মৌল এষণাসহ উপস্থাপন-বৈচিত্র্যে এ-পর্বের গল্পগুলি পূর্ববর্তী গল্পসমূহের তুলনায় অর্থবহ ও শিল্পসমৃদ্ধ। *নয়নচারা*-র ভাষা চিত্রকলার প্রকরণ-পরিচর্চিত ও আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহারে স্নিগ্ধোজ্জ্বল ও বাস্তবানুগ।

দুইতীর পর্যায়ের গল্পগুলির অন্তর্বয়ন ও সংগঠনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সতর্ক, যত্নশীল, পরীক্ষাপ্রবণ ও প্রাগ্রসর। এ-পর্বের গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই বিবিধ বিচ্ছিন্নতা চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ার গল্পের আভ্যন্তর পরিচর্যায় এসেছে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য এবং স্বতন্ত্র রীতিবৈশিষ্ট্য। গল্পের অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীদের জীবনাভিজ্ঞতা এবং তাদের জীবনার্থ প্রকাশের জন্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও চিত্রকল্পময় অনুষঙ্গ-ইমেজ-রূপকে পরিচর্চিত করেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *দুইতীর*-এর ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন।

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস *লালসালু* অবক্ষয়িত সমাজের আলেখ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে উল্লিখিত ও আলোচিত। মুখ্য চরিত্র, অনিকেত ও উন্মূলিত সত্তা মজিদের মহব্বতনগরে আগমন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ জাতীয় আপাত সরল বক্তব্যের সমর্থনও মেলে। কিন্তু এই উপরিস্তরের সত্য প্রতিষ্ঠাই কেবল *লালসালু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লক্ষ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট সমাজকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির হয়ে-ওঠার প্রকরণ, তার সামগ্রিক জীবনপাট্যার্নের আলোকে মজিদ-চরিত্র সৃষ্টিই ছিল তাঁর শৈল্পিক প্রেরণা। মজিদ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, সে মূলত বাংলাদেশের সমাজ-প্রতিনিধি, নির্দিষ্ট সময়েরই প্রতিভূ। অসমভাবে বিকশিত সমাজ-ব্যবস্থাই মজিদ-রূপ বিষবৃক্ষের জন্ম দেয়।

লালসালু-তে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার মেহেদি-রঞ্জিত পদপাত ভিন্ন সত্যের ইংগিতবহ, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যময়। জমিলার আচরণ সাধারণ, বিপন্ন-অস্তিত্ব ও নির্জীত মানুষদের ধর্ম, সমাজ ও পরিণামভীতিশূন্য হয়ে জাগরিত হওয়ার ও সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে মজিদ-বৃক্ষ উৎপাটন করারই দার্শনিক প্রত্যয়, অনিবার্য সূত্র।

লালসালু-র ঘটনাবিন্যাস বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ও সাধারণভাবে অনুসৃত পদ্ধতি-অনুসারী অর্থাৎ, আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত হলেও এর প্লট-বিন্যাসরীতির গভীরে আশ্রিত হয়েছে একটি মেধাবী অন্তর্বুনন, দৃষ্টিকোণের সুষম ব্যবহার ও শিল্পমার্জিত পরিচর্যা-কৌশল। *লালসালু*-মূলত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। কিন্তু এর ঘটনা ও জীবনকে শিল্পায়তনিক প্রতিষ্ঠা দান করতে সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের সাথে প্রযুক্ত হয়েছে কখনো মজিদের, কখনো তাহের-কাদের, হাঁসুনির মা-র আবার কখনো জমিলার প্রেক্ষণবিন্দু, বিচিত্র রীতি-পদ্ধতির আভ্যন্তরিক পরিচর্যা।

লালসালু-র ভাষা এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রসমূহের প্রাত্যহিক জীবনের নিষ্প্রাণ বর্ণনা নয়, তা চরিত্রাবলির জীবন-অভিজ্ঞতার ভাষ্য, ঔপন্যাসিকের দেশকাল, সময় ও সমাজসচেতনারই শব্দরূপ। বস্তুত, *লালসালু* যুগচৈতন্যের সমাজমর্ম-মূলকে স্পর্শ করেও হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের আলেখ্য; তাঁরই শিল্পিচৈতন্যের অনিবার্য অভিজ্ঞান।

চাঁদের অমাবস্যা 'লালসালু' থেকে অধিকতর পরীক্ষাপরিস্রুত ও শিল্পোজ্জ্বল। *চাঁদের অমাবস্যা*-র ঘটনাপ্রবাহ খুবই শীর্ণ অথচ ক্ষিপ্র, অন্তর্মময়, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় উপন্যাসের সদৃশ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে বহির্জাগতিক ঘটনা সূক্ষ্ম মন-মনন ও চেতনাসাপেক্ষ। উপরিস্তরের ঘটনাকে সংহরণ, ব্যক্তিকে ঘটনা-অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে তারই মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্মাণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ স্বচ্ছন্দ। *চাঁদের অমাবস্যা*-তে বাইরের ঘটনা গৌণ, আরেফ আলীর অন্তর্লোকে সৃষ্ট ঘটনাস্রোতই মুখ্য। যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর আত্মকথন, একটি পর্যায় থেকে আর-একটি পর্যায়ের উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী পর্বের যন্ত্রণা, মানসদ্বন্দ্ব ও পরিণামভীতির ইংগিতধর্মী বিবরণ এবং কাদেরকে মাঝির বউয়ের হত্যাকারী ঘোষণার মাধ্যমে অর্থাৎ , আরেফ আলীর জ্ঞানময়, স্বাধীন ও অস্তিত্বময় সত্তার জাগরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের মৌল প্রতিপাদ্য।

চাঁদের অমাবস্যা-র কাহিনী-সংগঠন *লালসালু*-র মতো প্রথাবদ্ধ নয়। আপাত বিচ্ছিন্ন অনুকাহিনী, সময়ের ক্রম-পরিবর্তনশীলতা, বিকল্প কথা-আরম্ভরীতি, দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষণবিন্দুর সুচিন্তিত ও শিল্পিত ব্যবহারই এ উপন্যাসের সাংগঠনিক গৌরব, এর অন্তর্বয়নের আধুনিকতা।

সর্বজ্ঞ লেখকের সার্বিক প্রাধান্য থাকলেও আরেফ আলীর আতঙ্ক-শিহরিত ও অতিসংবেদনশীল প্রেক্ষণবিন্দুর মুখ্য উপস্থিতিতে *চাঁদের অমাবস্যা* পরীক্ষা-পরিশীলিত। ব্যক্তি মনের আলোড়ন, তার দুঃসহ আত্মনিরীক্ষার বহুভুজ প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়োজনেই *চাঁদের অমাবস্যা*-র পরিচর্যা ও ভাষারীতি হয়েছে প্রতীকী, অন্তর্নাটকীয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক আশ্রিত।

বস্তুত, জীবনবোধের প্রাগ্রসরতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* অস্তিত্ববাদী তত্ত্বসংলগ্ন হওয়ায় উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যা ও ভাষাশৈলী নির্মাণে ঔপন্যাসিকের আন্তর্জাতিক শিল্প-অভিজ্ঞতার পরিচয়ই হয়েছে সক্রিয় ও উৎকীর্ণ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ উপন্যাস *কাঁদো নদী কাঁদো* ঘটনাগত বিন্যাস, আভ্যন্তর অন্তর্বয়ন ও ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি—কোনো দিক থেকেই *লালসালু* কিংবা *চাঁদের অমাবস্যা*-র অনুসৃতি, অনুবর্তন নয়, বরং স্বতন্ত্র, ঔপন্যাসিকের বিশ্বপ্রসারী জীবনদৃষ্টির অঙ্গীকারে সমৃদ্ধ। *কাঁদো নদী কাঁদো*-য় দুটি ঘটনা, মুহাম্মদ মুস্তফার অন্তর্মুখি চেতনাস্রোত এবং কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহকে আশ্রয় করে হয়েছে উৎসারিত ও প্রবাহিত। সে-অর্থে উপন্যাসটি মুহাম্মদ মুস্তফার কথামালা হয়েও তা বিজড়িতভাবে কুমুরডাঙ্গার উপাখ্যান। মুহাম্মদ মুস্তফার কাহিনী সংক্ষিপ্ত, তার ও

তার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ: কিন্তু কুমুরডাঙ্গার উপাখ্যান দীর্ঘ ও ব্যাপক জনাগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে প্রাগ্রসর।

মানুষ একা অস্তিত্ববান হয়ে উঠলে তার সে-প্রচেষ্টা সামগ্রিক মুক্তি বয়ে আনে না। *চাঁদের অমাবস্যা*-র আরেফ আলীর সত্যঘোষণা কেবল তার ব্যক্তিগত মানবিক অস্তিত্বকেই সুদৃঢ় করেছে; ব্যাপক মানবিক অস্তিত্ব চেতনার সঙ্গে তাকে সংলগ্ন করতে পারেনি। কিন্তু তা *কাঁদো নদী কাঁদো*-র খতিব মিঞার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। বলা যায়, খতিব মিঞার জীবনার্থ; তার অস্তিত্ব-অভীপ্সার রূপাংকনের মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন, হয়ে উঠেছেন বৃহৎ মুক্তি–অন্বেষী, ব্যক্তিগত অস্তিত্বরেখা পেরিয়ে বৃহৎ অস্তিত্ব-চেতনার দিগন্তরেখায় সমর্পিত ও সংলগ্ন।

কাঁদো নদী কাঁদো-র সংগঠন, পরিচর্যা ও দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, ভাষাশৈলীর অন্তর্বয়ন পূর্বাপেক্ষা পরিশীলিত। *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে লেখকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ ও তবারক ভূঁইএগ্রার নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষণবিন্দুর সম্পূরক ও পরিপূরক ব্যবহার এবং এই দুই রীতি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নদীর মতো অভিন্ন স্রোতধারায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত, *লালসালু*-র অনেকান্ত নির্বাচিত দৃষ্টিকোণ ও ঘটনান্তর্গত কতিপয় চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যার সূচনা, মাঝখানে *চাঁদের অমাবস্যা*-য় তার বাঁক-পরিবর্তন, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী-দাদাসাহেবের প্রেক্ষণবিন্দুর প্রয়োগ-সাফল্যের পর *কাঁদো নদী কাঁদো*-তে তারই পরিপূর্ণ বিকাশ, চূড়ান্ত শিল্পসাফল্য।

৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম নাটক *বহিপীর লালসালু* থেকে সাত বৎসরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও দুটি রচনাতেই তিনি অভিন্ন প্রতিপাদ্যসহ উপস্থিত। এ জাতীয় সমাজ-চৈতন্যকে স্পর্শ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসার স্বরূপ অনুধ্যানই *বহিপীর*-এর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৌল প্রেরণা। বস্তুত, *বহিপীর*-এর মাধ্যমে এ দেশীয় ধর্মসম্পৃক্ত ব্যক্তি, পীর-দরবেশ-খাদেমদের অন্তর্গত চারিত্রিক অসংগতি, তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও লিবিডো চেতনার রূপাংকন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আপাত অন্বিষ্ট বলে মনে হলেও তাঁর অভিপ্রায় অধিকতর গভীর আর তা অভিব্যক্ত হয়েছে তাহেরা-হাশেম আলীর আচরণে ও সংলাপে। তাদের পুনর্জাগরণ এবং দায়িত্বের দায়ভার বহন করে নিজেদের শুদ্ধ সত্তায় সুস্থির হওয়ার মধ্য দিয়েই এ নাটকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনবিবেচনা হয়েছে রূপাংকিত।

বহিপীর-এ প্রথাশ্রয়ী পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠনরীতি অনুসরিত হয়নি। একাঙ্ক নাটকের ঐক্য সংহতিও এ নাটকে অনুপস্থিত। সে-ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা যায় সময় বিভাজন ও মঞ্চ পরিকল্পনার অভিনবত্ব। *বহিপীর*-এর বিস্তার নদীতে ভাসমান একটি বজরার দুটি কামরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর এ নাটকে আশ্রিত সময়ের পরিধি মাত্র বার ঘণ্টা। দুটি অঙ্ক-বিভাগ থাকলেও *বহিপীর*-এ কোনো দৃশ্য-বিভাজন নেই, কিন্তু সে-অভাব পূরণ করেছে নাট্যকারের বর্ণনা। প্রতিটি চরিত্রকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনের পূর্বেই

নাট্যকার চরিত্র-বিশেষের ব্যক্তিস্বরূপ, মঞ্চে তাদের অবস্থান, তাদের—পোশাক পরিচ্ছদ এমনকি, মঞ্চে আলো-ছায়ার ব্যবহার পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন।

বহিপীর-এর সংলাপ নাটকটির চরিত্রসমূহ, পাত্র-পাত্রীদের জীবনার্থ, তাদের সংকট ও স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক। তাহেরা, বহিপীর, হাতেম আলী, হাশেম আলী, খোদেজা এমনকি, হকিকুল্লাহ্‌কে পর্যন্ত আমরা স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারি। তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপই তাদেরকে পৃথকভাবে ও নিজস্ব কণ্ঠস্বরে পরিচিত করেছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *তরঙ্গভঙ্গ বহিপীর* থেকে অধিক শিল্পশুদ্ধ, আধুনিক ইয়োরোপীয় নাট্য-আন্দোলন চিন্তার সন্নিপাতে উজ্জ্বল। বক্তব্যগত বিবেচনায় *তরঙ্গভঙ্গ কাঁদো নদী কাঁদো*-র সমধর্মী, দুঃসহ মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি অতিক্রম করে ব্যক্তির অস্তিত্ববান হয়ে-ওঠার কথা।

তরঙ্গভঙ্গ-এর মৌল সংকট আমেনাকে আশ্রয় করেই হয়েছে ঘনীভূত। স্বামী ও সন্তান হত্যার অভিযোগে আমেনাকে আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরী অভিযুক্ত করেছে। ফলে আদালতে মামলা রুজু হয়েছে। সাক্ষি-সবুদ প্রস্তুত, বিচারকও স্বকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি তিনি বিধান করতে পারেননি। ফলে বিচারক নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। বস্তুত, ন্যায়-বিচারের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও শর্তবন্দি সমাজব্যবস্থায় বিচারক তা বিধান করতে পারেননি; আর এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা, অস্তিত্বের দায়ভার বহনে ব্যর্থ হয়েই তিনি অস্তিত্ব থেকে পলায়ন করেছেন।

তরঙ্গভঙ্গ-র কাহিনী ভগ্নক্রমিক, স্বামী ও সন্তান হত্যার অপরাধে আমেনার বিচারদৃশ্য উন্মোচনের মাধ্যমে। অতঃপর হত্যার ঘটনাদ্বয় উঠে এসেছে ফ্লাশ ব্যাকে, ভিখারিণী ও আবদুস সাত্তার নেওয়ালপুরীর সংলাপের মাধ্যমে। কাহিনীস্রোতে কালগত বিক্ষেপ—সৃষ্টির এ প্রবণতা ন্যাচারালিস্ট নাটকেরই সহজাত লক্ষণ। কিন্তু হত্যাদৃশ্যের বিবরণ থাকায় *তরঙ্গভঙ্গ* লাভ করেছে ভিন্ন অভিধা, প্রকাশবাদী পরিচয়।

মঞ্চ—পরিকল্পনার দিক থেকেও *তরঙ্গভঙ্গ* বহিপীর থেকে আধুনিক। *বহিপীর*—এর মতো *তরঙ্গভঙ্গ*-এ দুটি অঙ্ক থাকলেও *বহিপীর*—এর দৃশ্য-বিভাজন এখানে নেই। *তরঙ্গভঙ্গ*—এর প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অঙ্কের 'শেষদৃশ্য' পরিকল্পনা বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। এ দুই দৃশ্যের পরিচয় প্রায় অভিন্ন। শেষ দৃশ্যে কেবল চাপরাশি অনুপস্থিত। কিন্তু উল্লিখিত দুটি দৃশ্যের চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপ গুণগতভাবে আলাদা, মৌলিকভাবে পৃথক। এই বৈলক্ষণ্যই নির্দেশ করে যে, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে স্বপ্নে, জজের মনোলোকে, অবচেতনায়। এই স্বপ্ন-প্রসঙ্গই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইয়োনেস্‌কীয় নাট্যকৃতি, তুলে ধরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যুগাতিক্রমী ও সমকালীন বিশ্বনাট্যের আঙ্গিক ও ঐতিহ্য-সচেতনা।

সুড়ঙ্গ ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ নাটক *উজানে মৃত্যু*-তে অ্যাবসার্ড রীতির শিল্পিত প্রয়োগ আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁর লঘু চালের অঘোষিত প্রস্তুতির পর্ব হিসেবেই *সুড়ঙ্গ* গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নাট্যকার যেভাবে পাত্র-পাত্রীদের শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের মাধ্যমে প্রাণময় করে তুলেছেন তা একান্তভাবেই এই বিশেষ

নাট্যকলার চরিত্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়ারই সমান্তরাল। *সুড়ঙ্গ*-এর ভাষা অতিপরিচিত শব্দ-ব্যবহার, সরল বাক্যসৃষ্টি ও সাধারণ দৃশ্য-যোজনার হলেও এ ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অ্যাবসার্ড উপাদান, সামঞ্জস্যহীন ও আপাত বিচ্ছিন্ন ভাব, এক অনাত্মীয় পরিবেশ।

উজানে মৃত্যু যথার্থই বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, অ্যাবসার্ডধর্মী বক্তব্য ও সে-অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ, ব্যক্তির অবচেতনায় স্তরীভূত ভাব-অনুভাবের রূপকল্প রচনা, শব্দ ও নৈঃশব্দ্য এবং রূপক-প্রতীকের মেধাবী প্রয়োগ-সাফল্যে এক অনতিক্রান্ত নাটক।

বিশ শতকের মানবজীবনের কোনো গল্প নেই। ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে মানুষ নিয়ত একা। *উজানে মৃত্যু* এই বিপন্ন মানবচৈতন্যেরই কথাবস্তু; তার শুভবোধশূন্য অন্তরানুভূতির কোলাজ। অন্য কথায়, *উজানে মৃত্যু* গল্পহীনদের গল্প; ঘটনাহীনদের বিচূর্ণিত ঘটনাপুঞ্জের সমাহার।

উজানে মৃত্যু-র চরিত্রদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কোনো নাম দেননি। নৌকাবাহক, শাদা পোশাকপরিহিত ব্যক্তি, কালো পোশাকপরিহিত ব্যক্তি পরিচয়েই চরিত্রগুলি নাটকে প্রাণ পেয়েছে। *উজানে মৃত্যু*-র সংলাপ কার্যকারণহীন, বিষম কালচেতনার মধ্য দিয়ে বহমান চরিত্রসমূহের চেতনাপ্রবাহের ভাষ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সংলাপ কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্যের সন্ধান দেয় না, হয়ে ওঠে অ্যাবসার্ড।

উজানে মৃত্যু-র মঞ্চ-সজ্জার মাধ্যমেও নাট্যকারের অ্যাবসার্ড রীতিপ্রিয় চেতনার পরিচয় উচ্চকিত। লৌকিক পরিবেশকে ব্যবহার, পরিচিত দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে পরিকল্পিত হলেও *উজানে মৃত্যু*-র মঞ্চ লোকাতীত এবং তা সাধারণ-উর্ধ্ব এক মনোবাস্তবতারই সৃষ্টি করেছে। *উজানে মৃত্যু*-র প্রকৃত মঞ্চ তাই বাইরে নয়, দর্শক-পাঠকের অন্তরে, তাদের মেধা ও অনুভূতিলোকেই এর অবস্থান।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাট্যপ্রতিভা একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়েছে পরিণতিমুখি। মঞ্চ-পরিকল্পনার বৈচিত্র্য এবং স্বদেশীয় সমাজ-কাঠামোর অন্তরালে আধুনিক অস্তিত্ববাদী বক্তব্য উপস্থাপন সত্ত্বেও *বহিপীর*-এ তিনি ছিলেন মূলত ন্যাচারালিস্ট। *তরঙ্গভঙ্গ*-এ সেই একই জীবনবোধে প্রত্যয়দৃঢ় হয়ে নাট্যকার হিসেবে তিনি একস্‌প্রেশনিস্ট। *উজানে মৃত্যু*-তে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আরো প্রাগ্রসর বৈশ্বিক নাট্যকৃতি সচেতন, অ্যাবসার্ডিস্ট।

৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়বস্তু-সংগ্রহ, ঘটনা-নির্বাচন ও জীবনাংশ আহরণের ক্ষেত্রে জাতিক, স্বাদেশিক কিন্তু জাগ্রত বোধ, প্রকাশ-প্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক, বিশ্বমনস্ক। অন্য কথায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শিল্পী হিসেবে সেই প্রাণবান বৃক্ষ যার শিকড় ঐতিহ্যের মর্মমূলে প্রসারিত কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা, পত্রগুচ্ছ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উর্ধ্বচারী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সচেতন, পরীক্ষাপ্রিয়, মেধাবী কথাকোবিদ, 'লেখকদের লেখক'।

পরিশিষ্ট

১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গ্রন্থপঞ্জি

ছোটগল্প

ক **নয়নচারা**, চৈত্র ১৩৫১/ মার্চ ১৯৪৫, কলিকাতা : পূর্বাশা

খ **দুইতীর ও অন্যান্য গল্প**, আগস্ট১৯৬৫, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান

গ **গল্প-সমগ্র**, মার্চ ১৯৭২, কলকাতা: শুকসারী।

উপন্যাস

ক **লালসালু**, শ্রাবণ ১৩৫৫/ জুলাই ১৯৪৮, ঢাকা : কমরেড পাবলিশার্স

খ **চাঁদের অমাবস্যা**, ১৯৬৪ ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান

গ **কাঁদো নদী কাঁদো**, মে ১৯৬৮, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান

নাটক

ক **বহিপীর**, ১৯৬০, ঢাকা : গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড

খ **তরঙ্গভঙ্গ**, আষাঢ় ১৩৭১/ ১৯৬৪, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

গ **সুড়ঙ্গ**, এপ্রিল ১৯৬৪, ঢাকা : বাঙ্‌লা একাডেমী

ঘ **উজানে মৃত্যু**, ১৩৭০/ ১৯৬৩, *সমকাল* (৬ : ১০), ঢাকা

রচনাবলি

ক. *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*–রচনাবলী (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, জানুয়ারি ১৯৮৬, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

খ. *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*- রচনাবলী (সৈয়দ আকরম হোসেন সংগৃহীত-সম্পাদিত), দ্বিতীয় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

২ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

অরুণ মিত্র। এপ্রিল ১৯৮৫। *ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে,* কলকাতা : প্রমা

অরুণকুমার বসু (সম্পাদিত)। বৈশাখ ১৩৮৮, *বাঙ্‌লা গদ্য শৈলীবিজ্ঞান*। কলকাতা: সমতট প্রকাশনী

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৪, *কালের প্রতিম*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

আশ্বিন ১৩৯৮, *কালের পুত্তলিকা,* কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরী

আনিসুজ্জামান। ডিসেম্বর ১৯৭৫, *মুনীর চৌধুরী,* ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

আবদুল মান্নান সৈয়দ। নভেম্বর ১৯৮৬। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ,* ঢাকা : মুক্তধারা

আবু রুশদ্‌। জুলাই ১৯৮৮। শওকত ওসমান ও *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস*; ঢাকা : সৃজনী প্রকাশনী লিমিটেড

আবুল ফজল। ২য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, *রেখাচিত্র,* চট্টগ্রাম : বইঘর

আবু হেনা মোস্তফা কামাল। মার্চ ১৯৮১। *কথা ও কবিতা*, ঢাকা : মুক্তধারা

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ। ১৩৭৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৩। *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ইনসাইড লাইব্রেরী

তানভীর মোকাম্মেল। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য. জিজ্ঞাসা*, ঢাকা: মুক্তধারা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩৮১। *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা : আশা প্রকাশনী

নীহাররঞ্জন রায় (ও অন্যান্য সম্পাদিত)। বৈশাখ ১৩৬৮। *বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা*, কলিকাতা : সমতট প্রকাশনী

পবিত্র সরকার। ১৩৮৮। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৯৮। *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ*, কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত। নভেম্বর ১৯৮২। *বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ- প্রসঙ্গ*, কলিকাতা : বর্ণালী

প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্টোবর ১৯৮৬। জাঁ- পল সার্ত্রের *দর্শনে মানবতাবাদ*, কলকাতা : দে বুক সেন্টার

প্রেমেন্দ্র মিত্র। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা*. কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং

বদরুদ্দিন উমর। নভেম্বর ১৯৭০। *পূর্ববাঙলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়। এপ্রিল ১৯১৬। দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৮১। *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*। কলিকাতা : প্রকাশ ভবন

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৬, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮৯। *সাহিত্য-বিবেক*, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং

বিশ্বজিত ঘোষ। এপ্রিল ১৯১৯। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

মনসুর মুসা। এপ্রিল ১৯৭৪। *পূর্ব-বাঙলার উপন্যাস*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

মমতাজউদদীন আহমদ (সম্পাদিত)। ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। *লালসালু ও ওয়ালীউল্লাহ্*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশনী

মুনীর চৌধুরী। ১৯৭০, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ১৯৭৫। *বাঙলা গদ্যরীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

মুহম্মদ মজিরউদ্দিন। সেপ্টেম্বর ১৯৭০। *বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা*, নওগাঁ : নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স

মোতাহের হোসেন চৌধুরী। ফাল্গুন ১৩৬৫। *সংস্কৃতি-কথা*। ঢাকা : সমকাল প্রকাশনী

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন। মার্চ ১৯৯০। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক*, ঢাকা : মুক্তধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নতুন সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৯। *শেষের কবিতা*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫। *পথের সঞ্চয় : রচনাবলী*–২৬। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ

পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৪। *গল্পগুচ্ছ*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

রামেশ্বর শ'। ১৯৮২। *আধুনিক বাংলা উপন্যাস : যুগ-পরিবেশ ও সামাজিক পটভূমি*, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : উত্তরসূরী প্রকাশনী

শিবনারায়ণ রায়। জানুয়ারি ১৯৮৩। *রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র ও নক্ষত্রসংকেত*। কলকাতা : প্যাপিরাস

শিশির চট্টোপাধ্যায়। মে ১৯৬২। *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা*। কলিকাতা : বুক ল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

শিশিরকুমার দাশ। এপ্রিল ১৯৮৭। *কবিতার মিল ও অমিল*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

সঞ্জীব ঘোষ। মার্চ ১৯৮৪। *জাঁ-পল সার্ত্র : জীবন ও দর্শন*। কলকাতা : রত্নাবলী

— জানুয়ারি ১৯৯০ *অস্তিত্ববাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ*। কলকাতা : রত্নাবলী

সরদার ফজলুল করিম (সাম্পাদিত)। নভেম্বর ১৯৬৯। *আমাদের সাহিত্য*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৭১। *বাংলা উপন্যাসের কালান্ত*।, কলিকাতা : সাহিত্যশ্রী

সারওয়ার মুরশিদ, খান (সম্পাদিত)। জুন ১৯৮৯ *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

সৈয়দ আকরম হোসেন। বৈশাখ ১৩৮৮, পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯৪। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

— ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

— ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সৈয়দ আবুল মকসুদ। ডিসেম্বর ১৯৮১। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা : মিনার্ভা বুক্স,

নভেম্বর ১৯৮৩। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা : মিনার্ভা বুকস

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি ১৯৮২। *রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমিক*। কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং

হাসান আজিজুল হক। ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

ইংরেজি

Camus, Albert. 1947, 1972, *The Plague. London* : penguin Books

Cox, C. B. Dyson A. E. (edited). 1974, The Twenteeth *Century Mind*. London : Oxford University Press.

Daiches, David. 1964, *A Study of Literature for Readers and Critics*. London : The Norton Library

Encyclopedia of Philosophy. The (voll. 3 and 4); 1967, London : Mack Millan Philosphy co. Inc. & The Free press

Esslin, Martin (edited). *Absurd Drama, England* Penguin Books ;

—1968, *The Theatre of* the Absurd, London : Penguin Books

Frolov, I. (edited). Second revised edition 1984, *Dictioary of Philosophy*. Moscow : Progress Publishers

Guddon, I. A.; 1979, *A Dictionary of Literary Terms*. England:Penguin Books

Harvey, W.J. 1965, *Character and the Novel*. London : Chatto & Windus

Kafka, Franz. 1988. *The Collected Novels of Franz Kafka*. England : Penguin Books

Kernan, Alum B. 1967. *The Modern American Theater*. Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, Inc

Lubback, Percy. 1921, Reprinted 1968, *The Craft of Fiction* London : Jonathan Cape

NcNamme, Maurice B.; Cronin, Games E; Rogers, Joseph A. October 1970, Literary Types and Themes. New York : Holt, Rinehart and Winstone, Inc.

Read, Herbert. 2nd edn. MCML-IV, *Collected Essays in Literary Criticism*. London : Faber & Faber

— Revised edn. 1968, Reprinted 1986, *A Concise History of Modern Art*. London : Thames and Hundson

Rogenthal, M., Yudin, P. (edited). *A Dictionary of philosophy* Moscow : progress publishers

Rycroft, Charles. 1968, Reprinted 1979. *A Critical Dictionary of Psychoanalysis*. England : Penguen books

Scott, William P. First Indian edn. 1988, *Dictionary of Sociology*. New Delhi : Goyl SaaB

Sanders, T. E. 1968, *The Discovery of Drama*. Scotland : New Jersy

Sartre, Jean-Paul; First English edn. 1948, Reprinted 1970, *Existentialism and Humanism*. London : Metheun & Co Ltd

—:1969. Being Md Nothingness. London. Metheun & Co Stuepf.,

Samuel Enoch 2nd edn. 1975, *Socrates to Sartre : A History of Philosophy*. New York : Macgrow Hill Book Co

৩ অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা

এ কে নাজমুল করিম। ৩১ অক্টোবর ১৯৭১। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্', *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা :

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৬৮। *পূর্বমেঘ*, রাজশাহী

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৯৪। *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলা বিভাগ।

—; শীত ১৩৮৯। *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলা বিভাগ

মোহাম্মদ নাসির আলী ১৮ অক্টোবর ১৯৭১। 'কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প', *দৈনিক ইত্তেফাক*। ঢাকা : ইত্তেফাক গ্রুপ অব্ পাবলিশিং

রবিন ঘোষ (সম্পাদিত)। অগ্রহায়ণ ১৩৫১। *বিজ্ঞাপনপর্ব* (১৬ : ১-২), কলকাতা

সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাসেম, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'। কিছু খণ্ডচিত্র; *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা : দি সংবাদ লিমিটেড।

সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ১৩৯১। *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা : আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেড

উল্লেখপঞ্জি

[উ= উপন্যাস ক = কবিতা গ = গল্প গ্র = গ্রন্থ না = নাটক প = পত্রিকা প্র = প্রবন্ধ]